রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পি এইচ. ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

লিটন মল্লিক

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00ED0200518

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর মনোজিৎ মন্ডল

ইংরেজি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

‘রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন’ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Manojit Mandal, Professor and Head, Department of English, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

Dated: Dated:

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	i-ii
স্বীকৃতি	iii
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	১-২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ ভাবনা ও স্বদেশের কাজ (১৮৯১-১৯০৮)	২৮-৯০
তৃতীয় অধ্যায়: আশ্রম বিদ্যালয় ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯-১৯১৯)	৯১-১৮৫
চতুর্থ অধ্যায়: জাতীয়তাবাদের নতুন দিক: বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন (১৯১৯-১৯২৯)	১৮৬-২৬৩
পঞ্চম অধ্যায়: মানবতাবাদ ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০-১৯৪১)	২৬৪-২৯২
উপসংহার	২৯৩
পরবর্তী সম্ভাব্য গবেষণার ক্ষেত্র	২৯৪
বাংলা গ্রন্থপঞ্জি	২৯৫-২৯৬
ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি	২৯৭

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার প্রথম পরিচয় *সহজ পাঠের* হাত ধরে। তারপর যত বয়স এগিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার ও অনুভব করার ক্ষমতা বদলেছে। সেই অনুভব ও বোঝার গভীরতা আসে ২০০৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়ার পর থেকে। তারপর স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষ পেপার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নেওয়া আমার রবীন্দ্র চর্চার উৎসাহকে আরও বৃদ্ধি করেছে। স্নাতকোত্তর স্তরে ডিজার্টেশনের মূল বিষয় ছিল *গীতাঞ্জলি*। এরপর আমি B.Ed. ও M.Ed. পড়ার সুযোগ পাই রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে। এখানে এসে রবীন্দ্রনাথকে আরও কাছ থেকে জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। সেখানে শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি শ্রীনিকেতনে কিভাবে পল্লি-পুনর্গঠনের কাজ হয়েছিল, তা দেখারও সৌভাগ্য হয়। এমনকি M.Ed -এর ডিজার্টেশনে ১৯৪১-১৯৫১ সালের মধ্যে বিশ্বভারতীর উন্নয়নের ধারা কেমন ছিল সেই বিষয় নিয়ে কাজ করেছিলাম। ফলে বিশ্বভারতীকে আরও ভালো করে চেনার সুযোগ হয়েছিল। রবীন্দ্রভবনের বাগান দেখে মনে হয়েছিল, একজন উদ্ভিদবিদ বিশেষজ্ঞ ছাড়া এত গাছ ও তাদের পরিচর্যা কী করে জানা সম্ভব! আবার শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা কিভাবে বর্তমান গ্রামকেন্দ্রিক ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাও অনুভব করা যায়। সবশেষে প্রফেসর মনোজিৎ মণ্ডল স্যারের তত্ত্বাবধানে "রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন" শিরোনামে গবেষণার কাজটি করলাম।

এই গবেষণাপত্রে কালপুরুষ বাংলা হরফের ১২ নম্বর ফন্ট, উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জিতে ১১ নম্বর ফন্ট এবং প্রতিটি বাক্যের মধ্যে ১.৫ স্পেস ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত *আকাদেমি বানান অভিধান* - এর বানানবিধি মানা হয়েছে। *MLA Handbook for Writers of Research Papers* এর সপ্তম মুদ্রণ অনুসরণ করে এই গবেষণাপত্রের তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি লেখা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ্য, ভারতীয়দের ক্ষেত্রে তাঁদের যে পরিচয়, তাতে নামটাই মুখ্য, পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে যদিও বিষয়টি বিপরীত, পদবি- মুখ্য পরিচয়েই তাঁরা অভ্যস্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Shakespeare, Einstein, Moore, Andrews প্রমুখ অতি বিখ্যাত মানুষরা প্রত্যেকেই পরিচিত তাঁদের পদবি (Surname)-এর মাধ্যমে। এই কারণেই তথ্যপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জিতে নাম-পদবির যে ক্রম *MLA Handbook* ব্যবহার করার কথা বলে, আমরা সেই ক্রমকে বাংলা নামের ক্ষেত্রে মান্য করার পক্ষপাতী

নই। আমরা বাংলা-হরফে-লেখা লেখকের নামের ক্ষেত্রে নামটি আগে এবং পদবিটি পরে ব্যবহার করেই তথ্যপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জি সাজিয়েছি। এই গবেষণা সন্দর্ভটি গবেষকের সম্পূর্ণ নিজের লেখা ও প্লাগারিজম মুক্ত।

এছাড়া এই গবেষণাপত্রের হরফসজ্জা ও পেজ-মেকিং আমার নিজের করা। এ জন্য কোনো প্রফেশনাল বা বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়া হয়নি। এই কারণে সামগ্রিক পৃষ্ঠা-সজ্জায় অল্পবিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েই গেল। সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

লিটন মল্লিক

যাদবপুর

স্বীকৃতি

স্বীকৃতি অংশে আসি তাঁদের কথায় যাঁদের সাহায্য ছাড়া আমার এই গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ হতো না। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল মহাশয়কে। শিরোনাম ঠিক করা থেকে শুরু করে, অধ্যায় বিভাজন, প্রবন্ধ নির্বাচন ইত্যাদি প্রতিটি ধাপে তিনি আমাকে সব সময় সুপরামর্শ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গবেষণার কাজটি তিনি নিয়মিতভাবে মূল্যায়নও করে দিয়েছেন। গবেষণা সংক্রান্ত যখনই কোন সমস্যা হয়েছে, দ্বিধাহীন ভাবে তিনি সমস্যার সমাধান খুঁজে দিয়েছেন। গবেষণার জন্য তিনি যেমন একাধিক বইয়ের সন্ধান দিয়েছেন, সাথে সাথে প্রয়োজনে নিজের বই দিয়েও তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার Research Advisory Committee (RAC) -র তিনজন সদস্য- শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুক্তিপদ সিনহা মহাশয়, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাজেশ্বর সিনহা মহাশয় ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এবং আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল মহাশয়দের জানাই আমার প্রণাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ এবং মতামত আমার গবেষণার কাজটিকে সম্পূর্ণ হতে সাহায্য করেছে। তাঁরা সঠিক সময়ে আমার কাজের ছোটখাট ভুলগুলিকে সংশোধন করে দিয়েছেন। আবার কখনও-বা কাজটি কিভাবে আরও ভালো হবে সেই পরামর্শও দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ এবং বাংলা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপকদের যাঁদের হাত ধরে আমার এতদূর আসা।

এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের গ্রন্থাগারকে, বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারকে এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে। বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে আমি প্রয়োজনীয় বইগুলি পেয়েছি।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু সোনালী গিরিকে। সে বিভিন্ন সময়ে আমাকে বইপত্র সংগ্রহ করা, লেখা এবং প্রুফ সংশোধনে বিশেষ সাহায্য করেছে। ধন্যবাদ জানাই স্নেহের ভাই মহাম্মদ আজিজকেও। ফাইনাল প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছে বন্ধু সপ্তদীপ ঘোষ। তাকে ধন্যবাদ দিলেও কম পড়ে যায়। আমি যাদের কাছে সাহায্য পেয়েছি, তার ব্যপ্তি এতখানি যে তাঁদেরকে কেবলমাত্র এই কয়েকটি কথায় ধন্যবাদ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা:

বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের চেতনা ও অনুভবে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি সকলের বেঁচে থাকার আশ্বাস ও প্রেরণা। বিশ্বজনের কাছে তাঁর বড়ো পরিচয় হল তিনি সত্যদ্রষ্টা-কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও তত্ত্বকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক বা শিল্পীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁকে কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ বলাই শ্রেয়। তাঁকে জানা ও উপলব্ধি করা খুব সহজ কাজ নয়। বরং তাঁকে নিন্দায়, অপমানে, ধিক্কারে ছোটো করা খুবই সহজ। সে কাজ তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। তারপর তাঁকে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ নিজেদের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছে। কখনও তাঁকে বলা হয়েছে বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, কখনও প্রগতি বিরোধী বা ইংরেজদের ভক্ত। কিন্তু কালো মেঘের দল সূর্যকে কতক্ষণ আড়াল করবে? আপন-দীপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ সমুজ্জ্বল।

সৃজনশীল ও কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তবে কর্মী রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত। অথচ তিনি মনে করতেন তাঁর দেশের মানুষ তাঁকে মনে রাখবে তাঁর শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডের জন্য। তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের একটা দীর্ঘ বিস্তৃত প্রেক্ষাপট আছে। রবীন্দ্রনাথ ষোল বছর বয়সে 'ভারতী' প্রত্রিকায় 'বাঙালীর আশা ও নৈরাশ্য' নামে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় প্রবন্ধ লেখেন। সেই কৈশোর থেকেই দেশ সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি মনে করতেন যে, একমাত্র গ্রামের মধ্যেই মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ রয়েছে। আর এই গ্রাম-বাংলাই হল রবীন্দ্রনাথের প্রাণের নিকেতন (নিকেতনের অর্থ হল গৃহ) এবং মা লক্ষ্মী সেই গৃহেই তাঁর সার্বিক উন্নতির আসনটি পাততে চান। দেশের প্রকৃত শ্রীকে তিনি গ্রামের 'অন্নক্ষেত্রের' মধ্যে আহ্বান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও পল্লি-পুনর্গঠনের কাজ করে গেছেন। গ্রামের নতশির, লাঞ্ছিত মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক পরিচয় হয় শিলাইদহ-পতিসরে জমিদারি দেখাশোনার সময় থেকে। তাঁদের আত্মশক্তিকে জাগরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর ধরে যে কাজ করেছেন তার সম্পূর্ণ কাহিনি আজও অজানা। কিন্তু আজকের গ্রামীণ সমস্যার প্রেক্ষিতে সে অজানা কাহিনি পল্লি-উন্নয়নের প্রয়োজনেই আবিষ্কৃত হওয়া দরকার।

একদিন নিজের স্বল্প সামর্থ ও কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের বীজ পুঁতেছিলেন। জীবন সায়হ্নে এসে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা তা থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। অন্তত সেই বীজকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের একটা দুর্নাম ছিল তিনি ধনীসন্তান, তার চেয়ে বড়ো দুর্নাম ছিল তিনি কবি। মনের ক্ষোভে তিনি অনেকবার ভেবেছেন যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা তখন কোথায় ছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদ, তার উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভাবনার সঙ্গে আজকের দিনের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদদের মতের স্পষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর রচনায় ও বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কাছে নিজের অর্থনৈতিক দর্শনের ঋণ স্বীকার করেছেন।

বর্তমানে অর্থনীতিবিদরা মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে দেশের উন্নয়নকে চিহ্নিত করেন না। তাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অনাহার, ক্ষুধা, মানুষের গড় আয়ু প্রভৃতিকে উন্নয়ন-অনুন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করেন। ভারতে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু সংখ্যার তালিকার সঙ্গে নিরুৎসাহ, অবসাদ, অকর্মণ্যতা, রোগপ্রবণতা মেপে দেখার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড খুঁজেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পিছনে রয়েছে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা। তিনি সর্বদা জাতির ঐক্য, সমৃদ্ধি ও সার্বিক বিকাশের কথা বলেছেন। ভারতীয় সমাজ কখনও রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি, এদেশে সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো। অন্যান্য দেশে 'নেশন' নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করে জয়ী হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ দীর্ঘকাল ধরে সকল প্রকার সংকটের মধ্য দিয়েও তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। ভারতবাসী যে হাজার বছরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলিয়ে যায়নি, এখনও যে সমাজে নিম্নশ্রেণির মধ্যে সততা ও মনুষত্ব বিরাজ করছে, খাদ্যাভাসে সংযম এবং ব্যবহারে শালীনতা প্রকাশ পায়, এখনও যে ভারতবাসী পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করে, বহু কষ্টে অর্জিত ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেয়, অভাবের সংসারে ভাই-বোনকে কলেজে পড়ায়- সে একমাত্র ভারতের প্রাচীন সমাজের জোরে। ইউরোপের নেশানের সাথে ভারতীয় সমাজের

একটি প্রধান পার্থক্য হল ইউরোপের নেশান সজীব আর ভারতীয় সমাজ অন্ধ অনুকরণে জগদ্দল পাথরে পরিণত হয়েছে। এরা চোখ বন্ধ করে শুধু পূর্বপুরুষের কর্মফল ভোগ করছে। এখনও শুধু পূর্বপুরুষের সেই নিয়ম মেনেই চলেছে কিন্তু এদের মধ্যে পূর্বপুরুষের সেই চেতনা আর নেই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের জন্য এরা কোনো কাজ করে না। কিন্তু ভারতবাসী যদি পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত জাগ্রত মঙ্গলময় ভাবটি হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে সমাজের সর্বত্র তাকে প্রয়োগ করত তাহলে ভারতের সেই প্রাচীন সনাতন সভ্যতাটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠত। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধন-সম্পদ দান প্রভৃতি নিজেদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য, এতেই সকলের মঙ্গল। একে ব্যবসা হিসাবে দেখা অনৈতিক। এর বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। সমাজের নিচ থেকে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিস্বার্থ কল্যাণের বন্ধনে আবদ্ধ- এটাই ছিল ভারতবাসীর সব থেকে বড়ো চেষ্টার বিষয় এবং মনুষত্ব লাভের একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় যে কোনো উন্নতি হয়না তা নয় কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। আসলে ভারতে সমাজই চিরকাল সকলের ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করে এসেছে।

'স্বদেশী সমাজ' নির্মাণ করার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার গ্রাম ও সমাজের পুনর্গঠনের উপরেই জোর দিয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মূলত হতদরিদ্র, অসহায়, গ্রাম-সমাজের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে স্বদেশ নির্মাণ বলতে তিনি খুব স্পষ্টভাবে গ্রামীণ পল্লি-পুনর্গঠন ও শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

এই গবেষণাটিতে সব্যসাচী ভট্টাচার্যের 'Rabindranath Tagore: An Interpretation' নামক বিখ্যাত বইটির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদকে চারটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৯১-১৯০৮:

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ থেকে জনগণের রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে শুরু করেন। এই সময়ে তিনি শিলাইদহের জমিদার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পাশাপাশি কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকাগুলিতে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি তুলে ধরতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলনের সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে তাঁর রচিত স্বদেশি গানগুলি আপামর বাঙালিকে

একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। এই সময়ে রচিত বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত "আমার সোনার বাংলা" (১৯০৫)।

১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ১৮৯০ -এর নভেম্বর মাসে তিনি ইউরোপ থেকে ফেরেন। এই সময়ে তিনি তাঁর 'যুরোপ যাত্রীর ডায়েরি'-তে (১৮৯০) যে ভ্রমণ যাত্রার বর্ণনা করেন সেখানে তিনি তাঁর লেখার ধরন পরিবর্তন করেন। এখানে তিনি সাধু বাংলা থেকে ধীরে ধীরে চলিত বাংলায় লেখা শুরু করেন। লেখনীর এই রীতিই পরবর্তীকালে রবীন্দ্র রচনার মূল আঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৯১-এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এক বড়ো পরিবর্তন আসে। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাঁকে প্রায়ই উত্তরবঙ্গ থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে হতো (উত্তরবঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঠাকুরবাড়ির যে জমিদারি ছিল সেগুলি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মাঝে মাঝেই সেখানে যেতে হতো)। জমিদারি দেখাশোনার পাশাপাশি ১৮৯১ সালে তিনি 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাগুলিতে তিনি হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরব হন। অন্যদিকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে প্রার্থনা গৃহের (মন্দির) উদ্বোধন হয়। এই শান্তিনিকেতনই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

১৯৯০-এর পর থেকে শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনার সময়ে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন, পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এইগুলি তাঁর ছোটোগল্পের ও কাব্যের প্রধান উপাদান রূপে ধরা দিয়েছে। এইসময় 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচুর ছোটোগল্প রচনা করেছেন।

এদিকে সেইসময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কলকাতায় খুব উত্তেজেনা ছড়িয়ে পড়ে। সেইসময় (১৮৯৩) চৈতন্য লাইব্রেরিতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) সভাপতিত্বে এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে প্রত্যেক জাতির দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে ইংরেজদের ঔদ্ধত্য, বর্ণবিদ্বেষ, ভারতবিদ্বেষের কথা বলেছেন। ইংরেজদের অনেক ক্ষমতা থাকলেও মানুষকে চেনার ও আপন করার গুণটি ছিল না। তারা 'উপকার করা', 'রক্ষা করা' এগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। অবহেলা করেছে 'দয়া করা', 'স্নেহ করা', 'শ্রদ্ধা করা'-কে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপটিও তুলে ধরেছেন। কিন্তু একটি বিষয় অত্যন্ত

বিস্ময়কর যে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ জানাচ্ছেন তখন জাতীয় কংগ্রেস নীরব থেকে ইংরেজদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক টাউন হলে 'সিডশন বিল' বিষয়ক একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় তিনটি প্রস্তাব জনপ্রিয়তার সঙ্গে গৃহীত হয়। এই সভাতেই অন্য সুরে বাঁধা প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ রাখেন উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথ। সেদিন রবীন্দ্রনাথের বাংলায় বলা ভাষণটি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি কেউই গুরুত্ব দেয়নি। কয়েকমাস পরে 'ভারতী' পত্রিকায় 'কণ্ঠরোধ' শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ভাষণের শুরুতেই ছিল কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে শ্লেষ ও বক্রোক্তি। এরপর রবীন্দ্রনাথ তিলক ও নাটুভাইদের গ্রেপ্তার, ইংরেজ সরকারের সিডশন বিল ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন প্রবন্ধের ছত্রেছত্রে। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের দয়ার দানে পাওয়া 'পবিত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা' যে কতখানি অলীক, কতখানি ঠুনকো তাও প্রকাশিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। আসলে যে প্রস্তাবের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাষণ পাঠ করেন, তার মূল সুর, ভাব-ভঙ্গি ও মেজাজের সঙ্গে ঐ সভার কোনো সঙ্গতি ছিলনা। এ যেন এক উদীয়মান কবির অতি কষ্টে সভার কর্মকর্তা ও প্রবীণ নেতাদের রক্ত চক্ষু ও ভ্রূকুটি স্মরণ করে লেখনীকে সংযত রাখার প্রচেষ্টা।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখনীকে মূল হাতিয়ার করে তোলেন, এই সময়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধের মাধ্যমে আপামর বাঙালিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন, আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), রাজা প্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), শিক্ষা (১৯০৮) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম কাছের বন্ধু চার্লস এন্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের সময়কালকে তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তনকারী সময় বলে উল্লেখ করেছেন। চার্লস এন্ড্রুজের মতে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের উৎস হল শিয়াইদহের গ্রাম্য জীবন, কলকাতা নয়। এই কারণে তৎকালীন সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫), অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) প্রমুখের জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল পৃথক। সেই সময়ের গ্রাম বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে হয়েছিল, প্রথমেই এই মানুষগুলির আত্মশক্তির বিকাশের প্রয়োজন। অপরদিকে কলকাতার

মধ্যবিত্ত নেতাদের চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল ঔপনিবেশিক সরকার, সাংবিধানিক পরিকাঠামো, বিতর্কিত রাজনীতি প্রভৃতি। জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনোই নিজে গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির একজন হয়ে উঠতে না পারলেও তিনি গ্রামীণ সমাজকে খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করেছিল।

১৯০৯- ১৯১৯:

১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনার দিক পরিবর্তন ঘটে। এই পর্বে তিনি নিজেকে জনমানস থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। যদিও তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের অন্যতম পুরোধা পুরুষ ছিলেন তবুও তিনি তৎকালীন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাজনীতির সমালোচনা করেন এবং নিজেকে সরিয়ে আনেন। এরপর তিনি শান্তিনিকেতনের স্কুলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

সেই সময়ের জাতীয় স্তরের রাজনীতিও ছিল উত্তাল। বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) রাজদ্রোহের বিচারের সময় দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক কার্যকলাপ (১৮৯৭), বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫), জাতীয় কংগ্রেসের বিভাজন (১৯০৭), অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন, বোমা বাঁধার অপরাধে অরবিন্দ ঘোষের গ্রেপ্তার, ইংরেজ অফিসার হত্যার চেষ্টার অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান (১৯০৮), বাল গঙ্গাধর তিলকের নির্বাসন প্রভৃতি একাধিক প্রেক্ষাপট নরমপন্থা বা আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে ভারতীয় রাজনীতিতে এক হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্ম দেয়।

১৯০৮-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেসের নেতাদের মতবিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। বিশেষ করে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুটি দলে ভাগ হয়ে যাওয়াকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে সমালোচনা করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণই ছিল রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের শেষ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। এই সময়ে উদ্ভূত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ গুপ্তহত্যায় বিশ্বাসী ছিল, একে রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেননি। ১৯০৮ সালের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে এই বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দিতে শুরু করে। তিনি মনে করেন এটা কখনো স্বাধীনতা অর্জনের পথ হতে পারে না। তাই তিনি

এর বিকল্প পথ হিসাবে এবং জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে পল্লি-পুনর্গঠনের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন অনেক বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ইংরেজ সরকার কারারুদ্ধ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন ছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ‘পথ ও পাথেয়’ ও ‘পূর্ব ও পশ্চিম’ প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯১৯-১৯২৯:

১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবারও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কারণ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলা দেখে তিনি কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তিনি প্রতিবাদ সভার আহ্বান করলেও সেই সভায় কেউ তেমন সাড়া দেননি। তাই তিনি ইংরেজদের দেওয়া ‘নাইটহুড’ উপাধি ত্যাগ করে এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ করেন। যদিও গান্ধীজির সাথে তাঁর জাতীয় আন্দোলনের মত ও পথ নিয়ে মতবিরোধ ছিল। তবুও এই পর্বে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তরান্বিত করার জন্য, মানুষের ওপর ইংরেজদের অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন এবং তার থেকে মুক্তির পথ হিসেবে রূপকের আড়ালে লিখলেন ‘মুক্তধারা’ (১৯২২) ও ‘রক্ত করবী’-র (১৯২৬) মতো বিখ্যাত সব নাটক।

মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) উপস্থিতি তৎকালীন গণআন্দোলনকে এক নতুন রূপ দিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথও নতুনভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হন। যদিও একই সঙ্গে গান্ধীর সাথে তাঁর বেশ কিছু মতাদর্শগত পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন-

(ক) ‘খাদি’-কে উন্নতির পথ হিসেবে নির্বাচন করা।

(খ) পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গান্ধীর নেতিবাচক মনোভাব।

(গ) ‘স্বরাজ’ প্রসঙ্গে গান্ধীর সঙ্গে সাংগঠনিক মতাদর্শগত বিরোধ।

যদিও এই দুই মহান নেতার মধ্যে মতপার্থক্য ছিল তথাপি তাঁদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া তাঁদের দু’জনকেই সমৃদ্ধ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য জীবনে সৃষ্ট অন্যতম দুটি বিখ্যাত নাটক এই সময়েই রচিত হয়েছিল। স্বাধীনতা এবং তার প্রয়োজনীয়তার দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি মানব মুক্তি এবং সংগঠনের দ্বন্দ্ব, মানবতা বা মূল্যবোধের সাথে যুক্তির দ্বন্দ্ব এগুলিই নাটকগুলিতে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। নাটক দুটি হল ‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’।

নাটক দুটি সহ অন্যান্য লেখাগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের আরেকটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি হল শাসক বা এই জাতীয় যেকোনো ক্ষমতা বা সংগঠনের শীর্ষে যারা আছেন তাদের পরিবর্তন করা।

১৯৩০ – ১৯৪১:

এই পর্বে এসে আবার অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তাঁর সৃজনশীলতাকে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি এই পর্যায়ে এসে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ধরণের লেখায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি প্রচুর ছবি এঁকেছেন। এমনকি এই সময়ে তিনি প্রধান জনপ্রিয় বক্তা হয়ে ওঠেন; ফলে তিনি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার কার্যে ব্যস্ত থাকতেন। তবে তিনি কিন্তু এই পর্বে এসে আগের মতো খুব বেশি রাজনৈতিক কাজ কর্ম নিয়ে মেতে থাকতেন না। এই সময়ে তাঁর চিন্তা ভাবনার প্রধান বিষয় ছিল ‘মানুষের ধর্ম’।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্যায়ে মানবতার কথা বলেছেন। বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর জীবনের চিন্তা ভাবনার মূল সুর। এটাই তিনি ‘মানুষের ধর্ম’-এর মাধ্যমে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার প্রধান বিষয়ও ছিল এটা। এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ‘ভারত পথিক রামমোহন’ (১৯৩৩) প্রবন্ধেও এবং মহাবোধি সোসাইটিতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধের উপর এক বক্তৃতায়। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৯৩৩) নাটক ও ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪) উপন্যাসেও প্রকট হয়ে উঠেছে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবিকতার অবক্ষয়, জাতিগত বিদ্বেষ, রাজনৈতিক হিংসা প্রভৃতি দেখে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি রচনা করেন ‘সভ্যতার সংকট’ (১৯৪১)। তাঁর এই মানবিক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ শুধুমাত্র এই প্রবন্ধগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর একদম শেষের দিকের কবিতাগুলিতেও তিনি তাঁর এই ভাবনার উল্লেখ করেছেন।

গবেষণা হয়নি এমন ক্ষেত্র:

সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার পর্যালোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ, পল্লি-উন্নয়ন ও শিক্ষা ভাবনা- প্রতিটি বিষয়কে নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখা যায়, এইসব গবেষণামূলক কাজগুলি সবই স্বতন্ত্র্যভাবে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লি-উন্নয়ন ও প্রকৃতির কোলে শিক্ষা ভাবনা যে আসলে তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল এই

বিষয়টি নিয়ে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো গবেষণামূলক কাজ হয়নি বললেই চলে। তাই গবেষক এই ক্ষেত্রটিকে তার গবেষণার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

সমস্যার বিবৃতি:

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন

শিরোনামের কার্যকারী সংজ্ঞা প্রদান:

১। **জাতীয়তাবাদ:** ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শগুলি, স্বাধীনোত্তর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাজনীতিতে সেই আদর্শের প্রভাব এবং ভারতীয় সমাজে জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাতের কারণস্বরূপ একাধিক আপাত-পরস্পরবিরোধী আদর্শের সম্মিলিত একটি আদর্শকে বোঝায়।

২। **পল্লি-পুনর্গঠন:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রামের মানুষের উন্নতি করা। এখানে পল্লি-পুনর্গঠন বলতে মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের Idea of Inclusive Development এই ধারণাটিকে বোঝানো হয়েছে।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য:

১। **১৮৯১- ১৯০৮** এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও পল্লি-পুনর্গঠনের অনুসন্ধান করা।

২। **১৯০৯-১৯১৯** এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী চেতনা কীভাবে তাঁকে পল্লি-উন্নয়নের কাজে ব্রতী করেছিলেন তার অনুসন্ধান করা।

৩। **১৯১৯-১৯২৯** এই পর্বে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী ধারণা ও তার প্রভাব অনুসন্ধান করা।

৪। **১৯৩০-১৯৪১** এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী ধারণা ও মানবতাবাদের সম্পর্ক অনুসন্ধান করা।

অধ্যয়নের তাৎপর্য:

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরও জাতীয়তাবাদ নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। কখনো রাজনীতির জালে শুধুমাত্র মানচিত্রের প্রতি বা ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসাই হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ। কিন্তু একটি দেশ বা জাতির এক কথায় দেশের সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসাই যে জাতীয়তাবোধ, এই সহজ কথাটিকে সকলে ভুলতে বসেছে। জীব বৈচিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষও নিরন্তর লড়াইতে নিমগ্ন। লড়াই চলছে অর্থনীতিকে সচল রাখার, লড়াই চলছে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার। অর্থনীতিবিদরা বলছেন গরিবের হাতে অর্থ দিতে আর তাতেই ঘুরবে দেশের অর্থনীতির চাকা। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে রয়েছে এক আলাদা গুরুত্ব। আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে ঠিক একইভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও শিক্ষাব্যবস্থাকে- এককথায় পল্লি-জীবনের পুনর্গঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের এক নিদর্শন রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে এক নতুন ভারত গড়ার সংকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সেই পল্লি-পুনর্গঠনের মন্ত্র আজ যেন আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে পল্লি জীবনের সাথে পরিচিত হয়েছেন **১৮৯১** খ্রিস্টাব্দে তাঁর জমিদারি পরিচালনার সময় থেকে। জমিদারি বলতে সকলে যে প্রজা পীড়নকারী শোষকের রূপ কল্পনা করে থাকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একদমই তার বিপরীত। পল্লি জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে এবং তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে এই দুঃখ দুর্দশাগুলি গভীর রেখাপাত করেছে। তাই তিনি এই জীবন যন্ত্রাণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন বারবার। তিনি বারেবারে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে, ছোটোগল্পে এমনকি কবিতায় ও গানে তাঁর পল্লি সম্পর্কিত ভাবনাগুলিকে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধে বাংলার গ্রামগুলির দুরবস্থার কারণ ও তার থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন যে, আমাদের দেশে গ্রামের সম্পদ আত্মসাৎ করে শহর ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠছে অথচ গ্রাম থেকে যাচ্ছে সেই নিঃস্বই। গ্রামের যেসব কৃতি মানুষ শহরে চলে আসছেন তাঁরা আর গ্রামের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখছেন না। তাই শহরে এসে তাঁরা যে সম্পদ অর্জন করেন গ্রাম তার কোনো ভাগ পায়না।

তাই গ্রামের দারিদ্র দূর করার জন্য তিনি গ্রাম ও শহরকে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গঠনমূলক কাজ করার আহ্বান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ 'উপেক্ষিতা পল্লী'-তে আধুনিক সভ্যতার প্রেক্ষিতে দেশের নগর ও গ্রামের উন্নতির ভারসাম্যহীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এই অসাম্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, মানুষের সভ্যতা যতই গগনচুম্বী হয়ে ওঠে ততই তার পতনের কারণগুলিও প্রকট হতে শুরু করে। প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক ভারসাম্যকে যখন মানুষের কৃত্রিম সভ্যতা ছাপিয়ে যায়, তখন সে নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। তিনি দুঃখ করে আরো লিখেছেন যে, দেশে আধুনিক সভ্যতা মানুষের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর মতে অধিকাংশ মানুষ যারা গ্রামে বসবাস করে, তারাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলাচ্ছে বা অন্যান্য ভোগের সামগ্রী উৎপাদন করছে আর সেই গ্রামের মানুষের কাছেই লাভের অংশ খুবই কম ফিরে আসেছে।

'পল্লীর উন্নতি' শিরোনামে হিতসাধন মণ্ডলীর সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতার মূলভাব অনুধাবন করতে পারলে বোঝা যায় তিনি গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য কতটা ব্যাকুল ছিলেন। তিনি মনে করতেন, সর্বাগ্রে পল্লির উন্নতি করাই দেশের মানুষের সবচেয়ে বড়ো কাজ।

তিনি তাঁর 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে দরিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যকে জয় করার মতো আত্মবিশ্বাস নেই। এই আত্মবিশ্বাস না থাকার কারণ হল তাদের মধ্যে একতা নেই। তাঁর কথায়, "পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষ-ই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র"। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, পল্লিগ্রামে তিনি দেখেছেন দরিদ্র চাষি এবং সম্পন্ন চাষিদের ছোটো-বড়ো ক্ষেত পর পর রয়েছে। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী হাল-বলদ কম বেশি আছে। ফলে তাদের ফসলের পরিমাণও সেই অনুপাতে কম বেশি। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পরিশ্রম করছে এবং ফলও পাচ্ছে আলাদা আলাদা। এই অসাম্য দূর করার জন্যই তিনি সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোমার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে, চাষিরা যদি তাদের সকলের ফসলের ক্ষেত ও মূলধন একত্রে করে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিকাজ করে তাহলে তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারবে। সেই ফসল একসাথে গোলায় তুলে তারপর বিক্রির ব্যবস্থা করলে খরচ পড়বে অপেক্ষাকৃত কম আর লাভও হবে বেশি। এই লাভের অর্থ তারা তাদের প্রত্যেকের

মূলধনের অনুপাতে ভাগ করে নিতে পারবে। এইভাবে একজন ছোটো ও দরিদ্র চাষিও তার দারিদ্র্যকে জয় করতে পারবে। এই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন যে, একজন গোয়ালা একা দুধ না বিক্রি করে কয়েকজন মিলে যদি অনেকটা দুধ সংগ্রহ করে কোনো শিল্প গড়ে তোলে তাহলে মাথাপিছু লাভ হবে অনেক বেশি। এছাড়াও একাধিক কুটিরশিল্প, সমবায় শিল্প ইত্যাদি একাধিক কর্মযজ্ঞ তাঁর জাতীয়তাবোধেরই প্রমাণ দেয়।

ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে তিনি শান্তিনিকেতনে কল্পিত তপোবন আশ্রমের মতো প্রকৃতির কোলে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদী শিক্ষা ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ। গুরু-শিষ্যের সুন্দর সম্পর্ক রচনার মাধ্যমে তিনি আধুনিক ভারতে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদান পদ্ধতি আজও সেই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন করে চলেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ ও পল্লি-উন্নয়নের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল যা গ্রামের মানুষকে নতুন দিশা প্রদর্শন করেছিল। বাংলার কুটির শিল্পগুলি ফিরে পেয়েছিল তাদের জীবনীশক্তি। ভারতীয় ঐতিহ্য কেবলমাত্র শিক্ষা আর জীবিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সুস্থ জাতি গঠনে, শারীরিক সুস্থতা প্রভৃতি বিষয়কেও তিনি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান দিয়েছেন। গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা, মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য স্থাপিত মাতৃসদন আজও শিলাইদহ-শ্রীনিকেতনে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে। কিন্তু আজকে প্রযুক্তির ব্যস্ত সময়ে আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবনার সময় এসেছে। নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে ভারতের প্রাণকেন্দ্র সেই গ্রামগুলিকে নিয়ে। জাতীয়তাবোধের আলোকে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে গবেষণার এটাই উপযুক্ত সময়।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন, প্রকৃতির কোলে শিক্ষা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক গবেষণা হয়ে থাকলেও জাতীয়তাবোধের আলোকে পল্লি-পুনর্গঠন এবং প্রকৃতির কোলে শিক্ষা-এই দিকটি গবেষণার আড়ালে থেকে গেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই দিকটি গবেষণার বিষয় হিসেবে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সীমা নির্দেশকরণ:

গবেষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণাটি করেছে। প্রবন্ধগুলি হল-

প্রবন্ধ	রচনাকাল	প্রবন্ধ গ্রন্থ
1. প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	১৮৯১	সমাজ
2. নূতন ও পুরাতন	১৮৯১	স্বদেশ
3. আচারের অত্যাচার	১৮৯২	সমাজ
4. ইংরাজ ও ভারতবাসী	১৮৯৩	রাজা-প্রজা
5. রাজনীতির দ্বিধা	১৮৯৩	রাজা-প্রজা
6. ইংরেজের আতঙ্ক	১৮৯৩	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
7. ছাত্রসম্ভাষণ	১৮৯৩	শিক্ষা/ সংযোজন
8. অপমানের প্রতিকার	১৮৯৪	রাজা-প্রজা
9. সুবিচারের অধিকার	১৮৯৪	রাজা-প্রজা
10. রাজা ও প্রজা	১৮৯৪	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
11. কোর্ট বা চাপকান	১৮৯৮	সমাজ
12. অযোগ্য ভক্তি	১৮৯৮	সমাজ
13. কণ্ঠরোধ	১৮৯৮	রাজা-প্রজা
14. প্রসঙ্গ কথা- ১, ২, ৩, ৪, ৫	১৮৯৮	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
15. ব্যাধি ও প্রতিকার	১৯০১	সমাজ (পরিশিষ্ট)
16. নেশন কী	১৯০১	আত্মশক্তি
17. ভারতবর্ষীয় সমাজ	১৯০১	আত্মশক্তি
18. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা	১৯০১	ভারতবর্ষ
19. বারোয়ারি মঙ্গল	১৯০১	ভারতবর্ষ

20. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম / প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ	১৯০১	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ / পরিশিষ্ট
21. ভারতবর্ষের ইতিহাস	১৯০২	ভারতবর্ষ
22. অত্যুক্তি	১৯০২	ভারতবর্ষ
23. রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	১৯০২	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
24. রাজকুটুম্ব	১৯০৩	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
25. স্বদেশী সমাজ	১৯০৪	আত্মশক্তি
26. সফলতার সদুপায়	১৯০৪	আত্মশক্তি
27. বঙ্গবিভাগ	১৯০৪	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
28. দেশের কথা	১৯০৪	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
29. ইম্পীরিয়ালিজম	১৯০৫	রাজা-প্রজা
30. রাজভক্তি	১৯০৫	রাজা-প্রজা
31. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	১৯০৫	আত্মশক্তি
32. অবস্থা ও ব্যবস্থা	১৯০৫	আত্মশক্তি
33. শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা	১৯০৫	শিক্ষা/ সংযোজন
34. জাতীয় বিদ্যালয়	১৯০৬	শিক্ষা
35. সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী)	১৯০৭	সমূহ
36. ব্যাধি ও প্রতিকার	১৯০৭	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
37. যজ্ঞভঙ্গ	১৯০৭	১৯০৮ এর পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ
38. পূর্ব ও পশ্চিম	১৯০৮	সমাজ
39. সদুপায়	১৯০৮	সমূহ
40. শিক্ষাবিধি	১৯১২	শিক্ষা
41. কর্মযজ্ঞ	১৯১৪	কালান্তর/ সংযোজন

42. স্ত্রীশিক্ষা	১৯১৫	শিক্ষা
43. পল্লীর উন্নতি	১৯১৫	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
44. ছোটো ও বড়ো	১৯১৭	কালান্তর
45. স্বাধিকার প্রমত্তঃ	১৯১৭	কালান্তর/ সংযোজন
46. সমবায় নীতি ১	১৯১৮	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ সমবায় নীতি
47. ভূমিলক্ষ্মী	১৯১৮	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
48. বিদ্যাসমবায়	১৯১৯	শিক্ষা
49. ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা	১৯২০	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ সমবায় নীতি
50. হিন্দু মুসলমান	১৯২২	কালান্তর
51. সমবায় নীতি ২	১৯২২	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ সমবায় নীতি
52. শ্রীনিকেতন	১৯২২	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
53. চরকা	১৯২৫	কালান্তর/ সংযোজন
54. স্বরাজ সাধন	১৯২৫	কালান্তর/ সংযোজন
55. বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত	১৯৩১	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
56. দেশের কাজ	১৯৩২	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
57. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	১৯৩৩	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

58. বিশ্বভারতী ১-১৯	১৯৩৩	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ / পরিশিষ্ট
59. আশ্রমের শিক্ষা	১৯৩৬	শিক্ষা/ সংযোজন
60. নারী	১৯৩৬	কালান্তর
61. শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ	১৯৩৯	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
62. হলকর্ষণ	১৯৩৯	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
63. পল্লীসেবা	১৯৪০	সভ্যতার সংকট/ পরিশিষ্ট/ পল্লী প্রকৃতি
64. সভ্যতার সংকট	১৯৪১	সভ্যতার সংকট

অধ্যায় বিভাজন:

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ ভাবনা ও স্বদেশের কাজ (১৮৯১-১৯০৮)

তৃতীয় অধ্যায়: আশ্রম বিদ্যালয় ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯-১৯১৯)

চতুর্থ অধ্যায়: জাতীয়তাবাদের নতুন দিক: বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন (১৯১৯-১৯২৯)

পঞ্চম অধ্যায়: মানবতাবাদ ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০-১৯৪১)

সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার পর্যালোচনা (Review of related studies):

জাতীয়তাবাদ বিষয়ক পর্যালোচনা:

- নেপাল মজুমদারের (১৯৬৩) 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ধারাবাহিক ও বিস্তারিত তথ্য-সম্বলিত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা ও অবদানের সঠিক মূল্যায়ন নিয়ে তাঁর প্রশ্ন আছে। ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও চিন্তা নায়কদের রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যই এই গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, রাওলাট আন্দোলন ও জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, খাদি ও চরকা বির্তকে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে, সমবায় ও কৃষি-সমস্যা, শিক্ষা সংস্কারে, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে, স্বরাজ-চিন্তায় ও পূর্ণ-স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজি ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও সাযুজ্য, প্রত্যেক পৃথক পৃথক বক্তব্যের মধ্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও বিশ্ব শান্তি আন্দোলন ক্রমেই যখন বিস্তৃত ও ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ সেই সূচনা কাল থেকেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সংকট ও বিশ্ব ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের বিভিন্ন দল-গোষ্ঠী ও নেতা এবং সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়, এবং কীভাবে তাঁরা সাড়া দেন, এককথায় ভারতে আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের ইতিহাস এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় উভয়ের চিন্তার সাযুজ্য ও পার্থক্য এবং পত্রবিনিময় ইত্যাদি কালানুক্রমিক ভাবে এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

- শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৬১) তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরেজিতে ‘নেশান’ বা ‘ন্যাশনালিজম’ আর ‘জাতীয়তাবাদ’ বিষয় দুটি এক নয়। ঊনবিংশ শতকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয়। বাংলায় এই জাতীয়তাবাদের জনক হলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর প্রাচীন সংস্কৃতি এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর এই জাতীয়তাবাদের সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আচারে, ব্যবহারে, ভাষায় ও চিন্তায় ইংরেজকে অনুসরণ না করে নিজের দেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই ছিল এই জাতীয়তাবাদের মূল উদ্দেশ্য। রাজনারায়ণ বসু এই উদ্দেশ্যে ‘গুপ্ত সমিতি’ গঠন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতিতে যোগদান করেন এবং রাজনারায়ণ বসুর নিকট ‘ভারত উদ্ধারের দীক্ষা’ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই এই জাতীয়তাবাদের আদর্শ ত্যাগ করে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই নতুন মতবাদের সমর্থনে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

  রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের যে আদর্শের কথা বলতেন, ঋষি অরবিন্দ দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মত পোষণ করতেন এবং ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গ্রহণ না করে শ্রীঅরবিন্দের মতই সমর্থন করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তামূলক প্রবন্ধাবলী অপরূপ সাহিত্যিক রস সৃষ্টি করলেও সেই সময়ে ভারতবাসীর মনে তা বিশেষ সাড়া ফেলতে পারেনি।

- আহমদ রফিক তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার দিকটি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি বেশ জটিল। সেখানে রয়েছে নানা মাত্রিক ভাবনার মিশ্র চরিত্র, তাতে স্ববিরোধিতারও অভাব নেই। তাঁর স্বদেশভাবনা যেমন রাজনৈতিক চিন্তা, তেমনি সমাজভাবনা নির্ভর। সেখানে যুক্ত হয়েছে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের উপলব্ধি, যে উপলব্ধির মধ্যমণি প্রাচীন ভারত, সনাতন ভারত। যে ভারতের চরিত্র সমাজপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান নয়। আবার সে সমাজ ভাবনায় একপর্যায়ে এসে যুক্ত হয়েছে পল্লি-পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিষয়ক আধুনিক চেতনা। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষে

ইংরেজ শাসনের চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে, সর্বোপরি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের আগ্রাসন নিয়ে মতামত প্রকাশ। শেষোক্ত বিষয়টির গুরুত্ব সর্বাধিক এই কারণে যে, যখন ভারতে ইংরেজ শাসনে আধুনিকতার পত্তন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির রেনেসাঁস নিয়ে রবীন্দ্রচেতনায় যথেষ্ট মুগ্ধতা, তখনো ইংরেজের নিষ্ঠুর বিশ্ব আগ্রাসী তথা সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী।

পল্লি-পুনর্গঠন বিষয়ক পর্যালোচনা:

- ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ (২০১৯) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কৃষক সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পল্লি বিষয়ক চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রথম তাত্ত্বিক রূপ পেয়েছে ১৯০৪ সালে লেখা 'স্বদেশী সমাজ', ও পরবর্তীতে লেখা 'পল্লী প্রকৃতি' প্রবন্ধে। কিন্তু তাঁর পল্লি-উন্নয়ন ও স্বদেশি সমাজ গঠনের চিন্তা সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। জাতীয়তাবাদের রাজনীতি সামন্ততান্ত্রিক-মধ্যবিত্তনির্ভরতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন গ্রাম উন্নয়ন এবং দুস্থ অবহেলিত কৃষক শ্রেণির উন্নতির গুরুত্ব স্বদেশিকতার পটভূমিতে ভদ্রলোকদের বুঝিয়ে দিতে। ১৯০৭ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তাঁর পল্লি-উন্নয়ন পরিকল্পনাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন। যে তিনটি বিষয়ের ওপরে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা, গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা দূর করা এবং জনসমাজের মধ্যে গ্রাম উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করা। কারণ গ্রামীণ সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ শুধু দরিদ্রই নয় তারা শতকরা আশি জনই কৃষি কাজে নিয়োজিত। তিনি রায়তদের শিক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে জমিদার, জোতদার, মহাজনরা তাঁদের উপর অত্যাচার চালাতে না পারেন।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য ও সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর স্বকীয় প্রচেষ্টায়, ক্রমে তিনি তার বিস্তার ঘটাতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যেসব কাজে অংশ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল প্রাথমিক জনশিক্ষা সহ শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তার, চিকিৎসা দান, পূর্তকর্ম যেমন- কূপ খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবা-পুকুর সংস্কার ইত্যাদি, ঋণদায় থেকে কৃষকদের রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ সালিস-বিচার। তাই দেখা যায় দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে নিরক্ষরতা দূর করা তথা জনশিক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন। ছোটোদের জন্য দিনে এবং বয়স্কদের জন্য রাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের লোকদের নিজেদের চিকিৎসার ব্যাপারে খরচ করার সামর্থ্য ছিল না। সেজন্য গ্রামের মানুষ সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেল। পতিসরে গঠিত হল 'হিতৈষী সভা'। সমিতির সদস্যদের অর্থে একজন কম্পাউন্ডার রাখা হল এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন কর্মসূচির মূল কথা ছিল সমবায় নীতির সর্বজনীন ও সুষ্ঠু প্রয়োগ। এ সম্পর্কিত বক্তব্যে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তারও আভাস মেলে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, সমবায় প্রথার মধ্যে দিয়ে বড়ো পুঁজি এককভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। তিনি চাষিকে সমবায়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, সমবায় ব্যাংকের সাহায্যে কৃষকের ঋণভার কমাতে বা মোচন করার দিকে নজর দিয়েছেন।

- অধ্যাপক শাইখ সিরাজ (২০১১) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও পল্লি জনজীবনের উন্নয়নের ভাবনা বর্তমান সময়ে কতটা উপযোগী তা তুলে ধরেছেন। জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতির প্রশ্নে তাঁর দর্শন সত্যিই অভাবনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'কোনোমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকুমাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত অর্থ, উদ্বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্ব-চর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।' কিন্তু বিশাল এই দিক নির্দেশনা ও সৃজনশীলতার এই প্রেরণাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যেও অনেক খেদ রয়েছে। বলা বাহুল্য, সমাজের অনেক উন্নয়নের সমস্যায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা মডেল

হতে পারে, কিন্তু সেগুলো তলিয়ে দেখাই হয়নি। আজও পর্যন্ত কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা চর্চা হয়, ততটা চর্চা তাঁর দেশ গড়ার সূত্রগুলো নিয়ে হয় না। বহুযুগ পার হলেও রবীন্দ্রনাথের এদিকগুলো নিয়ে খুব বেশি গবেষণা যেমন হয়নি, তেমনি এগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়েনি নীতি-নির্ধারকদেরও। আজ সময়ের প্রয়োজনেই এ দিকটিকে মনোযোগদেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীনিকেতন' এই বাংলার অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি হলেও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকপাল হিসাবেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু দেশের মানুষ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি, অর্থনীতি, গ্রামোন্নয়ন, সমবায়, সমাজ ব্যবস্থা ও সংগঠন এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশাল অবদানকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে যত দ্রুত আন্তরিক হবে এবং অনুসরণ করবে তত দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে দিশাহারা প্রান্তিক মানুষের মুক্তি।

- শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী (১৯৬৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্টেটে অর্থাৎ শিলাইদহ-কলকাতায় দীর্ঘদিন চাকুরী করেছেন। 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর সেই চাকরির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি তিনটি গ্রন্থের সংকলন, যথা- 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ', ও 'রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে'। গ্রন্থ তিনটিতে লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী পদ্মাপারের ও শিলাইদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দৈনন্দিন জীবন জীবিকা, জমিদারির কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। শিলাইদহ ও কলকাতার এস্টেটে আসা অনেক মানুষদের সম্পর্কে তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। শিলাইদহের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন, একজন কবি কীভাবে জমিদার হয়ে উঠছেন- গ্রন্থটিতে তারই বর্ণনা রয়েছে। তিনি জমিদারিতে যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন সেকথাও গ্রন্থটিতে রয়েছে। তিনি যে আর পাঁচজন জমিদারের মতো নন, তা 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের উন্নতিসাধন, তাই তাঁর জমিদারিতে তিনি একটি ব্যতিক্রমী ছাপ রেখে গেছেন। কোথাও তিনি প্রজাদের খাজনা মুকুফ করে দিয়েছেন, কোথাও বা তিনি মোকদ্দমার পর কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির টাকা ছাড় দিয়ে কীভাবে তার বাজার বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করেছেন। ঠাকুরবাড়ির জমিদারের তালিকা রয়েছে অর্থাৎ কোন সদস্যের কোন অংশে জমিদারি,

সেই অংশটিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সামন্ততন্ত্র প্রথা বিলোপের ঘণ্টাটি এখান থেকেই বাজিয়ে ছিলেন।

- অধ্যাপক কৌশাম্বী চক্রবর্তী (২০১৬) তাঁর 'পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা: একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রতিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথের পল্লি-উন্নয়নের দিকটি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই দেশের কৃষকদের প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, তিনি গ্রাম বাংলার উন্নয়নের জন্য কতটা বদ্ধপরিকর ছিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের গ্রামগুলি দুর্দশা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং অর্থ উপার্জনের সুযোগের অভাব গ্রামের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই অবস্থা থেকে গ্রামের মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে যে সমাধানের পথ দেখিয়েছেন, তা এই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বহুলাংশে প্রাসঙ্গিক। একথা প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি শুধুমাত্র গ্রাম উন্নয়নের কিছু তত্ত্বের অবতারণা করেননি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামের মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বহু কাজ করেছেন যা আজ থেকে একশো বছর আগে সত্যিই গোটা পৃথিবীর কাছে এক চরম বিস্ময়।

- সুধীরচন্দ্র কর (১৯৪৮) তাঁর 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টির নাম হল 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ'। এই অধ্যায়ে তিনি দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা চাষাভূষা, কুলি-মজুর অর্থাৎ খেটে খাওয়ার দল-এদের সঙ্গে আজকের দিনের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাবের ও কর্মের সঙ্গে কোথায় কতটা যোগ সেই দিকটি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদার, কৃষকরা তাঁর প্রজা, সুতরাং তাদের সঙ্গে স্বভাবতই তাঁর একটা যোগ থাকার কথা। জনগণের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক যোগ জমিদার হিসাবেই। কিন্তু খাজনা আদায় এবং বিষয় ব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মন জমিদারি সুলভ মানসিকতার বেড়া ডিঙিয়ে চলে এসেছে সাধারণ মানুষের কাছে। শিলাইদহ অঞ্চলেই তিনি

প্রথম কৃষক বা সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি আসেন। অবশ্য আর একবার সেই জনযোগের প্রবণতা দেখা যায় তাঁর শ্রীনিকেতনের পল্লিসেবা ক্ষেত্রে। শ্রীনিকেতনেই তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার সার্থক ও বাস্তব রূপদান করেছেন। এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেলেন বিদেশে- রাশিয়ার সাম্যবাদীরা তাঁকে নিয়ে দেখালেন তাদের নবজীবন গড়ার কর্ম-কৌশল। পল্লিকেন্দ্রে ঘুরে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ সুসাংস্কৃতিক জীবনকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। রাশিয়ার জনসেবা প্রণালী এবং দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার আলোচনায় পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন দেশের উন্নতি করতে গেলে সবার আগে গ্রামের এই দরিদ্র মানুষগুলির আর্থিক উন্নতি দরকার। গ্রামের মানুষগুলির শিক্ষা-দীক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা, লোকশিক্ষার সংস্থান, আর্থিক উন্নতির জন্য কৃষি, কুটির শিল্প ও সমবায় ধন ভান্ডার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্য সমিতি, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং কিশোরদের সেবা, শৃঙ্খলা ও খেলাধুলার কাজে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ব্রতীদল প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানে তিনি নানা উদ্যোগ করে গেছেন। তাঁর মতে, একটি পল্লিকেও যদি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মাধ্যমে আদর্শ পল্লিতে গড়ে তোলা যায়, তবে তার থেকেই দেশের বৃহত্তম কল্যাণের সূচনা হবে। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার দিকটিও তুলে ধরেছেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করে আদর্শ জীবন ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তার করে দেশে সমুন্নত মনঃপ্রকৃতি সৃষ্টির কাজে ব্রতী হলেন। কালক্রমে নানা দেশে গিয়ে নানা সমাজ, নানা চিন্তা ধারা, নানা শিক্ষা প্রণালীর সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রাথমিক ব্রাহ্মণিক আদর্শ পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল বিশ্বমানবের। সমগ্র পৃথিবীকে স্বদেশের মধ্যে স্বীকার করে তাদের সকলকেই মেলাবার নীড় রচনা করলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'বিশ্বভারতী'তে। এভাবেই সুধীরচন্দ্র কর 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন ও শিক্ষার দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

- তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের (১৯৭১) 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' গ্রন্থটি ১৯৭১ সালের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতার দ্বিতীয় বর্ষে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বিষয়ে যে চারটি বক্তৃতা দেয় তার সংকলিত রূপ।

  প্রথম বক্তৃতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পরিচয় পর্বের বর্ণনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন 'পোস্টমাস্টার' 'ছুটি' ইত্যাদি গল্পের চরিত্রগুলির কীভাবে এসেছে। শিল্প ও শিল্পী নিয়ে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে "মহাকবি রবীন্দ্রনাথের" শিল্পের বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে। শিল্প শুধুমাত্র শিল্পীর চিত্ত প্রসূত নয়, তার সঙ্গে সোনার অলংকার গড়ার মতো প্রয়োজন হয় বাইরের অভিজ্ঞতার। তবে সোনা ও অলংকার যেমন একশো ভাগই একই জিনিস নয় তেমনি শিল্পীর অন্তর-আত্মা এবং বাইরের অভিজ্ঞতা ভিন্ন-তা বললে ভুল করা হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'র অংশ থেকে তিনি একটি দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। আসলে এই অংশটি তাঁর চারদিনের বক্তৃতার ভূমিকার অংশ। তিনি বাকি তিন দিন যে তিনটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং যেটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেই তিনটি অংশ হল- প্রথমাংশ হল 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীবাসী', দ্বিতীয় অংশ হল 'রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজ' এবং তৃতীয় অংশ হল 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী প্রকৃতি'। প্রথমাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় তিনি 'গোরা'র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। এই অংশটিতে তিনি ভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা তা গোরার উক্তি দিয়েই প্রকাশ করেছেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০০ এই সময়ের চিঠিপত্র ও গল্পে গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের যে পরিচয় রয়েছে তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি একাধিক চিঠিপত্র এবং ছোটোগল্পের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

  পরের অংশ অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসমাজ' এখানে 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশিকতা' ও 'পলিটিক্যাল স্বদেশিকতা' সম্পর্কে একটি আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-প্রেম এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী প্রকৃতি' এই অংশটি শেষদিনের বক্তৃতা। এই অংশটি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং জীবনের প্রথম কাল থেকে পরিণত বয়সের কবিকৃতি আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে পল্লি জীবনের লৌকিক চিত্র। প্রকৃতি যেমন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র উঠে এসেছে তেমনি পল্লির প্রকৃতি হিসেবে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে

পল্লির মানুষ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পল্লি প্রকৃতির সম্পর্কের কথা এই অংশটিতে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও 'রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষ' শিরোনামেও একটি আলোচনা রয়েছে।

শিক্ষাভাবনা বিষয়ক পর্যালোচনা:

- ড. জাহিদা মেহেরুননেসা (২০১৬) তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা এবং আজকের দিনের সংকট' প্রবন্ধে বলেছেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা সময়ে নানা ভাবনার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতের প্রকৃতির সহযোগে শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন অতীতের সেই শিক্ষাব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন প্রয়োজন। তিনি নিজেও শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষাকে তিনি কখনো অনায়াসে অর্জনের বিষয় করে তোলেননি। ছাত্ররা যাতে শক্ত বিষয় ভাঙতে পারে বড়ো বড়ো কথা বুঝতে পারে সেই ব্যবস্থাই তিনি করতেন। তাই তাঁর ছাত্ররা দ্রুতচিন্তা করার মতো ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। ছাত্রজীবনে শিথিলতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। এমন কি ছাত্রদের কঠিন বই পড়াতে তিনি দ্বিধা করতেন না। একবার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রকে তিনি ইংরেজ দার্শনিক ও সাহিত্যিক John Ruskin-এর বই পড়িয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনকে তিনি নিজের শিক্ষাচিন্তার আদর্শে গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নিজস্ব শিক্ষাদর্শন ও ভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে আশ্রম পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শান্তিনিকেতনে প্রবাসীরাও বিদ্যার্জনের জন্য আসছেন তখন তিনি ভেবে খুশি হলেন যে, শান্তিনিকেতন বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে বাইরের ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। একে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাকেন্দ্র করে তুলতে চেয়েছেন যেখানে শিশুকাল থেকে ছাত্ররা একসাথে থেকে একটি জাতীয় আদর্শ চর্চা করতে পারবে, যেখানে শিক্ষাচর্চা হবে সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত।

তথ্যসূত্র

- কৌশাম্বী চক্রবর্তী, *পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা: একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রতিবেদন,* প্রবাহ, প্রকাশকের নাম অনুপস্থিত, ২০১৬।
- ড. জাহিদা মেহেরুননেসা, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা এবং আজকের দিনের সংকট,* ঢাকা: ই-পেপার, ২০১৬।
- ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও কৃষক সমাজ,* ঢাকা: ই- পেপার, ২০১৯।
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী,* কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১।
- দীক্ষিত সিংহ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।
- রফিক আহমদ, *রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা,* ঢাকা: ই- পেপার, প্রকাশকাল অনুপস্থিত।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদক), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০।
- শাইখ সিরাজ, *রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা,* ঢাকা: ই- পেপার, ২০১১।
- শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ,* কলকাতা: বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, ১৯৬১।
- শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৬৪।
- সুধীরচন্দ্র কর, *জনগণের রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৯৪৮।
- Best, J. W., Kahn, J. V. & Jha, A. K., *Research in Education*, Pearson, 2016.

- Bhattacharya, Sabyasachi. *Rabindranath Tagore: An Interpretation*, New Delhi: Penguin Books, 2011.
- Singh, A. K. *Test, Measurement and Research Methods in Behavioural Science*, New Delhi: Bharati Bhawan Publishers & Distributors, 2016.

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথে স্বরাজ ভাবনা ও স্বদেশের কাজ (১৮৯১-১৯০৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সমাজ উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন সেই সময় তাঁর না ছিল সম্পদের সংস্থান, না ছিল কোনো জোরালো সমাজ গঠনমূলক সাংগঠনিক ভিত্তি। অন্যদিকে সেসময়ে অনড়, স্থবির, শতবিভক্ত সমাজ জীবনে প্রতিকূলতা ছিল পদে পদে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-উন্নয়নের ধারণা ও তার প্রয়োগ সমাজের সব স্তরেই কিছুটা হলেও গতিশীলতা এনে দিয়েছে।

১৮৯০ -এর শুরুর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ জনতা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেন। তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রথম বাংলা সাহিত্য আকাদেমির উদ্বোধক ছিলেন তিনি, যেটি পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামে পরিচিতি পায়। এরপর তিনি পরপর 'সাধনা' (১৮৯৮), 'ভারতী' (১৮৯৮-৯৯), ও 'বঙ্গদর্শন' (১৯০১-০৫) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক লেখাপত্র লিখতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন ভাবে জনগণের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরেন। তাঁর কবিতা এবং গানগুলি স্বদেশি আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বাঙালির ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য 'রাখিবন্ধন' শুরু করেন, যা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জনসেবার আর একটি দিক ছিল ভাববাদী রূপে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিদ্যালয়। ১৮৯০ এর আগে রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল কম। ১৮৯০ থেকে তিনি নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক জনসভায় আসতে শুরু করেন এবং এই ভাবধারাটি চলে ১৯০৮ পর্যন্ত। এরপর তিনি নিজেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নেন।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের জাতীয়তাবোধ জানার জন্য প্রয়োজন সেই সময়ের ভারতবর্ষ ও বিশ্বের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি পাঠ নেওয়া। কারণ ভারতের ইতিহাসে ১৮৯১-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটেছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

উনিশ শতকের শেষে ভারতবর্ষ হারিয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৯৪), এম জি রানাডে (১৯০০)-র মতো তাঁর মহান সন্তানদের। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মকে শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৩)। আবার বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৪-১৯২০) রাজদ্রোহের বিচারের সময় দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক কার্যকলাপ (১৮৯৭), বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৫), দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ারের যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২), জাতীয় কংগ্রেসের বিভাজন (১৯০৭), অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে স্বশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন, অন্যদিকে ইংরেজ মহিলাকে হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির আদেশে বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বোমা বাঁধার অপরাধে অরবিন্দ ঘোষের গ্রেপ্তার, ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান, বালগঙ্গাধর তিলকের নির্বাসন ইত্যাদি একাধিক প্রেক্ষাপট নরমপন্থা ও আবেদন নিবেদন নীতির পরিবর্তে ভারতীয় রাজনীতিতে এক হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্ম দেয়। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও ঘটছিল একের পর এক পট পরিবর্তন। বিশ্ব রাজনীতিতেও যেন সেসময় এক দুর্ধর্ষ বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছিল।

১৯০০ সালে চিনের বিদ্রোহ এশিয়ায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯০২ সালে ইবন সুদের নেতৃত্বে সৌদি আরবের উত্থান, ইন্দো-জাপানের যুদ্ধে জাপানের বিজয়ের (১৯০৫) প্রভাব ভারতবর্ষেও পৌঁছায়। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসে যোগদান (১৮৯৪) প্রভৃতি বহির্বিশ্বের একাধিক ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিকেও প্রভাবিত করছিল। আর সেইসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনা, ধারণা ও কর্মযজ্ঞ সবটাই ছিল ইতিহাস সম্পৃক্ত।

এই সময়কার ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ বা ঠাকুর পরিবারের সদস্য রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে নির্ভর করতে হয় তাঁর লেখা চিঠিপত্র এবং আত্মজীবনীর উপর। ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথ বাড়ির বড়োদের ব্যাপারে কিছু কিছু লিখলেও নিজের স্ত্রী ও পরিবার সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। যদিও একাধিক চিঠি থেকে তাঁদের মধুর সম্পর্কের কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জমিদারি দেখাশোনার জন্য প্রায়শই বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হতো। ঘটনাপ্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর পাঁচ সন্তানেরই জন্ম হয় এই সময়ে। তাঁর প্রথম কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ এবং মৃণালিনী দেবীর অন্য তিন সন্তান রেনুকা ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে, মীরা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এবং শমীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স যখন কুড়ি বছর তখন তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী ছিলেন, তাঁর লেখাপত্রে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর কন্যাদের তুলনামূলক ভাবে কম বয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন, যদিও তখন আইন সম্মত বিবাহের বয়সই ছিল ১২। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠা দুই কন্যা এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ছোটো কন্যার বিবাহ দেন। এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে পারিবারিক চাপকে দায়ী করা হলেও মন থেকে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ যার মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে সেই মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, তাঁর কন্যাদের জন্য উপযুক্ত জামাইদের পণও দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কন্যাদের বিবাহপণ তিনিই শোধ করেন। সেইজন্যেই তাঁর মধ্যবয়সের লেখাগুলিতে মেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতার কথা তুলে ধরেছেন ও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকার বিরোধিতা করেছেন। এগুলি যে তাঁর নিজের মেয়েদের বিয়ের পরবর্তী কালের জীবনযন্ত্রণা থেকেই উঠে এসেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিয়ের পরেও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের খরচ আসত ঠাকুরবাড়ির জমিদারির তহবিল থেকে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৮ বছর বয়সে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আয় ছিল যৎসামান্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) মত অনুযায়ী, ১৮৯০ এ রবীন্দ্রনাথের মাসিক আয় ছিল ২৫০ টাকা। হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে পরিবারের কর্তা বা বাবা-ই ঠিক করে দিতেন সন্তানের সম্পত্তি ও আয়ের উৎস। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বন্ধুদের থেকে একাধিকবার ঋণ নেওয়ার অনুরোধের চিঠিপত্রগুলি থেকে। যদিও এই ঋণের কারণ ছিল মহৎ একটি উদ্দেশ্য সাধন। এই উদ্দেশ্যটি হল শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। বারবার স্ত্রীর গয়না বিক্রি করাই প্রমাণ করে যে, তিনি অর্থনৈতিকভাবে কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি তিনি বিখ্যাত হওয়ার পরও তাঁর প্রায় সমস্ত লেখার স্বত্ব বিক্রি করেছিলেন। আবার কোথাও উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবেও তাঁকে অর্থ খোয়াতে হয়েছে। তাঁর প্রিয় ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে) সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'Tagore and company' নামে একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ শুরু করেন। এটি ছিল তাঁর অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও সর্বনাশের অন্যতম কারণ। এই ব্যবসাটির মূল দায়িত্বে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে ১৮ বছর ধরে এই ব্যবসার জন্য নেওয়া লোন পরিশোধ করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর নোবেল পুরস্কারের

অর্থ ঠাকুর পরিবারের জমিদারি এস্টেটের সমবায় ব্যাঙ্কে নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের বেশিরভাগ সময় আর্থিক মন্দার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। তাই ঠাকুরবাড়ির সদস্য হয়েও তিনি ও তাঁর পরিবার কখনই বিলাসবহুল জীবন যাপন করেননি।

চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে তিনি জীবনের এক অন্যতম কঠিন সময় কাটিয়েছেন। এইসময় তিনি একের পর এক প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী (১৯০২), কন্যা রেনুকা (১৯০৩), পিতা দেবেন্দ্রনাথ (১৯০৫) ও কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথ (১৯০৭) তাঁকে ছেড়ে সবাই পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। এতো কিছুর পরও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। এর মধ্যেই তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকার আর্বানা শহরে অবস্থিত ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা ও গোপালন পড়ার জন্য পাঠান। এত মৃত্যু, এত শোকও তাঁর সৃজনশীলতাকে থামাতে পারেনি। মূলত তাঁর আধ্যাত্মিকতামূলক রচনাগুলি এই সময়েই রচিত।

আসলে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত এই যন্ত্রণার থেকে মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি পথ বেছে নিয়েছিলেন। প্রথমটি হল শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন ও দ্বিতীয় পথটি হল সৃজনশীল সাহিত্য রচনা।

এবার আসা যাক শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা পর্বে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে প্রার্থনা গৃহ (মন্দির) প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জমি কেনার মাধ্যমে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন ট্রাস্টি গঠন করেন এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতন আশ্রম। এরপর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রথীন্দ্রনাথ সহ পাঁচজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃণালিনী দেবীর কিছু গয়না বিক্রি করেন স্কুলের খরচ চালানোর জন্য। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন বসন্ত উৎসব। এটি কোনো ধর্মীয় উৎসব নয়। প্রকৃতপক্ষে, শান্তিনিকেতন হয়ে উঠে প্রকৃতিকেন্দ্রিক বিভিন্ন উৎসবের প্রাণকেন্দ্র। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের ব্রহ্মচর্যের মতো সহজ-সরল জীবনযাপন, নানান সাংস্কৃতিক উৎসব প্রভৃতি নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। এখানেই অন্য সব সাধারণ বিদ্যালয়গুলি থেকে আলাদা হতে থাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। আবার সাহিত্য জগতে এইসময়ে তিনি উপহার দিয়েছেন একের পর এক বিখ্যাত সব সৃষ্টি। এই সময়কার সাহিত্যে তাঁর একাকিত্বে

চিত্রগুলি ফুটে উঠেছে। তবে তিনি শুধু সাহিত্য চর্চার মধ্যে ডুবে থেকে বাস্তব জগতে জনগণের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'মন্ত্রী-অভিষেক' রচনা করেন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে, যদিও পরবর্তীকালে তিনি এই রচনাকে অন্যান্য সাহিত্যের সাথে প্রকাশ করেননি। এই পুস্তিকাটি ছিল তাঁর একটি বক্তৃতার লিখিত রূপ, যেটি ছিল জমির মালিকদের ইংরেজ সরকারের কাছে একটি দাবি যেখানে কোনো বড়ো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদে আরও ভারতীয়কে অধিষ্ঠিত করার দাবি। যদিও রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, রাজনীতি নিয়ে বলার অধিকার, মানসিক ইচ্ছা বা সাধনা কোনোটাই তাঁর বিশেষ নেই। এমনকি তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সুরকেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার আসলে ভালোই করতে চায়, কিন্তু তাদের পলিসিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সেই পলিসিগুলি ত্রুটিমুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য তিনি এলান অক্টিভান হিউম, জর্জ জুলে, উইলিয়াম ওয়েডবার্গের কথা স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা এই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন যে, ব্রিটিশ প্রশাসন তখনই ভালো কাজ করতে পারবে, যদি সেখানে কিছু ভারতীয় প্রতিনিধি থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে তিনি তাঁর ১৮৯০ এর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। এই ধরণের মতাদর্শকে তিনি খাঁচার ভেতর থেকে ডানা ঝাপটানোর মতো মনে করেন। যদিও তৎকালীন সময়ে পলিসি তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের থাকার অধিকার ঘোষণা করা এক অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ। তথাপি এই প্রবন্ধের জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ বিরোধী তকমা পেয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরিতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রথম পাঠ করেন। এই বক্তৃতাই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক ভাবনার দিক থেকে আরো কাছাকাছি এনেছিল। সেই ভাবনা থেকেই পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলন আরো প্রভাবিত হয়। তিনি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সম্মেলনে 'বন্দেমাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩) প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা যা পরে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতায় তিনি আবেদন নিবেদন ও ভিক্ষা নীতি ছেড়ে নিজের সামর্থ্যের ওপর ভরসা করতে বলেছেন। আত্মশক্তি উন্মোচনের

কথা বলেছন। এই পর্বের রাজনৈতিক ধারণা ১৮৯০ -র ধারণার চেয়ে অনেকখানি আলাদা। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বে বিভিন্ন সভায় দেওয়া বক্তৃতাগুলিই আসলে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বক্তৃতাগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি এই পর্বে কতটা সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথের বহির্বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করে, যা তাঁকে নতুনভাবে রাজনৈতিক সচেতনতার আলোকে আলোকিত করে। 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৮৯৩) প্রবন্ধে তিনি বলছেন, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া-মায়া ইত্যাদি বড়ো গুণগুলি সাধারণত সমকক্ষ লোকেদের মধ্যে যতটা প্রকাশ পায়, অসমকক্ষ লোকেদের মধ্যে ততটা প্রকাশ পায় না। ইউরোপীয়রা ইউরোপে সভ্য, সদয় ও ন্যায়পরায়ণ হলেও ইউরোপের বাইরে তাদের এই গুণ ততখানি প্রকাশিত হয় না।

> "তাহারা মনে করে, ধর্মনীতি আজকাল বড়ো বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁত খুঁত করিলে কাজ চলে না।"[১]

আবার ভারতীয়রা ইংরেজকে দোষী সাব্যস্ত করতেও পিছুপা হয় না।

> "আমরাও সেই জন্য ইংরেজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। আজ যে কংগ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, ইংরেজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নেই।"[২]

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যখন চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে সেই সময় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বুয়ার অধিনেতা পল্ ক্রুগার সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার ফলে ইংরেজরা ক্রমশ ফুঁসতে থাকে। এসবের অল্পকাল পরেই পল রোডসের নেতৃত্বে ইংরেজরা ম্যাটেবেল্যাণ্ড গ্রাস-এর অভিযান শুরু করে এবং গোটা ম্যাটেবেল রাজ্যকে গ্রাস করার জন্য যুদ্ধ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলে, তার বিবরণ পাওয়া যায় 'ট্রুথ' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ 'ট্রুথ' পত্রিকায় এই ভয়াবহ নারকীয় অত্যাচারের বর্ণনা পাঠ করে ক্ষুব্ধ হন। এই পাঠের প্রতিক্রিয়ার ফসল — 'রাজনীতির দ্বিধা'। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অমানবিক রূপটি ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি এরূপ মনোভাব সেকালে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী। আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষদের হয়ে কলম ধরতেও দেখা যায়নি তৎকালীন কোনো কবি-

সাহিত্যিককে। তিনি কঠোর ও তীক্ষ্ণ ভাষায় এই অত্যাচারী ইংরেজদের সমালোচনা করলেও মুষ্টিমেয় বিবেকবান ইংরেজের প্রতি তিনি তখনও আস্থা রেখেছিলেন।

> “কিন্তু যতদিন ইংরেজ প্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যতদিন তাহার নিজের সুকৃতি-দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদের সভা-সমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে।”[৩]

তবে রবীন্দ্রনাথের এই ভরসাও খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর ‘অপমানের প্রতিকার’ (১৮৯৪) প্রবন্ধটির প্রেক্ষাপটেও রয়েছে আরেকটি ঘটনা। কোনো এক উচ্চপদস্থ বাঙালি গভর্নমেন্ট কর্মচারীর বাড়িতে এক কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তখন জুরিদমন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেই ইংরেজ অধ্যক্ষ মন্তব্য করেছিলেন এদেশিয় লোক অর্ধশিক্ষিত, এদের ধর্মনীতি উন্নত নয়, তাই জুরির অধিকার তাদের হাতে পড়ে ব্যর্থ হবে। এই ঘটনাকে মাথায় রেখেই দু’বছর পর রবীন্দ্রনাথ ‘অপমানের প্রতিকার’ প্রবন্ধটি রচনা করেন।

১৮৯০ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল বিলের আন্দোলনের পর কংগ্রেস ক্রমশ এদেশিয় বুদ্ধিজীবীদের একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ইংরেজ সরকার এটি ভালোভাবে নেয়নি। নানাভাবে সে এই জাতীয় ঐক্যকে খণ্ডন করার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি করে গোলোযোগ বাধাবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে এই সময় বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এক নব হিন্দু-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তখন জাতীয়তাবাদে যুক্ত হয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব। তখন গোরক্ষার নামে শুরু হয় আরেক জাতীয় ঐক্যবোধ। এতে মুসলিমরা যতখানি না আতঙ্কগ্রস্ত হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত হল ইংরেজরা। অল্প কিছুদিনের মধ্যে গোরক্ষাকে কেন্দ্র করে স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধের পেছনে ইংরেজের যে উস্কানির কাজ করছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই পটভূমিতে রচিত হয় ‘ইংরেজের আতঙ্ক (১৮৯৩) প্রবন্ধটি। ইংরেজদের আতঙ্কের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন।

> "১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেন্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।"[৪]

হাণ্টারের মতে এই কাজ উচিত কাজ। কারণ ভারতে বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতির বাস। তাই কোনো একটি জাতি হঠাৎ প্রবল হলে তাকে দমন করা দরকার। কিন্তু ইংরেজরা তাদের দল বেধে কলকাতা আগমনের সঠিক কারণ যখন জানতে পারল, তখন সাঁওতালদের রক্ত ঝরে গেছে। তবুও ইংরেজরা প্রয়োজন মতো আইন সংশোধন করে। কিন্তু তখনও এই জাতি সম্পর্কে যে তাদের ভয় দূরীভূত হয়নি তার সাক্ষ্য দেয় তখনকার দিনের একাধিক পত্র-পত্রিকা। যদিও সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়, তখনও পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে কোনো রকম প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয়নি, উপরিউক্ত ঘটনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এরকম আঘাত জাতীয় কংগ্রেসের উপর আসেনি। কিন্তু ইংরেজদের ইন্ধনে ধীরে ধীরে মুসলিমরা জাতীয় কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ায়।

> "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেন্টের পলিসিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেন্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে, আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে তো পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে লাগিল।"[৫]

সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করলে বোঝা যায়, এই অতি সক্রিয় হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের গোরক্ষণী আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো সহানুভূতি ছিল না বা আস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের প্ররোচিত কূট সাম্প্রদায়িক নীতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

> "গোরক্ষার মত একটি ধর্মীয় কুসংস্কার-আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া যখন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত হইতেছে, এবং সে সময় নাকি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং হিন্দু-মুসলিম জাতীয় ঐক্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচিত হইতেছে, তখনও তিনি ইহার ঠিক সরাসরি প্রতিবাদ করিলেন না। অথচ প্রাচীন বা সনাতনপন্থী-হিন্দুদের বহু প্রতিক্রিয়াশীল মতামতকে তিনি তর্ক ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়াছেন।"[৬]

তবে বলা যায় এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তিলকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই তিনি এই ধরনের আন্দোলনের সরাসরি কোনো প্রতিবাদ করেননি।

তিলক প্রবর্তিত গোরক্ষা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল, তা পূর্ববর্তী 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। সেতারা জেলার 'বাই' নগরের ঘটনাটির পেছনে সত্যকারের সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল না। সেখানে বহুকাল ধরেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল। হিন্দুদের একটি পূজা উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের উপর নিষেধ জানায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু হিন্দুরা সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় তেরো জন হিন্দুর কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে। তারই ফলস্বরূপ ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয় 'সুবিচারের অধিকার' (১৮৯৪) প্রবন্ধটি। ইংরেজ সরকারের এই হীন অভিসন্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। প্রবন্ধের শুরুতে তিনি ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন।

> "উক্ত নগরে হিন্দুসংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোনো কালে কোনো বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোন বিবাদ নাই— বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেন্টের।"[৭]

আসলে ইংরেজ শাসক দ্বন্দ্বের আভাসমাত্র পেলে সেখানে দাঙ্গা লাগানোর সুযোগটুকু ছাড়ে না। এক প্রবল নিপুণতায় দ্বন্দ্ব মেটানোর প্রচেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে রাখে অশান্তি জাগিয়ে তোলার মন্ত্র। জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যাতে না হয়, তার জন্য মুসলিম জাতির প্রতি

আকস্মিক বাৎসল্য রসের উদ্রেক ঘটিয়ে তাদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় নিয়ে ইংরেজদের কাছে দরবার করতে চাননি।

> "গবর্মেন্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোন আবশ্যক নাই, সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।"[৮]

আবার দল বেঁধে বিপ্লব প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> "দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে— আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটি বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।"[৯]

আসলে রবীন্দ্রনাথ কোনো দল-সংগঠন এই ব্যাপারগুলি নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি যখনই অন্যায়-অবিচার দেখেছেন তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি সেই সময় দেশে কয়জন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন—

> "যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগুলিতে ইংরেজের সম্প্রদায়িক প্ররোচক রূপটি বারবার চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি নিজেকে বারবার হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেছেন এবং তাঁদের হয়েই

তিনি সমাজের কথা বলেছেন। অর্থাৎ হিন্দুত্বের ঊর্ধ্বে গিয়ে তখনও রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সমস্যা বলতে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে ভাবতে পারেননি।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভার অধিবেশন বসে নাটোরে। সেখানে সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)। কংগ্রেসের এই সম্মেলনে সভা পরিচালনা ও বক্তৃতার ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) প্রমুখ নবীনদের সঙ্গে প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের মতপার্থক্য হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত নবীনদের চাপে সম্মেলনের বক্তৃতার ভাষা বাংলাই হয়। এইসব রাজনৈতিক বক্তৃতার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় নিজের বাসভবনের নিকট স্থাপন করেন 'স্বদেশী ভাণ্ডার'। এর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশি দ্রব্য বা হাতের কাজগুলিকে বাজারজাত করা। এর এক বছর পর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি টাউন হলের মঞ্চ থেকে 'রাজদ্রোহ বিল'-এর বিরোধিতা করেন।

রবীন্দ্রনাথের এইসময়ের লেখাপত্রের একটা বড়ো অংশ রাজনৈতিক ভাবধারা সমৃদ্ধ। ১৮৯৩-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশটির মতো ঘোষিত রাজনৈতিক মতাদর্শপুষ্ট রচনা পাওয়া যায়। এই সময়কার এই বক্তৃতাগুলি পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রবন্ধাবলিতে স্থান পেয়েছে। এই সময়কার প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রাচুর্য পাওয়া যায়। 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশ', 'সমাজ' এবং 'পথ ও পাথেয়' এই প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির প্রায় সবকটি প্রবন্ধই তাঁর কোনো না কোনো সভার বক্তৃতা। বক্তৃতার পর এগুলি এককভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী কালে ১৯০৫ -১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯০-১৯০৮ এর মধ্যে লেখা রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে তাঁর এই সময়কার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার তিনটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথম পর্যায়ের সুরটি পাওয়া যায় তাঁর 'রাজা-প্রজা' (১৮৯৪) প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন, ইংরেজদের কাছে কংগ্রেসের অনুনয়-বিনয় নীতি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল এবং প্রয়োজন হয়েছিল আত্মসম্মান জাগরণের। 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন মেকি ইংরেজ সেজে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখানোর চেয়ে খাঁটি ভারতীয় হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই মনোভাবের আরও সুতীব্র আকারটি ধরা পড়ে 'রাজদ্রোহ বিল'-এর বিরোধিতায় যা 'কণ্ঠরোধ' ও 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কণ্ঠরোধ' (১৮৯৮)

প্রবন্ধটি আলোচনার আগে তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন বোম্বাইয়ে প্লেগ নিবারণ কমিটির প্রেসিডেন্ট W. C. Rand এবং Lieutenant Hyerst -কে দুজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক হত্যা করেন। এই ঘটনায় ইংরেজ সরকারের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তিলক ও নাটুভাই যুগল-এর উপর। তাঁদের অপরাধ হল তাঁদের 'কেশরী' পত্রিকায় (১৫ জুন) 'শিবাজী উৎসব'-এর বিবরণ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল। বালগঙ্গাধর তিলককে ইংরেজ সরকারের পুলিশ গ্রেফতার করে। এর কিছুদিন পর নাটুভাই যুগলও গ্রেফতার হন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এত বড়ো ঘটনায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো প্রবল প্রতিবাদ বা আন্দোলন কিছুই হল না। এমনকি তিলকের মামলা চালানোর জন্য কংগ্রেসের কোনো ব্যারিস্টার পর্যন্ত সরাসরি এগিয়ে আসেননি। কিন্তু কলকাতায় মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২), শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) ও মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২) প্রমুখের সহযোগিতায় তিলকের মামলার খরচ চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এই প্রসঙ্গে অমল হোম 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় শ্রাবণ-আশ্বিন (১৩৬৩) সংখ্যায় লেখেন—

> "১৮৯৭ সনে, তিলক রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত, বোম্বাই হাইকোর্টে তখন তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য কৌঁসুলী পাওয়া দুর্লভ হইল, উকিল মহলেও এমনি আতঙ্ক। তিলক কলিকাতার শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবস্থা জানালেন। কলিকাতা হইতে কৌঁসুলী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অফিসে পরামর্শ সভা আহূত হইল। আমন্ত্রিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, সভাকক্ষে শুভ্র উত্তরীয় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন— ললাটে তাঁহার রক্ত তিলক। তিলকের জন্য কলিকাতার কৌঁসুলী নিয়োগের ব্যয় নির্বাহার্থ চাঁদা তুলিবার কাজে রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে যোগদান করিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি চাঁদার জন্য তারকনাথ পালিত মহাশয়, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা না-করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট গিয়া এক হাজার টাকা আদায় করেন।"[১১]

এভাবেই সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় সেই সময় ১৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তিলকের মামলা পরিচালনার জন্য। তিলকের হয়ে মামলা লড়ার জন্য মিঃ পিউ এবং গার্থ নামে দুই ব্যারিস্টারকে বোম্বাই

পাঠানো হয়। এঁদের সঙ্গে জুনিয়র হিসেবে পাঠানো হয় আশুতোষ চৌধুরীর (১৮৬০-১৯২৪) ভাই যোগেশ চৌধুরীকে। আগেই বলা হয়েছে যে, এই সব উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

এত কিছুর পরও ১৫ অক্টোবর তিলকের ১৮ মাসের সাজা হয়। এই ঘটনার দু'মাস পর ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের অমরাবতী সম্মেলন। এই অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস তিলক, নাটুভাইদের সাজা, প্যুনিটিভ পুলিশ প্রেস অ্যাক্ট ও ফৌজদারী আইনের সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেসের গৃহীত সেই সব প্রস্তাব ছিল নিতান্তই মামুলি ও আনুষ্ঠানিক, — কারণ এই সব প্রস্তাবে না ছিল কোনো উত্তাপ, না ছিল কোনো ধার, না ছিল কোনো ভার। এই অধিবেশনের সভাপতি শংকরণ নায়ার ও তৎকালীন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর কাছে ইংরেজ সরকারের এইসব অন্যায়-অত্যাচারকে 'blunder' ও 'mistake' ব'লে মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এইসব প্রস্তাবকে খুব ভালো ভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না।

অন্যদিকে কলকাতায়ও 'সিডিশন বিল'-এর মতো এমন একটি মারাত্মক ও সর্বনাশা বিলের বিরুদ্ধেও কোনো প্রতিবাদ বা আন্দোলন হয়নি। শুধুমাত্র 'Bengalee' ও 'Amrit Bazar' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এই বিলের বিরুদ্ধে একটু সমালোচনা করেছিল মাত্র। অবশেষে ১৮৯৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক 'টাউন হল'-এ এই বিলের বিরুদ্ধে একটি সভার আহ্বান করা হয়।

এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত 'কণ্ঠরোধ' ভাষণটি পাঠ করেন। যদিও এই সভার সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বাঁধা। আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন শুধুমাত্র একজন উদীয়মান কবি ও লেখক মাত্র, তার উপরে তাঁর এই ভাষণটি বাংলা ভাষায় দেওয়া, তাই কংগ্রেসের প্রবীণ ও প্রধান সারির নেতারা তাঁর বক্তব্যকে তেমন গুরুত্বই দেননি। এমনকি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোও তেমন গুরুত্ব দেয়নি। দু'মাস পরে এই বক্তৃতাটি 'কণ্ঠরোধ' শিরোনামে 'ভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩০৫) প্রকাশিত হয়।

ইংরেজদের অনুগ্রহে পাওয়া 'পবিত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা' সম্পর্কে ভারতবাসী এতকাল যে মিথ্যে আশায় ছিল, তা যে কতখানি ঠুনকো, যতখানি অলীক তা তখন সবাই উপলব্ধি করতে পারছিল। এটাই ছিল ওই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। তিনি তাঁর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন —

"আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্য-মাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্বানুভব করিবার কোন কারণ নাই। দোষ করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোন গৌরব নাই।"[১২]

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উঠে আসে, তা হল 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ বড়োলাট লর্ড লিটন জরুরি ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই আইনটি পাশ করিয়ে নেন। ফলে দেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক মহলে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। আসলে সত্তরের দশক থেকেই বাংলার দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি ইংরেজ সরকারের অন্যায়-অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা শুরু করে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাগুলি হল 'সাধারণী', 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক), 'ঢাকা প্রকাশ', 'হিন্দু-হিতৈষিণী (ঢাকা), 'ভারত-মিহির' (মৈমনসিংহ) প্রভৃতি। বড়োলাট লিটন এই পত্র-পত্রিকা গুলি থেকে প্রায় ১৫০ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, এই পত্র-পত্রিকাগুলি ইংরেজ সরকারের পক্ষে খুবই বিপদজনক। তাই এই সব দেশিয় ভাষার পত্র-পত্রিকাগুলিকে কঠোর হাতে ও ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সরকার এই ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টটি তৈরি করে। ফলে তৎকালীন 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' এর নেতৃত্ববৃন্দ এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভসভা করেন। যদিও এই আইনটি ছিল বাংলার ছোটোলাট এ্যাস্লি ইডেনের মস্তিক প্রসূত।

এই আইনের তীব্র বিরোধীতা করে কলকাতার টাউন হলে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৭ এপ্রিল এক বিশাল প্রতিবাদ জনসভার আহ্বান করা হয়। এই সভায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ সমবেত হন।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের এই প্রতিবাদ সভার ঠিক কুড়ি বছর পর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি এই টাউন হলেই 'সিডিশন বিল' এর বিরোধী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় 'সিডিশন বিল' ও 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' বিরোধী যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল সেগুলি একত্রে স্মারকলিপির আকারে ইংল্যণ্ডে পাঠানো হয়, যাতে সেগুলি পার্লামেন্টের কমন্স সভায় বিবেচনা করে দেখা হয়। এই স্মারকলিপিতে

সভাপতি হিসাবে প্রথমেই স্বাক্ষর করেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেক্রেটারি আনন্দমোহন বসু।

এই মেমোরিয়ালটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তৎকালীন বিরোধী-দলনেতা, গ্লাডস্টোনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ২৩ জুলাই ১৮৯৮, পার্লামেন্টে ওই মেমোরিয়ালটির ভিত্তিতে আলোচনা ও বিচার-বিবেচনার দিন নির্ধারিত হয়।

গ্লাডস্টোন অবশ্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন। কিছু দিন পরেই তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভার্নাকুলার প্রেস আইন প্রত্যাহার করলেও 'Arms Act'-টি প্রত্যাহার করেননি।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাতেও প্লেগ মহামারি আকার ধারণ করে। তবে বোম্বাইয়ের মতো প্লেগ নিবারক বাহিনী কলকাতায় তেমন উৎপাত করেনি। কারণ র‍্যাণ্ড-হত্যা ও তার পরবর্তী ঘটনা দেখে ইংরেজ সরকারও এইসব ব্যাপারে খুবই সতর্ক হয়ে উঠেছিল। এমনকি বাংলার তৎকালীন লেফট্যানেন্ট গভর্নর স্যর জন উড্‌বার্নও দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে শুরু করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব দেখে মোটেও আশ্বস্ত হননি। তখন তিনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। ভারতীর 'প্রসঙ্গ কথা'য় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫) তিনি ইংরেজের বর্বর দমননীতির তীব্র নিন্দা করে লেখেন—

> "এইরূপ দুর্যোগই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি। ...পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবর্দস্তি-ভয়ের নিষ্ঠুরতা মাত্র। ...এবার প্যুনিটিভ পুলিশ, নাটু-নিগ্রহ, সিডিশন-বিলের দ্বারা গবর্মেন্ট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা স্বল্পসংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করি না। ... দেখিলাম, গবর্মেন্টের উত্তরোত্তর রাগ ও জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। যেখানে যত বেদনা, শাসনকর্তা সেখানে তত আঘাত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভারতবর্ষের আদ্যন্তমধ্যে অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশ্যে ফুটিবার উপক্রম করিল, কোথাও গোপনে গুমরিয়া উঠিল। এ দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে এরূপ ক্ষুব্ধ অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই। ... আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে।"[১৩]

পরবর্তীকালে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, দিল্লি দরবার ভারতীয় কাঠামো হওয়া সত্ত্বেও বৈদেশিক শাসনে তার অবসান আসন্ন, যদিও এই দরবার ভারতীয়দের কাছে এক অন্যরকমের দ্যোতনা বহন করে। তখন তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা শুরু করেন। এই ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ পৃথক একটি দর্শনের ওপর নির্মিত যা কেবলমাত্র শক্তি প্রদর্শন নীতিতে বিশ্বাসী।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ এক সর্বধর্ম ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক ঐক্যবদ্ধ সভ্যতার কথা বলেন। তাই এই সময়কার রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলির মধ্যে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯০২) নামাঙ্কিত প্রবন্ধটি অতি উল্লেখযোগ্য। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও জাতীয়তাবাদী চেতনা যা পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহেরুর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) 'Letters of John Chinaman' নামে একটি বই রবীন্দ্রনাথকে পাঠান বিলেত থেকে। ১৩০৯ এর আষাঢ় সংখায় 'চীনের চিঠি' নামে পুস্তিকাটির একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। যা পরবর্তীকালে 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধ সংকলনে স্থান পায়। এই প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বইটির মধ্যে রয়েছে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে গভীর ঐক্যের কথা। ভারতীয় সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে ঐক্য খুঁজে পেয়েছে এটি একটি বড়ো গৌরবের কথা। আবার এটাও ঠিক যে, এশিয়ার সভ্যতা সুপ্রাচীন এবং চিরন্তন। ইউরোপ ও অন্যান্য বিদেশিদের সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংঘাত ভারতবাসীকে তার প্রাচীন ঐতিহ্য, স্বদেশ প্রেমকে আরও জাগিয়ে তুলেছে। এই সত্য কেবল ভারতবর্ষ নয়, বরং সমস্ত সভ্য এশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবেই এই তত্ত্ব খুঁজতে চেয়েছিলেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য:

> "প্রথমত ভারতবর্ষের সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে ইহাতেও আমাদের বল; দ্বিতীয়ত এশিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়া এই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ 'চীনেম্যানের চিঠি' (১৯০২) প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যগুলি উদ্ধৃতি সহকারে ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রাচ্য সমাজের সাধারণ ভিত্তি, পারস্পরিক ঐক্য, শান্তি-শৃঙ্খলা, সংযাপনের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সার্থকতা

বর্ণনা করেছেন। যদিও চিঠিটিতে কোথাও শান্তি-শৃঙ্খলা সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। আর এখানেই বোধহয় চীনের জাতীয়তাবোধ আলাদা হয়ে যায়।

> "চীনদেশ সুখী, সন্তুষ্ট, কর্মনিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু সেই সার্থকতা পায় নাই। অসুখে অসন্তোষে মানুষকে ব্যর্থ করিতে পারে, কিন্তু সুখে সন্তোষে মানুষকে ক্ষুদ্র করে। চীন বলিতেছে, আমি বাহিরের কিছুতেই দৃকপাত করি নাই; নিজের এলাকার মধ্যেই নিজের সমস্ত চেষ্টাকে বদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছি।"[১৫]

অন্যদিকে ভারতবর্ষের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য ছিল-

> "ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। নিজেকে শতধাবিভক্ত অন্ধ চেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অন্তরের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহ্য বিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল।... ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, সুখ-শান্তি সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে-আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল। যদি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই, জড়ত্ববশত সেই পরিণামকে উপেক্ষা করি, তবে বন্ধন কেবল বন্ধনই থাকিয়া যায়, তবে অতিক্ষুদ্র সন্তোষশক্তির কোন অর্থ থাকে না।"[১৬]

এরপূর্বে 'বঙ্গদর্শন'-এ (১৮৭২) 'সমাজভেদ' (১৯০১) নামক প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একই রকমের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কনটেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রে ডাক্তার ডিলনের 'ব্যাঘ্র চীন এবং মেষশাবক য়ুরোপ' প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধটিতে বারবার ইউরোপ ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা উঠে এসেছে এবং প্রাচ্যদেশ হিসেবে চীন ও ভারতবর্ষের ঐক্য যেন সামান্য হলেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

> "য়ুরোপীয় সমাজ অনেক মহাত্মা লোকেরা সৃষ্টি করিয়াছে; সেখানে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান প্রত্যহ উন্নতিলাভ করিয়া চলিতেছে; এ সমাজ নিজের মহিমা নিজে পদে পদে প্রমাণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে;"[১৭]

অন্যদিকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—

> "অপর পক্ষে বহুশত বৎসরের অনবরত বিপ্লব যে সমাজকে ভূমিস্যাৎ করিতে পারে নাই, সহস্র দুর্গতি সহ্য করিয়াও যে সমাজ ভারতবর্ষকে দয়াধর্ম-ক্রিয়াকর্তব্যের মধ্যে সংযত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে;"[১৮]

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ বারবার প্রাচ্যের ঐক্যসূত্র তুলে আনছেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষের সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বারবার আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা, প্রাচীন ঐতিহ্য-র কথা উল্লেখ করেছেন।

'বঙ্গদর্শন'-এ কেবলমাত্র জাতীয়তার আদর্শবোধমূলক বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক বিষয়ে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, এই সময়ে বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৩০৯ -র কার্তিকে প্রকাশিত হয় 'মাভৈঃ' (১৯০২) প্রবন্ধ। যেখানে তিনি জাতিকে নির্ভীক মৃত্যুবরণের 'মাভৈঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। তিনি দেশকে যথার্থ ভালোবেসে তার চরম পরীক্ষার জন্য মৃত্যুবরণেও পিছপা হতে বারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এহেন মনোভাবের কারণ হিসেবে তৎকালীন কংগ্রেস মডারেট নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ও তোষণনীতিমূলক মনোভাবকে দায়ী করা যায়।

এই প্রসঙ্গে আসে লর্ড কার্জনের কথা। ভারতবিদ্বেষী লর্ড কার্জন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসবের ভাষণে ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রকে কটাক্ষ করেন। তাঁর এই বক্তৃতার বিরোধিতায় কলকাতার টাউন হলে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার কয়েক মাস পর (১৯০৩, আগষ্ট) সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে কার্জন দিল্লিতে বাদশাহী দরবারের আয়োজন করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' (১৯০২) (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯) প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়— দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত মহামারি কাটিয়ে ওঠা মানুষের দুঃসময়ে এই রাজকীয় আয়োজন রবীন্দ্রনাথকে আহত করেছে এবং কার্জনের কটাক্ষের যথোপযুক্ত প্রতি জবাবও হাজির করেছেন এই প্রবন্ধে। শুধু তাই নয়, এক বিশেষ শ্রেণিকেও তিনি সমালোচনা করেছেন —

> "এ দিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত বড়ো দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের হাতে নাই— অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি।"[১৯]

এই অভিষেকের উৎসব নিয়ে তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা ছিলেন প্রায় মৌন। দু-একজন নেতা মৃদু আপত্তি তুললেও তাতে সমালোচনা বা আপত্তির চেয়ে ইংরেজদের প্রতি তোষণের পরিমাণই ছিল বেশি। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনের অভিভাষণের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে তিনি জাঁকজমক, অপব্যয়ের প্রতি সামান্য আপত্তি করে দরবার বা অধিবেশনের গুরুত্বের উপরই বেশি আলোকপাত করেছেন। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক পথ থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হতে শুরু করে।

নেপাল মজুমদার 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ শচীন সেনের 'Political Philosophy of Rabindranath' গ্রন্থটির সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছিলেন —

> "ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায়, আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়।"[২০]

পরবর্তীকালে এই লেখাটি 'কালান্তর' প্রবন্ধ স্থান পায়।

উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই 'নেশন', 'ন্যাশনাল' এসব নিয়ে প্রবল উৎসাহ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 'নেশন' কথাটির সঙ্গে কোনো সর্বাহিতের সম্ভাবনাকে সর্বজনীন ধ্যান-ধারণার

সঙ্গে মেলাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ফরাসি ভাবুক এর্নেস্ট রেনাঁর 'নেশন' সংক্রান্ত আলোচনার পরিচয় দিয়েছেন 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'নেশন কী' প্রবন্ধে। প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। যদিও সেটির রচনাকাল ১৯০১। যদিও আগের শতকের শেষ দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথ নানা পত্র-পত্রিকায়, প্রবন্ধে, সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের টীকাটিপ্পনীতে 'নেশন' বিষয়ে অনেক প্রশ্নে সোচ্চার হন। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের অভাব-অভিযোগ, দাবিদাওয়ার সূত্রেই 'নেশন' কথাটির প্রয়োগ শোনা যেত। শব্দটিতে কিন্তু দেশে সব শ্রেণির মানুষকে জড়িয়ে নেওয়ার ব্যঞ্জনা রয়েছে আর এই অসঙ্গতিতেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। ইংরেজ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় যেটা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ, তা হল ওই সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনকে লণ্ডভণ্ড করা। আর সেই বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচানোর কর্তব্যকে অগ্রগণ্য মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। আর ঠিক তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 'নেশন' ভাবনায় সায় দিতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'নেশন কী' (১৯০১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ফরাসি ভাবুক রেঁনা-র কথা উত্থাপন করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি 'নেশন' এর কোনো বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেননি। রেঁনা প্রাচীনকালে 'নেশন' এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না বলেই স্বীকার করেন। তবে 'নেশন' নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য উঠে এসেছে প্রবন্ধটিতে। রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্‌দের মতে 'নেশন' এর মূল হল রাজা। রাজা একাধিক দেশ জয় ক'রে "সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে।"[২১] এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে ন্যাশনাল অধিকারের কথা এবং ন্যাশনাল অধিকারের ভিত্তি হিসেবে আসে জাতিগত ও ভাষাগত ঐক্যের কথা। যদিও এই দুটির কোনোটিই একমাত্র ভিত্তি নয়। 'নেশন' হল একটি সজীব সত্তা, যার মধ্যে মূলত দুটি বিষয়ের সংমিশ্রণ রয়েছ। একটি হল প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ বা অতীতের কীর্তি, মহত্ব ইত্যাদি এবং আরেকটি অংশ হল- পরস্পর সম্মতি সহকারে একত্রে বাস করার মাধ্যমে অতীত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যকে রক্ষা করার ইচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা যখন শুরু হচ্ছে আর তার ঠিক আগেই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে মার্ক্সবাদের শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব। এই সময় পুঁজিবাদ কীভাবে মানুষে মানুষে, জাতি-রাষ্ট্রের ভিতরে বাইরে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও ভেদাভেদ তৈরি করছে তা প্রকট হয়ে উঠেছে সর্বত্র। তাই এর বিরুদ্ধে ঘোষিত হল সেই আহ্বান যা দুনিয়ার সব শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ক'রে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক বিশ্বজোড়া বিপ্লবে

সামিল করবে। তবে এই সব তত্ত্বের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ খুব একটা প্রভাবিত হননি। বরং একে অন্যের আত্মীয়তায় উদ্‌গ্রীব মানুষেই ছিল তাঁর গভীর আস্থা। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি সুখের তারতম্য হলেও সকলের যথাসাধ্য কল্যাণই ভারতীয় সমাজের মূলমন্ত্র। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'ভারতীয় সমাজ' (১৯০১)। তিনি তাঁর 'ভারতীয় সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন যে, যেকোনো উপলক্ষে অনেক মানুষ যদি একই মানসিকতার হয়, তাহলে সেখানে ফল অনেক ভালো হয়। সব সভ্যতার মূল মর্মকথা হল মিলন বা একতা। বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যই সভ্যতার মূল মন্ত্র। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্য এক নয়। 'নেশন', 'ন্যাশনাল' কথাগুলিই পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। তাই তারমধ্যে পাশ্চাত্যের ভাবনা মিশে আছে। ইউরোপীয়দের কাছে ন্যাশনাল ঐক্য বা রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ঐক্যই ছিল প্রধান এবং এর মূল মন্ত্র হল একতা। ইউরোপীয়রা বারবার পরাজিত গোষ্ঠীকে বর্বরের মতো নিশ্চিহ্ন করেছে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা সকলকে বুকে স্থান দিয়েছে। ফলে সকল বর্ণ, উচু-নিচু, নানা ধর্ম সবাই আশ্রয় পেয়েছে এখানে। এর পরিধি অনেক বৃহৎ হওয়ায় বিশালত্ব ও বৈচিত্রের মাঝে এর মূল আশ্রয়টি হারিয়ে গেছে। ফলে কোন বিষয়টি ঐক্যের আদর্শ হওয়া উচিত তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। তবে ভারতবর্ষে সমাজের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভারতীয় সংস্কৃতি বারবার আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও বিলোপ হয়নি শুধুমাত্র তার এই 'সমাজ'- এর কারণে। তাই সমাজকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে 'নেশনের' থেকে সমাজ বড়ো। অন্যান্য দেশে যেখানে 'নেশন' নানা বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আত্মরক্ষা করে জয়ী হয়- সেখানে ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল সমাজ নিজেই নিজেকে সকল প্রকার সংকট থেকে রক্ষা করেছে। এই দেশ যে হাজার বছরের শোষণ, উৎপীড়ন, পরাধীনতায় ধ্বংস হয়ে যায়নি, এখনও যে-

> "আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুদুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোটো ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে- সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে।"[২২]

রবীন্দ্রনাথ এই কল্যাণকর সমাজকেই সর্বোচ্চ আশ্রয় বলে মনে করেন।

উনিশ শতকের শেষ দশকে বা তার কিছু আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনৈতিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুভব করেছেন। তৎকালীন ভদ্রসমাজের রাজনীতি যে বেজায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায় ১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' (১৯০২) নামক প্রবন্ধটিতে। এলাহাবাদে সোমেশ্বর দাস নামে এক ধনী ব্যাঙ্কার সত্ত্বরক্ষার উপলক্ষে তাঁর কোনো এক ইংরেজ ভাড়াটিয়াকে ফুল গাছের টব নিতে বাধা দেন — সেই অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' প্রবন্ধটি রচনা করেন। ইংরেজ তথা ইউরোপের সাম্রাজ্যনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে। ইতিপূর্বে 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে আলোচিত ব্রাহ্মণ সন্তানের পাদুকাবহনের ঘটনাটি মনে করিয়ে দিয়ে ইংরেজ বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে —

> "যে-সকল জাতি law-abiding, অর্থাৎ বিনা বিদ্রোহে আইন মানিয়া চলে, তাহাদেরই অপমান আদালতের কাছে তুচ্ছ। যাহারা কিছুতেই শান্তি ভঙ্গ করিবে না, তাহাদিগকে অন্যায় আঘাত করাও অল্প অপরাধ। আর যাহারা অসহিষ্ণু, যাহারা নিজের আইন নিজে চালাইয়া বসে, সংগত কারণেও তাহাদের গায়ে হাত দিবার উপক্রমমাত্র অপরাধ। ব্রিটিশরাজ্যে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াইবার উপায় বাঘকে দমন করিয়া নহে, গোরুটারই শিং ভাঙিয়া।"[২৩]

প্রবন্ধটিতে আলোচনা প্রসঙ্গে এদেশে ইংরেজের প্রতি দেশি মানুষের অন্ধ সম্ভ্রমের কথা এসেছে। আসলে পাশ্চাত্যে পলিটিক্সের স্থান সর্বোচ্চ। পলিটিক্সের প্রয়োজনে ন্যায়-সততা সবকিছুই জলাঞ্জলি দিতে পারে।

> "এ কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্স্ সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নীচে। যেখানে পোলিটিকাল প্রয়োজন আসন ছাড়িয়া দিবে সেইখানেই ধর্ম বসিবার স্থান পাইবে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে সত্য কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, অন্য প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেছে। পোলিটিক্যাল প্রয়োজনে ন্যায়বিচারকেও বিকারপ্রাপ্ত হইতে হয়, পায়োনিয়র তাহা একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন।"[২৪]

এই বছরই অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মীনি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় (১৩০৯, ৭ অগ্রহায়ণ)। কবির পক্ষে এ আঘাত যে কত বড়ো মর্মান্তিক তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবুও কবি এই চরম

বিপদের দিনে দেশকে ভুলে যাননি। এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই 'বঙ্গদর্শন'-এ দেশের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বিতীয় পর্যায়টি লক্ষ করা যায় ১৯০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তখন তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও 'বিশ্ববিদ্যালয় বিল' -এর জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। তবে এই আন্দোলন চলাকালীন দেশের নেতৃত্ববর্গও আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। তখন তিনি ঘোষণা করেন জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভের চেয়ে বেশি জরুরি কর্মসূচি এবং তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধে।

একই সময়ে ১২ মার্চ 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল 'ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ক্রিমিন্যাল' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং 'ভারতী' পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী ঠাকুরের মেয়ে সরলা দেবী চৌধুরাণী (ঘোষাল) 'ইংরেজ ঘুষি দিলে আমরা কিল দিব' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই দুটি প্রবন্ধের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ হল 'রাজকুটুম্ব' (১৯০৩) ও 'ঘুষোঘুষি' (১৯০৩) ('বঙ্গদর্শন', ১৩১০)। এই দুটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় — ইউরোপীয়রা সমস্ত প্রাচ্যকে একটা পিণ্ড ভেবে সব দোষ গুণকে একটা লেবেল এঁটে দেয়। আসলে—

> "যাহার হাতে শক্তি আছে সে-যে স্বসম্প্রদায়ের দিকে টানিয়া অবিচার করিবে, ইহা মানুষের স্বভাব। ইংরাজও মানুষ, তাই সে ইংরাজ-ক্রিমিনালকে সাজা দিয়া উঠিতে পারে না। যাহার হাতে শক্তি নাই সে প্রবলের অন্যায়বিচার অগত্যা সহ্য করে, ইহাও মানুষের স্বভাব। আমরাও মানুষ, তাই আমাদিগকে ইংরাজের আক্রমণ চুপ করিয়া সহ্য করিতে হয়। এই এক জায়গায় মনুষ্যত্বের সমনিম্নভূমিতে ইংরাজের সঙ্গে আমরা একত্রে মিলিতে পারিয়াছি।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথ ঘুষির বদলে ঘুষি ফেরানোর প্রস্তাবে রাজি নয় এবং কেন তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন না, তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, একান্নবর্তী পরিবারের শিক্ষা ভারতীয়দেরকে পারস্পরিক আদেশ-উপদেশ পালন, মেলামেশায় সাহায্য করেছে এবং এই শিক্ষা নিজের অসুবিধা করে পরের সাথে ভাব করার সমর্থন করে। তাই —

"পরস্পরের সাথে লড়িবার ভাব আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও স্ফূর্তি পাইবার স্থান পায় নাই।"[২৬]

কিন্তু এর বাইরে গিয়েও যদি কেউ ইংরেজের গায়ে হাত তোলে, তাহলে ইংরেজ বিচারালয়ে তার বিচার হবে এবং সেখানে ইংরেজ বিচারকের পক্ষপাতদুষ্টতা যে ইংরেজের প্রতি থাকবে — সে বলা বাহুল্য। তাই ইংরেজ রাজত্বে রাজসম্পর্কের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উৎপাত সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। এই উৎপাত-ই তাদের সম্মানহানির কারণ হয়ে উঠবে — এ বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রাজশ্যালকের উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলেছেন।

আবার সরলা দেবীর প্রবন্ধটির সমালোচনা ও 'রাজকুটুম্ব' প্রবন্ধের সমালোচনার যুক্তি হিসেবে তিনি তাঁর 'ঘুষাঘুষি' (১৯০৩) প্রবন্ধে বলেছেন—

"ভারতবর্ষে যে মারে এবং যে মার খায়, এই দুই পক্ষের অবস্থা আমরা কিঞ্চিৎ তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। আমরা কোনো পক্ষকেই কর্তব্যসম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিই নাই।"[২৭]

ইংরেজের ঘুষির পাল্টা হিসাবে ভারতীয়দের কিল দেওয়া কতখানি অসম্ভব তার কারণ—

"ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষীয়কে মারা নিতান্ত সহজ— কেবল তাহার গায়ে জোর আছে বলিয়া যে, তাহা নহে। সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু সে কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার বাহুবল বেশি, কিন্তু তাহার পশ্চাতের বল আরও অনেক বেশি। তাহার দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু তাহার অদৃশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল।"[২৮]

সে অদৃশ্য শক্তি যে রাজশক্তি, যার প্রভাব বিচারব্যবস্থা, শাসন, সমাজ সর্বত্রই। কিন্তু তার জন্য ভারতীয়দের কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করাও ঠিক নয়। কারণ—

"যে লোক জলে পড়িয়াছে, ডাঙা হইতে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারা সহজ। অপরপক্ষের সে মার ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত। এরূপ স্থলে কোন পক্ষকে কাপুরুষ বলিব? যে মারে, না, যে মার ফিরাইয়া দেয় না?"[২৯]

আবার ইংরেজ ও ভারতবাসী এই দুই জাতের দুরকমের আচরণের কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবাসীর চরিত্র ক্ষমা, ধৈর্য্য, সন্তোষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মারামারি ভারতবাসীর কাছে একটা অনভ্যাসের ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের কাছে শারীরিক কষ্ট বা ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা কখনও ভয়ের বিষয় ছিল না।

> "ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুন্ডা হইয়া উঠি।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধটি শেষ করেছেন একটি উপদেশ দিয়ে—

> "অতএব ঘুষাঘুষি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তূণেও অস্ত্র আছে, দানবের তূণও শূন্য নহে— অপ্রমত্ত হইয়া অস্ত্র নির্বাচন যদি করিতে পারি তবেই যুদ্ধের অধিকার জন্মে।"[৩১]

'বঙ্গদর্শন' ১৩১০-এ রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' (১৯০৩) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে পরাজিত জাতি ও উপনিবেশগুলির উপর ইংরেজদের অমানুষিক নির্যাতনের বহু তথ্য সংকলন করেন। এই পর্বের বেশ কিছু প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবোধ ভাবনার পট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যেখানে নিজেই সক্রিয় প্রতিবাদের কথা বলেছিলেন, এখন তাঁর সে সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে এবং এর কারণ হিসাবে তাঁর নৈতিকতাবোধ, ধর্মবোধ ইত্যাদিকে দায়ী করা যায়। পরবর্তীকালে এই বোধ-ই আরো কঠোর আকার ধারণ করে এবং বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্যায়ের ভাবনাগুলি পাওয়া যায় ১৯০৫-১৯০৮ সালের মধ্যে তাঁর রচিত একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থে, যেমন- 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশ', 'ভারতবর্ষ', 'সমূহ', 'স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি। এই পর্বের সব থেকে উল্লেখ্যযোগ্য প্রবন্ধ হল 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' (১৯০৫)। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, বসন্তকালে ঝরে

পড়া কাজে না লাগা আমের বোলের মতো কিছু মানুষ উপদেশ দেন যা সাধারণত কোনো কাজে আসে না। তবে এই উপদেশ স্বদেশের উন্নতির জন্য যে একটি উর্বর ভূমি প্রস্তুত করেছিল, তা নিশ্চিত বলা যায়। স্বদেশের উন্নতির জন্য স্বদেশের মানুষের উদ্যোগ-ই প্রয়োজন। তবে সকলের সমান অধিকার বা সামান্যনীতি সেখানেই আশা করা যায়, যেখানে সাম্য রয়েছে। সাম্য নীতিটি আবার এশিয়া ও ইউরোপে অনেকটাই পৃথক ধারণা বহন করে। এশিয়াবাসী যাকে ঘৃণা করে, যাকে নিচ মানে তাকেও তার স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখার অধিকার দেয়। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা দয়া-মায়ার বাছ-বিচার করে না। নিজেকে জাহির করতে গিয়ে অন্যকে ধ্বংস করতেও পিছপা হয় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' বইটির উল্লেখ করেছেন। সেখানে জানা যায়, ইংরেজ একটি জাতিকে কীভাবে সব দিক দিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

ভারতীয়দের মধ্যে এক অদ্ভুদ ব্যাপার আছে। তাঁরা সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনা করে এবং অনুগ্রহ পাওয়ার অপেক্ষা করে। আসলে অবিশ্বাস করার জন্যও শক্তি প্রয়োজন। যেমন যিনি বিজ্ঞান চর্চা করেন তাঁকে অনেক প্রচলিত ধারণা অবিশ্বাস করতে হয়। এই রকম অবিশ্বাস অন্যের ওপর অবজ্ঞা বা ঈর্ষাবশত নয়, এটি নিজের বুদ্ধি ও কর্তব্যবোধের উপর সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজনীতিতে এইরূপ অবিশ্বাস প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে। ঐক্যের শক্তি মাহাত্ম্য ভারতীয়দের চেয়ে ইংরেজদের মধ্যে বেশি-

> "ঐক্যের যে কী শক্তি, কী মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে।"[৩২]

নিজেদের শক্তির ওপর অবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসের অভাব, হীনমন্যতা সবচেয়ে ভয়ংকর মোহ।

> "ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিনা। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল- এখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ।"[৩৩]

ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধ আনার জন্য, শক্তি খর্বের জন্য য়ুনিভার্সিটি সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্মেন্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব করার উপায় হিসেবে সংকল্প করেছেন। তবে ইংরেজদের উপর রাগ করে দেশের ওপর হঠাৎ মনোযোগ দেওয়া হলে, সে মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী হয়, তা স্থায়ী হয় না। অন্যদিকে সেই মনোযোগ যদি দেশের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা স্থায়ী হয়। তবে স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগার জন্য একটি ঝাঁকুনি দরকার।

> "তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে।"[৩৪]

প্রতিদিনের আরাম বিলাস ত্যাগ করে, ত্যাগ ও দুঃখের পথে স্বদেশকে বরণ করার মধ্যে যে সার্থকতা ও আত্মনিবেদন থাকে, তা কেবলমাত্র সভা ডেকে কথা বলার মাধ্যমে কখনই পাওয়া যায় না। দেশের অন্তর্জামী দেবতা যিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অন্নদাতা, তাকে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে যদি কোনোদিন আবেগের ঝড়ে ভারতবাসীরা সেই মহান দেবতাকে দেখতে পান তবে সেদিন আসমুদ্র-হিমাচল বেষ্টিত উদার দেশের প্রাণদেবতা দুর্জেয় ও প্রবল চিরজাগ্রত রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন আনন্দে প্রাচুর্যে "আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোন উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না।"[৩৫]

দেশের কর্মসভাকে একটি কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করে উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে হবে। গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য নিজেদের হাতে নিতে হবে। নিজেদের পল্লিপঞ্চায়েতকে জাগিয়ে তুলতে হবে। চাষিকে রক্ষা করতে হবে, কৃষির উন্নতি সাধন, গ্রামের স্বাস্থ্য বিধান এসবের দায়িত্ব নিতে হবে। এছাড়াও বাংলা

সাহিত্যের পুষ্টিসাধনও অন্যতম লক্ষ্য হতে হবে। পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, অপারেটিভ স্টোর, ঔষধালয়, সঞ্চয় ব্যাঙ্ক, সালিশ নিষ্পত্তির সভা ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে ছোটো ছোটো মিলনগৃহ তৈরি করতে হবে। তবেই এই খণ্ড খণ্ড সভাগুলি একত্রে বিশ্ববঙ্গ প্রতিনিধিসভা রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে মানুষকে একত্রিত করার প্রধান গুণ হল শৃঙ্খলা পরায়ণতা। নিজেকে সব সময় শ্রেষ্ঠ মনে করা, নিজের সুবিধার ব্যঘাত ঘটলে দল ত্যাগ বা বিরুদ্ধাচারণ করা মহৎ উদ্দেশ্যকে বাধা দেয়। এগুলি বিষের মতো ছড়িয়ে যজ্ঞকে নষ্ট করে। ঐক্য রক্ষার্থে অযোগ্যের কর্তৃত্বকেও স্বীকার করে নিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিকূলতার দ্বারাই যে ভারতবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন হবে সেটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

জাতীয়তাবোধ যে কেবলমাত্র পুরুষ হৃদয়েই আন্দোলিত হয়েছিল তা নয়, নারীরাও যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বদেশের অপমানের প্রত্যুত্তর দিয়েছিল সে কথাও তুলে ধরেছেন 'ব্রতধারণ' (১৯০৫) প্রবন্ধে। যুগে যুগে ভারতীয় নারীরা কেবলমাত্র সৌন্দর্যচর্চায় অন্তঃপুরে মেতে থাকেননি, কখনও রাজপুত রমণী হয়ে যুদ্ধ করেছে, কখনও বা স্বামী-পুত্রকে ত্যাগের মাধ্যমে আত্মবলিদান দিয়েছেন। আসলে নারী জাতিকে সাধারণত গৃহের কাজকর্ম ও সন্তান লালন পালনের শক্তিধারিণী হিসাবেই দেখা হয়, কিন্তু দেশের দেশীয়ত্ব রক্ষায় স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়ই সর্বোত্তম। ভারতীয় নারীরা প্রিয়জনের শুভকামনায় কৃচ্ছ্রব্রত ধারণ করেন, প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনেও সে ব্রত আরও কঠিনরূপ ধারণ করবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গ না দিলেও বিরোধীতা করেননি। তবে তিনি বারবার তাঁর নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন সকলের কাছে। কারণ বাংলার নেতৃত্বের কার্যক্ষমতা নিয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাঁর মতে কেবলমাত্র বিদেশিপণ্য বর্জনই এই আন্দোলনের একমাত্র পন্থা নয়, বরং এটি একটি ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। প্রকৃত আত্মশক্তি জাগরণের জন্য প্রয়োজন স্বশাসিত গ্রাম, জাতীয়তাবাদী শিক্ষা, কৃষির জন্য উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, স্বল্প সুদে ঋণ দান ইত্যাদি দ্বারা একটি বিকল্প পথ তৈরি করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরেকটি প্রতিবাদ হল তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিকল্প এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন বাংলার রাজনীতি এক টালমাটাল অবস্থায় অবস্থান করছে। কবি যখন স্বয়ং একের পর এক সভা রাজনৈতিক

লেখা পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তার উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তখন তিনি পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে এক বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা শুরু করছেন শান্তিনিকেতনে। কারণ উপনিবেশবাদ থেকে যদি মুক্তি পেতে হয় তার অন্যতম পন্থা হল উপনিবেশবাদ তার শক্তি যে যে বিষয়গুলিতে লুকিয়ে রেখেছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে তার সমস্ত কুপ্রভাব মুক্ত করা।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ যেমন তৎকালীন বিভিন্ন সভা, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে উপনিবেশিকতাবাদের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি হয়তো তাই তিনি ইন্ডিয়ান এডুকেশন অ্যক্টের (১৮৩৫) বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। এই অ্যাক্টের মূল কান্ডারী ছিলেন টি. বি. মেকলে। বলা বাহুল্য এই ইংরেজকৃত শিক্ষাব্যবস্থা আসলে ছিল একদল ভারতীয় ইংরেজ পৃষ্ঠপোষক তৈরি করা, যারা শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে সাহায্য করবে। খেয়াল করলে দেখা যায় তৎকালীন জাতীয়তাবাদী প্রায় সকল নেতৃত্বই এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম। আর তাই তিনি শিক্ষা নিয়ে ব্যতিক্রমী ভাবনা ভাবতে পেরেছিল। এই ব্যতিক্রমী ভাবনা ও তাঁর জাতীয়তাবাদী বোধ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে শান্তিনিকেতনে সম্পূর্ণ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি বাংলা মাধ্যম স্কুল খুলতে বাধ্য করেছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর জাতীয়তাবোধের অন্যতম সেরা নিদর্শন।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার আরেকটি বিল ছিল Indian university Act (১৯০৪)। এই অ্যাক্টের মূল কাণ্ডারী ছিলেন লর্ড কার্জন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতির নাম করে এই অ্যাক্ট পাশ হলেও তার আড়ালের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ইংরেজ সরকারের আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ। এই বিলের মাধ্যমে ইংরেজরা আসলে চেয়েছিলেন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় অবশিষ্ট ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটুকুকেও ধ্বংস করতে। এই জঘন্য বিলটির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘটনাচক্রে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে National Education -এর হাত ধরে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশিক বা ইংরেজ শাসন মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য।

রবীন্দ্রনাথের ইউনিভার্সিটি বিলের বিপক্ষে রয়েছে একাধিক প্রবন্ধ। ইউনিভার্সিটি বিল ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে দমনমূলক এবং বর্ণবৈষম্যের এক চূড়ান্ত নিদর্শন। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১ লা সেপ্টেম্বর সিমলাতে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত সম্মেলনের আয়োজন করেন, যেখানে কেবলমাত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সরকারি আধিকারিকরাই উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ৬ জন সদস্যের একটি কমিশন গঠন করা হয়। যার চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আশ্চর্যজনক ভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তৈরি হওয়া এই কমিশনে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা ছিল মাত্র দুজন। এই আইন বলে ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেনেট ও সিন্ডিকেটের সংখ্যা কমানো হয় এবং ইংরেজদের মনোনীত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কলেজগুলি নিয়মিত পরিদর্শন এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করাই ছিল এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটিশরাজ কায়েম রাখাই যে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতীয়দের তীব্র বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও এই বিলটি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে চূড়ান্তভাবে পাশ হয়ে যায়। এই সময়ে জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের মধ্যে সবিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আন্দোলন করে যায়। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনটি লর্ড কার্জনের আরো একটি মারাত্মক পদক্ষেপ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাথে মিশে যায়। এই সময় আন্দোলনগুলি সশস্ত্র এবং হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। সরকার পক্ষ এক অদ্ভুত নীরবতা পালন করে এই বিলটি পাশের ক্ষেত্রে। এজন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বেশ কিছুটা সময় পরেই তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। এছাড়াও এই সময়টি লক্ষ করলে দেখা যায় রবীন্দ্র জীবনে এসেছে একের পর এক দুর্ঘটনা, বিচ্ছেদের ভয়ংকর শোক। ১৯০২ সালে মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রীর ও বড় মেয়ে রেনুকার, এবং তাঁর নিজের শারীরিক অসুস্থতা এই সবকিছুই হয়তো তাঁকে এই রাজনীতি থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বারবার ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যকে স্মরণ করাতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে বলেছেন ভারতবর্ষ ইংরেজ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা উপযুক্ত নয়। কারণ তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র একদল

ইংরেজ তোষণকারী কর্মচারীর সৃষ্টি করা। তাই তিনি বারবার ভারতীয়দেরকে তাঁদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং ঔপনিবেশিক প্রভাব মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন। আর তাঁর এই আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায়।

এই সময়ে বঙ্গ বিভাগ নিয়েও তিনি দেশের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। যাইহোক সমস্ত বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেও ১৯০৪ সালের ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯০৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়। তবে তৎকালীন অনেক উদার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কার্জনের এই বর্ণবৈষম্যমূলক মনোভাবের বিরোধিতা করেছিলেন।

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। সেদিন সারা বাংলা বিভিন্নভাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেছিল। আর সকালে রবীন্দ্রনাথ পালন করেন 'রাখি বন্ধন' উৎসব।

ঐদিন সভা আয়োজন করা হয়। এবং সভার পর এক বড় মিছিল যেখানে হাজার হাজার ছাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই মিছিলে তাঁর দেশাত্মবোধক সংগীতগুলি গাওয়ার মাধ্যমে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং সরকার যখন দেখল, জনতার একটি বড় অংশই হল যুবক-ছাত্র-ছাত্রীরা। তখন তাঁরা তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করল।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বাইশে অক্টোবর দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কুখ্যাত আইন কার্লাইল সার্কুলার। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বাংলা সরকারের মুখ্য সচিব কার্লাইল স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন থেকে স্কুল- কলেজের ছাত্রদের দূরে রাখার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের ১০ অক্টোবর 'কার্লাইল সার্কুলার' নামে একটি সার্কুলার জারি হয়। এই সার্কুলার জারি করে ছাত্রদের স্বদেশি সভা-সমিতিতে যোগদান, বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া, বিদেশি পণ্যাগারের সামনে পিকেটিং করা প্রভৃতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং বলা হয় এই নির্দেশ অমান্য করলে বেত্রাঘাত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার, শিক্ষকদের চাকরি থেকে অপসারণ, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিল ভারতীয় ছাত্র সমাজের বিদ্রোহের আগুনে নতুন করে ঘৃতাহুতির কাজ করে এবং শিক্ষা আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। যেই আন্দোলনের বীজ বপন করেছিল ইউনিভার্সিটি বিল এবং শিক্ষা সংক্রান্ত এই আন্দোলন একাধিক ঐতিহাসিকের রচনায় স্থান পেয়েছে। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার

‘National Education’ -এর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন কীভাবে স্বদেশি আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদ শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রকাশ পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন এক ব্যতিক্রমী শিক্ষাব্যবস্থা, যা ছিল চূড়ান্ত ভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যময় শিক্ষার প্রতিরূপ।

এমত অবস্থায় ২৪ অক্টোবর ব্যারিস্টার আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, বলা বাহুল্য এটি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নপূরণের অন্যতম ধাপ ছিল। ২৭ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ আরেকটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাটি হয়েছিল শিক্ষাবিদ চারুচন্দ্র মজুমদারের উপস্থিতিতে। সেখানে আরো প্রায় হাজারখানে ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন দেশমাতার সেবার জন্য।

৫ নভেম্বর ডন সোসাইটির বৈঠকে প্রায় দু'হাজার ছাত্রের সামনে তিনি অঙ্গীকার করেন ও উদ্বুদ্ধ করেন ব্রিটিশ পণ্যের সাথে সাথে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাকেও বর্জন করার এবং বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার। তবে এর সাথে সাথে তিনি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন দেশিয় এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেও ছাত্র-ছাত্রীদের যেতে বলেছিলেন। কারণ সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়গুলি হয়তো পড়ানো সম্ভব হবে না। যদিও তাঁর এই মন্তব্য সমকালীন সময়ের বিরোধী ছিল। তথাপি বলা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর দিকে সমস্যাগুলি তিনি বিচক্ষণতার সাথে বুঝেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন জ্ঞান বা শিক্ষা দেশকালের গণ্ডি দ্বারা আবদ্ধ হয় না। তাই প্রত্যেকেরই উচিত তাঁর নিজের মতো করে নিজের দেশ কালের ঐতিহ্য মেনে ও তাঁর চাহিদা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করা। ভারতীয়রাও তার ব্যতিক্রমী নয়। তাই ভারতীয়দের উচিত তাঁর ঐতিহ্যময় শিক্ষাধারাকে বহন করা এবং যেকোনো ধরনের শিক্ষা বা জ্ঞান তা দেশ বা বিদেশ যেখান থেকেই গ্রহণ করা হোক না কেন তা অবশ্যই জাতীয় উন্নতির কাজে লাগানো প্রয়োজন। এই সূত্রেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে জগদীশচন্দ্র বসুর গাঢ় বন্ধুত্বের কথা, যিনি বিদেশে পড়াশোনা করেও অপূর্বভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়ের সাথে যুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো এটাও জানতেন, তিনি যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছেন তা হয়তো ব্রিটিশ শাসনে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি তিনি একজন জাতীয়তাবাদী হয়ে দেশপ্রেমী হয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার প্রচার চালিয়ে গেছেন।

এই সময়ে ১ নভেম্বর ২০০ জন ছাত্রের রংপুরের শাসক দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় র‍্যালি, প্রতিবাদ মিছিল ইত্যাদি সংঘটিত হয় এবং ৪ নভেম্বর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এন্টি সার্কুলার সোসাইটির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর এই কমিটির সদস্যরা রংপুর যান এবং এর উদ্দেশ্য ছিল একটি জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। এই সময়ে বেশ কিছু স্কুলের ছাত্র বন্দেমাতরম গাওয়ার অপরাধে শাস্তি পায়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল মোদিরাপুরে। এসব দেখে দেশের আপামর জনগণ এগিয়ে আসেন এবং জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। সুবোধ মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এবং ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দান করেন এই তহবিলে।

এই বছরই অর্থাৎ ১৯০৫ এর ১৬ নভেম্বর অবশেষে কলকাতায় একটি সভায় বিভিন্ন বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষাবিদরা একত্রিত হন। সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন রাজা পিয়ারি মোহন মুখোপাধ্যায়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, এস এন ব্যানার্জি, আশুতোষ চৌধুরী, ডক্টর নীলরতন সরকার, হেরেম্বচন্দ্র মৈত্র, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, মৌলভী আব্দুল মজিদ, শামসুল হুদা প্রমুখ। এই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা ছিলেন বিজ্ঞান, কলা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার দিকপাল সব ব্যক্তিত্ব। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ১৪ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন হয়। যা জাতীয় শিক্ষা সংসদ বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন কমিটি গঠনের ইঙ্গিত দেয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'ইথার আন্দোলন' গ্রন্থটির একটি ভূমিকা রচনা করেন (১২ ডিসেম্বর, ১৯০৫)। এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। গ্রন্থটির বিষয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে জাতীয় স্তরে শিক্ষা আন্দোলনের কথা।

এই সময়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নেন। এর অন্যতম কারণ অবশ্যই তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক মতানৈক্য এবং তিনি এই সব থেকে দূরে জাতীয়তাবাদের অন্য একটি ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত করছিলেন। জাতীয়তাবাদকে তিনি

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে ধারণা এবং পথ সবার কাছে প্রকাশ হয় সেই দিনই ১৪ আগস্ট ১৯০৬ যেদিন ন্যাশনাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিন তিনি 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধটি ভাষণ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'শিক্ষা'-র প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্বক্ষমতায়ন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এটাই ছিল জাতীয় শক্তি এবং এই জাতীয় বিদ্যালয়ই উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়া জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেননি। সেই সময় বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত দল সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিলককে এই সময়ে সভাপতি রূপে ঠিক করা হলেও সুরেন্দ্রনাথের মতো বিশেষজ্ঞরা দাদাভাই নওরোজীকে সভাপতি বলে ঘোষণা করেন। দাদাভাই নওরোজী তাঁর রাজনৈতিক অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে স্বদেশি বয়কট আন্দোলনগুলিকে যথার্থ রূপ দেন, তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ তখন পুরোপুরি নিজেকে শান্তিনিকেতনে আবদ্ধ রাখেন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যময় ভবিষ্যতের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে।

শিক্ষার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড হল পল্লি-পুনর্গঠন। পল্লি-পুনর্গঠন ও উন্নয়ের সূচনা রবীন্দ্রনাথ নিজের শিলাইদহের জমিদারিতে করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তার সম্প্রসারণ হয় শান্তিনিকেতন সংলগ্ন শ্রীনিকেতনে (১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি)। রবীন্দ্র-সমকালীন ও পরবর্তী পরাধীন ভারতে এরকম পল্লি-পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প ছিল বিরল।

> "রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সময়ে পল্লি-উন্নয়নের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল— ১৮৯০ সালে বরোদার মহারাজা সায়াজি রাওয়ের গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ ও ১৯২১ সালে স্পেনসার হাচের মাদ্রাজের ত্রিভাঙ্কুর জেলায় 'মারতানদাম' প্রকল্প। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ ছিল সমস্ত দিক থেকে এইসব প্রকল্পের থেকে ভিন্ন।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথের এই পল্লি-পুনর্গঠন সমাজ-জীবনের পাশাপাশি গ্রামবাসীকে দিয়েছিল অর্থনৈতিক সাবলম্বীতা। তাঁর এই প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল সমাজ, রাষ্ট্র ছিল সেখানে গৌণ। পল্লি-পুনর্গঠনের এই

সময়টি ছিল ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। শতবিভক্ত সমাজে তখন উদাসীনতা। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে পারে একমাত্র তার নিজস্ব শক্তি। তার জন্য দরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সহ সবধরনের বিকাশ এবং মনুষ্যত্বের জাগরণ। রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন যে তাঁর আজীবনকাল ধরে লালিত জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ প্রেমের বাস্তব রূপ তা নিঃসন্দেহে বলার অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন নীতিকে আরও একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর এই নীতি।

> "তিনটি পরস্পরযুক্ত নীতি – আত্মশক্তি, সমবায় ও উন্নয়নের উদ্‌বোধনের ওপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লি-পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।"[৩৭]

এই নীতিগুলি নিছকই তাঁর কল্পনাজাত বা মানুষকে সম্মোহিত করার কৌশল ছিল না। এগুলিই ছিল তাঁর বৃহত্তর সমাজভাবনা, সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্য ও পথ যা গ্রামের সাধারণ মানুষের আত্মশক্তির উদবোধনকে ত্বরান্বিত করেছিলো। পল্লি-পুনর্গঠনের নীতিগুলিকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সুসম্পর্ক রয়েছে। এই নীতি গুলির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মশক্তির বিকাশের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত ক্ষমতা আছে তার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি সমবায় প্রথাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের মানুষ ও সমাজের সরাসরি উন্নতি সাধন করা ছিলো তাঁর প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন যে, গ্রামের মানুষের আর্থিক উন্নতি ছাড়া ভারতবর্ষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার জন্য, ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির জন্য পল্লি-উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এটাই তাঁর জাতীয়তাবাদের বাস্তবিক প্রায়োগিক দিক।

রবীন্দ্রনাথের কর্মযজ্ঞের মধ্যে এই পল্লি-পুনর্গঠনের দিকটিই সবথেকে বেশি আলোচিত। কারণ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী একজন কবির স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র হল তাঁর কল্পনা ও ভাবনার জগৎ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু তাঁর কাব্যচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মানুষ ও স্বদেশের প্রয়োজনে তিনি সব সময়

সমাজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পল্লি-পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধুমাত্র একটি পরীক্ষাই ছিল না, ছিল মানুষের জীবনকে সচ্ছল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের এই পল্লি-পুনর্গঠনকে সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন উন্নয়নের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তেমনি ইতিহাসবিদদের মতে শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডই হল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী কাজ।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠনের কাজকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে তৎকালীন প্রেক্ষাপটটা বোঝা খুব দরকার। যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিনি পল্লি-পুনর্গঠন এর কাজ শুরু করেছিলেন সেই দিকটি খুব ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। তাঁর এই ব্যতিক্রমধর্মী সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ আসলে তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি অন্য রূপ। তাঁর মতে পল্লি-পুনর্গঠন ও জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ কখনোই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তেমনি গ্রামোন্নয়নকে বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়নও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের স্বাধিকার অর্জনে প্রথমেই দরকার পল্লি-উন্নয়ন। তাই রবীন্দ্রনাথ সাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়েই সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। এই সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযজ্ঞের ভাবনা ও তার প্রয়োগ তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশর মানুষের কাছে ছিল কল্পনার অতীত।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন তেমনি সংসারের বিভিন্ন অনিত্য কাজেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি মানবতাধর্মী আধ্যাত্মিক রূপের পাশাপাশি প্রকৃতির স্বরূপ সাধনাও করেছেন। তাঁর এই প্রকৃতির স্বরূপ সন্ধানই তাঁকে প্রকৃতির কোলে শিক্ষাব্যবস্থার মতো একটি নতুন পথে নিয়ে যায়।

তাঁর এই তপোবনের ন্যায় স্বদেশি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ও মানুষের সাথে মানুষের সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্কগুলি স্থাপন ও বিকশিত করা। কারণ মানুষ হল সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতির কোলে শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীরা অবশ্যই স্বদেশের প্রতি এবং তাদের আশেপাশের মানুষের প্রতি সচেতন থাকবে। দেশের সাধারণ মানুষকে জানা ও প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়ানো- এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশ্রমিক শিক্ষার মূল আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বদেশ প্রেম ইত্যাদির অন্যতম প্রায়োগিক দিক ছিল শ্রীনিকেতনের পল্লি-পুনর্গঠনের কাজ। রবীন্দ্রনাথের এই পল্লি-পুনর্গঠনেই তাঁর বিভিন্ন ভাবনার মাত্রাগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো তিনি গ্রামের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, কোথাও বা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন গ্রামের মানুষের সহযোগিতামূলক মনোভাব, আবার কোথাও তিনি গ্রাম বাংলার বুকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন স্বদেশ গঠনের চাবিকাঠি। তৎকালীন গ্রামবাংলার বিচ্ছিন্নতাবাদ, কুসংস্কার, অনাহার প্রভৃতি তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই এই গ্রামীণ পুনর্গঠনকে দীক্ষিত সিনহা 'নৈতিক পুনর্গঠন' (Moral construction) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া সহযোগিতামূলক মনোভাবকে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সমাজের যে নৈতিক পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিলেন সেই নৈতিক পুনর্গঠন কোনো রকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত এবং পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর এবং তার আগে ইউরোপীয় সমাজও পরিবর্তিত হতো। কিন্তু অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তনের ধারা আরো জোরালো হয় শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। এই সময় থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাবের জন্ম হয়। ফরাসি দার্শনিক আগস্ট কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) তাঁর 'Philosophers' বইটিতে মানুষের সমাজ ও তার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর সমস্ত সমাজ নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে, নির্দিষ্ট পথ ধরে পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং এই ভাবেই সমাজের বিকাশ এবং বৃদ্ধি ঘটে। এই একই রকমের সমাজ পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) এবং কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) দর্শনে। যদিও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুজনের উদ্দেশ্য ছিল- ধর্মীয় নৈতিকতার নয় যুক্তিবাদী মনোভাবই হবে সমাজ গঠনের মূল অস্ত্র। কিন্তু কীভাবে সেই সমাজ গঠিত হবে সেই প্রসঙ্গে এই দুই দার্শনিকদের মতামত ছিল ভিন্ন। ইউরোপে ক্রমশ এক ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও নৈতিকতার আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

পল্লির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগাযোগ শুরু হয় শিলাইদহে গিয়ে, জমিদারি দেখাশোনার সময় থেকে। এই জমিদারি দেখাশোনার সময় তিনি পল্লি জীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে এবং সমাজ জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর আত্মোপলব্ধি গড়ে ওঠে। শিলাইদহ-পতিসরের পল্লি-পুনর্গঠন এবং শ্রীনিকেতনের পল্লি-পুনর্গঠন- এই দুই কর্মকাণ্ড তাঁর পল্লি-পুনর্গঠনের প্রয়াসকে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ দান করেছে। শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনার সময়ে বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রচেষ্টা পল্লি জীবনের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধের কথা সকলকে মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালে জমিদারি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুর নামক কয়েকটি গ্রামে সালিশি সভার প্রবর্তন করেন। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষিতে এই সালিশি সভার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আসলে তিনি তখন থেকেই চেয়েছিলেন গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করার মাধ্যমে তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন এনে দিতে এবং এর মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের হারানো সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্য আরো বাড়বে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এই সালিশি সভাকে তিনি পল্লি-পুনর্গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র ঐক্যের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বাংলা ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী অধিবেশনে তিনি যে কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সাম্য ও সদ্ ভাব সংবর্ধন' এবং 'সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিশি দ্বারা মীমাংসা।'

তবে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ভারতীয় সভ্যতাকে সমাজভিত্তিক সভ্যতা বলেই স্বীকার করেছেন এবং তিনি মনে করতেন নৈতিকতাই ভারতীয় সমাজ এবং সভ্যতার অন্যতম মূলাধার। কিন্তু ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয় গ্রামগুলির অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। গ্রামবাসীরা শুধুমাত্র দু-বেলার অন্নসংস্থানের লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলো। ভাগ্যকে দায়ী ক'রে দুর্দশার মধ্যেই তারা কোনো রকমে বেঁচে ছিলো। এমত অবস্থায় তাদের নিজেদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়নের কথা, সহযোগিতামূলক মনোভাবের কথা ইত্যাদি ছিল নিতান্তই অবান্তর। রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিবর্তিত হবে। তবে তিনি যে সময়ে এসেছিলেন, সেই সময়কাল তাঁর সমাজ ভাবনার উপরে প্রভাব ফেলেছিল। তখন বাংলা এবং ভারতবর্ষের বুকে ঘটে চলেছে একের পর এক বিপ্লব ও বিদ্রোহ। এছাড়াও ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা তাঁর মনে বাল্যকাল থেকেই জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সেই সময়কার হিন্দু জাতীয়তাবাদী বোধের চেয়ে ছিল আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ দেখা গিয়েছিল সেই ভাবধারা থেকে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ছিল অন্য সুরে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধে ছিল দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। পল্লি-পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্বদেশকে আত্মনির্ভর করে তোলার এক মহান ব্রতে ব্রতী ছিলেন তিনি। তাঁর স্বদেশি ভাবনা ও জাতীয়তাবাদ যে পল্লি-পুনর্গঠনের মাধ্যম দিয়েই শুরু হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তায় কোনো রাজনীতির রং লাগেনি। হিন্দু মেলা থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সব জায়গাতেই তাঁর অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল দেশকে আত্মনির্ভর ক'রে তোলা।

ভারতবাসীদের সমস্ত প্রতিকূলতার কাছে অনায়াসে আত্মসমর্পণ ও নিষ্ফল ভিক্ষাবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। সেই সময়ের অধিকাংশ গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে ও উপন্যাসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাননি, তিনি এমন একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হলেও পরবর্তীকালে তাদের ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারীতা তাঁর মনকে ব্যথিত করে তোলে এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। পাশ্চাত্যের এই ঔপনিবেশিক স্বৈরাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজের বিশেষত্ব এবং বহুত্বের মাঝে মিলন ও ভারতীয়দের নৈতিকতাকে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় সমাজের এই বিশিষ্টতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পল্লি-উন্নয়নকে 'পুনর্গঠন' বলে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনায় রাজনীতির থেকে মানবতাবাদ অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই বোঝাতে চাননি। তাঁর কাছে স্বাধীনতার মানে ছিল সামাজিক স্বাধীনতা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এক পারস্পরিক মনুষ্যত্ব বোধের উন্মেষ, সহযোগিতামূলক মনোভাব, সর্বোপরি সমাজ তথা দেশের উন্নতি তাঁর কাছে স্বাধীনতার অন্যতম নির্দেশক ছিল। তিনি চাইতেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। বর্তমানের এই 'আত্মনির্ভরশীল ভারত'-এর ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি বারবার বলেছেন,

সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই একটি সুন্দর ও বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সমাজ সচেতনতামূলক মনোভাব দেখা যায়। যেখানে তিনি সমাজে মানুষের মধ্যে পারস্পারিক ঐক্য এবং সংহতি গড়ে তুলতে চাইছেন। তাই তিনি দেশের মানুষকে সবসময় আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে বলেছেন। তিনি রাজনীতির বাতাবরণ কাটিয়ে অনাহারক্লিষ্ট কুসংস্কারচ্ছন্ন জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শুধুমাত্র তাদের দুঃখ দুর্দশা নিবারণ করার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 'পুনর্গঠন' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন।

> "বাংলার যে অগ্রগণ্য শিক্ষিত শ্রেণি একদিন পল্লিসমাজকে সচল রাখার দায়িত্ব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহন করতেন তার থেকে সরে এসেছিলেন। এই সরে আসার থেকে উদ্ভূত কারণে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার সমাধান ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র পুনঃস্থাপন করা এবং দ্বিতীয়টি হল সমাজজীবনে ক্রমশ বিলীয়মান স্বাভাবিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ঘটার ফলে সমাজে যে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব বেড়ে চলেছে তার নিরসন — সমাজজীবনের এই দুটি ভিত্তিমূলক প্রাথমিক অথচ বিলীয়মান সম্বন্ধ-সূত্রকে তিনি আরও দৃঢ় করে পল্লিজীবনকে আবার স্বমহিমায় গঠিত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় বাংলার পল্লিসমাজকে গতিশীল করতে হলে তার হারিয়ে যাওয়া এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।"[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, পল্লি জীবনকে গতিশীল করতে হলে তাকে অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবলম্বী করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে একটি বিষয় খুব সূক্ষ্মভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উন্নতি আর সমাজের সামগ্রিক উন্নতি কিন্তু এক নয়। বরং ব্যক্তিগত উন্নতি অনেক সময় সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নকে বিপরীত দিককে প্রভাবিত করে। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ সামগ্রিক উন্নয়নকে ন্যায়পরায়ণ, সমতা, অধিকারবোধ, ক্ষমতায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে জনমুখী করে তোলার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ অর্থনীতিকে আর শুধু সম্পদ, উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন না। সম্পদ ও উৎপাদনের সঙ্গে মানুষ ও সমাজেরও যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে রবীন্দ্রনাথ সেদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। বেদান্তের সমাজ কল্যাণের মন্ত্র, 'বহুজন সুধায় বহুজন হিতায় চ' অর্থাৎ,

সবার নিঃশেষে ভালোর ওপরে সমাজের মঙ্গল নির্ভর করবে এই ধারণা আর অপাঙক্তেয় থাকছে না। তবে রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠনের ভাবনাকে শুধুমাত্র সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাকে প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব না। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, শিশু ও নারী কল্যাণ, সাঁওতাল ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আসলে একজন কবি তাঁর কল্পনার জগতে এমন এক সমাজের ছবি এঁকেছিলেন যা শুধু একপেশে উন্নয়ন নয়, নিয়ে আসবে সমাজ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের এই বিরল ভাবনা তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত জাতীয়তাবোধের মূল প্রকাশধারা (আন্দোলন ও বিপ্লব) থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। তাই তৎকালীন সময়ে তা যেমন সেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি তেমনি সমাজ উন্নয়নের ভাবনা শুধুমাত্র একক ব্যক্তিনির্ভর হয়ে থেকে যাবে সেটাও তিনি মেনে নিতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠন ভাবনার উৎস ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র ছিল শিলাইদহে ঠাকুরবাড়ির জমিদারিতে। শিলাইদহ ও পতিসরের পল্লি-উন্নয়নের চিত্র উঠে এসেছে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি', শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ', সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ জীবনী ও সাহিত্য', দীক্ষিত সিংহর 'রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। সমাজ ও পল্লি-পুনর্গঠনের যে ভাবনা ও পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে ঘুরছিল তা এই সময়কার বেশ কিছু প্রবন্ধেও ধরা পড়েছে। 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধ গ্রন্থেই সেই ভাবনার রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশচিন্তা ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রেক্ষাপটে ছিল ঠাকুরবাড়ির স্বদেশিচর্চা ও সংস্কৃতি চর্চা। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে সূচনা হয় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি', যার লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুরক্ষা। আবার এই ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় 'হিন্দুমেলা'। এছাড়াও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি।

নিজের জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রামের জন্য রাস্তা নির্মাণ, কুয়ো তৈরি, জঙ্গল পরিষ্কার, মহাজনী ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গ্রামের কৃষকদের উদ্ধারের ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্প এবং সালিশি বিচারের প্রবর্তন — এই সমস্ত দিকগুলিতে কাজ শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠনের কাজকে মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) প্রথম পর্ব (১৮৯৯-১৯০৬)

(২) দ্বিতীয় পর্ব (১৯০৮-১৯০৯)

(৩) তৃতীয় পর্ব (১৯১৫-১৯৪০)

প্রথম পর্ব অর্থাৎ (১৮৯৯-১৯০৬) শুরু হয় ১৮৯৯ সালে। এই পর্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিলাইদহ। শিলাইদহে কুঠিবাড়ি সংলগ্ন জমিতে নানারকম পরীক্ষামূলক চাষবাসের মাধ্যমে এই পর্বের সূত্রপাত। আমেরিকান ভুট্টা, নৈনিতাল ও আমরাগাছি আলুর চাষ, আখ, পাটনাই মটর এবং রাজশাহীতে রেশম চাষের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টাতে তিনি কিছুটা সফল হন। কৃষি কাজ নিয়ে তাঁর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্ত ব্যয় ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নতুন ধরনের চাষের প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে এই পরীক্ষামূলক কৃষিকাজকে রবীন্দ্রনাথ 'কুইক্‌সটিক' ও বহুব্যয়সাধ্য' প্রহসন বলে মন্তব্য করেছেন।

যদিও রবীন্দ্রনাথের এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা দেখে বহু মানুষ এর সমালোচনা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পল্লি-পুনর্গঠনের সাফল্যের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্বের ব্যর্থতা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯০৫ সালে শিলাইদহে কৃষিব্যাঙ্ক ও তাঁত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ খ্রি. কবিপুত্র ও কবিবন্ধুপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গোপালন বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

> "শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষা ব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেসটরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল। ... চাষবাস সম্বন্ধীয় যে-সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্য এই গল্পটি বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু একথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো অদ্ভুত অপব্যয়ে

আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার কুইক্‌সটিত্বের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।”[৩৯]

১৩০৮ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসেন। ঐ বছর একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনার পর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন হয়। এই উৎসবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭), রেবাচাঁদ প্রমুখ শিক্ষাকদের সঙ্গে কলকাতার কিছু ছাত্র ও অন্যান্য অতিথিবর্গও শান্তিনিকেতন আসেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল প্রাচীন বৈদিক ভারতের পুনরুত্থান এবং পূর্ব প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হয়েছে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের প্রতি অবিশ্বাস ও প্রাচ্য ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। তিনি আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখেছিলেন (‘প্রবাসী’, ১৩৪৫-এর বৈশাখে তা প্রকাশিত হয়েছে) —

“তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড়ো রমনীয়... কলিকাতার আবর্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। ... পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং-বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ-মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশকে ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।”[৪০]

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ‘প্রবাসী’র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরার মহারাজ দেবমাণিক্যের লেখা একটি পত্র থেকে পাওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার পাশ্চাত্য বিলাসিতা ত্যাগ করে প্রাচ্যের শান্তি-সন্তোষ ও মঙ্গলের মধ্যেই পবিত্রতা খোঁজার কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিছু আদর্শ চরিত্রের মানুষ তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ব্যাপক জনশিক্ষার কাজে তাঁদের নিযুক্ত করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

তবে এই দুই মহামানবের জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনায় যে বিরাট পার্থক্য আছে তা বলা যায় না। দুজনেই জনগণের উন্নতির মাধ্যমে দেশ বা জাতির উন্নতির কথা বলেছেন। পূর্বে আলোচিত ‘সাধনা’ ও ‘ভারতী’-

তে প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাকালেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় গোঁড়া হিন্দুত্ববাদ প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আসে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পাঠ করা 'নববর্ষ' প্রবন্ধটির কথা। প্রবন্ধটিতে যে বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেইসময় দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে কাজের গুরুত্বই সব থেকে বেশি। কাছে-দূরে দিনে-রাতে কাজ করতেই হবে, এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কী করা উচিত, সে কাজ আদৌ আত্মতুষ্টি হবে কিনা সেদিকে কারোর নজর নেই। ইউরোপীয় ভাবধারায় বন্দীত্ব গৌরবময়। তাই সেখানে মাতামাতি, ছোটাছুটি, কাজ-অকাজ সবক্ষেত্রেই খানিকটা বাধ্যবাধকতা আছে। এই কাজের নেশা ইউরোপ বা পাশ্চাত্য ছেড়ে পৃথিবীময় লোককে অশান্ত করে তুলেছে। সেই মত্ত নেশার ঘোরে পাহাড়ী ছাগলের গুলিতে প্রাণত্যাগের মতো, কিংবা নিরীহ পেঙ্গুইনের মতো মানুষও বিপদের দিকে ছুটে যায়।

কিন্তু শান্তিনিকেতনের নির্জন প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত স্তব্ধতা উপলব্ধি করাই জগতের চরম আদর্শ বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতিতে কর্মের সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু এই প্রকৃতি কাজের পাশাপাশি অবকাশকেও গুরুত্ব দেয়। তার চঞ্চলতা ঢাকা পড়ে ধ্রুবশান্তিতে। সেখানে প্রকাশ পায় চির নবীনতা। আর ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যই প্রকৃতি শিক্ষা– সে প্রকৃতির প্রতিটির উপাদান থেকে শিক্ষা নিয়েছে। তাই 'কর্মের ক্রীতদাস' ভারতবর্ষ নয়।

এই প্রসঙ্গে এসেছে জাতিগত আদর্শের কথা। আমাদের দেশে 'করা' বা কর্ম উপলক্ষ্য মাত্র। 'হওয়া'-টাই এখানে চরম লক্ষ্য। পাশ্চাত্যের সংঘাতে আমাদের স্তব্ধতা, শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লুপ্ত হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী সহজ, সরল, প্রশান্ত ও দৃঢ় কার্যপ্রণালী। তখন—

> "সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহন করিত, সৈনিক-সিপাহী অকাতরেই চানা চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত। আচাররক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজরক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন করা তখন অত্যন্ত সহজ ছিল।"[৪১]

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের আর একটি আদর্শগত পার্থক্যের কথা উঠে এসেছে এই প্রবন্ধে। সেটি হল ভোগের পার্থক্য। ইউরোপে মানুষ ভোগ করে একা, কিন্তু কাজ করে দলবদ্ধভাবে। আর ভারতবর্ষে ভোগ করে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে।

প্রবন্ধটিতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের অন্য মর্যাদা-অমর্যাদা বিষয়টির পার্থক্যের কথাও বলা হয়েছে। সেখানে ভারতবর্ষে প্রচলিত কর্মবিভেদ, শ্রেণিবিভেদকেও ভারতীয় সমাজের রক্ষাকবচ রূপে বিবেচনা করা হয়েছে—

> "ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ... য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে- এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব।"[৪২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের দেশে তা সত্য নয়, আমাদের দেশে সকলের সব হবার অধিকার নেই। বরং পৈতৃক কর্মের মধ্যে বা ব্যক্তি বিশেষ যার পক্ষে যা সুলভ তা করাই গৌরব। ইউরোপ যে সন্তোষ ও নিশ্চয়তাভাবকে জাতির মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখে, ভারতবর্ষের সভ্যতার সেটাই হল ভিত্তি। ভারতবর্ষের সংযম, ক্ষমা, শান্তি উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ, সেখানে ইউরোপীয় সভ্যতাপ্রসূত বর্বরতা কাম্য নয়। প্রবন্ধটির ছত্রে-ছত্রে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা করে 'ভারতের বহুসহস্র পুরাতন'কে ফিরিয়ে এনেই ভারতবর্ষকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে হিন্দুত্ববাদ বা উগ্রজাতীয়তাবোধ বলে বিশ্বাস করা বোধ হয় সঠিক হবে না। তবে তৎকালীন সময়ে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হয়ে হিন্দুত্বকে বাদ দেওয়া যে সম্ভব ছিল না — তার প্রমাণ আর এক যুগনায়ক বিবেকানন্দের কার্যাবলীতে স্পষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ কেবল হিন্দু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলো। তা ধর্মও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী কাটিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, মুসলিম জনগণের উন্নতি এদিকে আসেনি। কারণ হিসাবে সমসাময়িক সময়কে দায়ী করলেও বলা যেতে পারে বিশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সংস্পর্শ তেমনভাবে পাননি। অথচ পরবর্তীকালে এই

চিন্তাধারার সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ন্যাশনালিজমের যে অনবদ্য স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ লেখার কারণ হিসাবে লেখক বলেছেন-

> "সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোনো মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরেজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল; তাহার বিচার উচ্চতম বিচারালয় পর্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ, বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।"[৪৩]

প্রবন্ধটিতে উঠে আসে 'প্রেস্টিজ' বা সম্মানের কথা। ইংরেজরা এই 'প্রেস্টিজ' বা 'রাজসম্মান'কে মূল্যবান মনে করেন। অথচ একসময় ভারতীয় সমাজতন্ত্র নিজেদের জন্য ব্রাহ্মণকেও সেই সম্মান দিয়েছে।

> "সেই বৃহৎ সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবার ও বিধিবিধান স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। এই কার্যসাধনের উপযোগী সম্মানও তাঁহার ছিল।"[৪৪]

তিনি প্রবন্ধটিতে ব্রাহ্মণের গুণগুলি সম্পর্কে সচেতন করেছেন। সম্মান কখনো বিনামূল্যে হয় না। কাজের মধ্য দিয়েই সম্মান রাখতে হয়। একসময়ে ব্রাহ্মণেরা সমাজে উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেখানে শিথিলতা তাঁর সম্মানেও প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় সমাজ রক্ষার জন্য যথার্থ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন আছে।

> "তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন। সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়-স্বরূপ হইবে ও গুরু হইবেন।"[৪৫]

ব্রাহ্মণের এই সম্মানহানির কারণ সে ধর্মকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেনি এবং আধুনিক ব্রাহ্মণসমাজ সে আদর্শ মানেও না। প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য ধারায় ভাবিত না হয়ে পুরাতন প্রাচ্যভাবেই জাতিকে রক্ষা করার কথা বলেছেন এবং সেই জাতি রক্ষার জন্য, সমাজ রক্ষার অন্যতম উপায় হিসাবে 'প্রকৃত ও যথার্থ ব্রাহ্মণ' হওয়ার গুণাবলীগুলি আলোচনা করেছেন।

'কবি' ও 'কল্পনাবিলাসী ধনীর ঘরের আদরের দুলাল' বলে রবীন্দ্রনাথের নামে একটা অপবাদ শোনা যেত কিন্তু আসল সত্য ছিল অন্যরকম। দেশ ও জাতির বহু দুঃসময় ও দুর্যোগকালে দেশের বহু রথী-মহারথীরা নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করলেও এই 'কল্পনাবিলাসী আকাশচারী কবি' সম্মুখে বহুবিধ জেনেও সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন যথাসময়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

উনিশ শতকের শেষভাগে দেশজুড়ে ধর্মসংস্কারক, বিশেষত রাজনীতিবিদদের কাছে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির বিষয়টি বড় হয়ে ওঠে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তাবাদী, পর-জাতি বিদ্বেষ এবং ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য গঠনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩০৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়।

> "রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না। শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একাত্ব অনুভব আমরা কখনো দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা-দ্বারা বিভক্ত। ...আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থ রক্ষার উদ্‌যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই। ...এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে। ...বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে- একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধূলা সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।
>
> ... অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবী অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।"[৪৬]

এখানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বলতে রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ঐক্যের কথা বলেছেন তা কিন্তু নয়। 'হিঁদুয়ানির পুনরুত্থান'-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় ঐক্য ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ঠিক উর্ধ্বে নয়। বরং তা হিন্দু ধর্মের ধর্মগত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসিক প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিকেও এই ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে কিনা এবং করলেও কীভাবে ও কীসের ভিত্তিতে এই ঐক্যগঠন সংগঠিত করতে হবে — সেকথা রবীন্দ্রনাথ তখনও চিন্তা করেননি।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির ঘৃণ্য জাতিবিদ্বেষ এবং মিথ্যে দম্ভ ও জাত্যাভিমানের তীব্র সমালোচনা করেন। ইংরেজরা সারা পৃথিবীতে সবথেকে বেশি জনজাতির সংস্পর্শে এসেছে যা ইউরোপের অন্য কোনো জাতি আসতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজের পরজাতিবিদ্বেষ একটুও কমেনি। ভারতবর্ষ ছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলিতেও ইংরেজ জাতির ঘৃণ্য জাতিবিদ্বেষ ও শোষণ-অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে – ১৮৯৭ ও ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে পরপর দুটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক ফলাফল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের দেশের কৃষি ও ভেঙে পড়া অর্থনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কৃষকের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয় এমন কিছু কিছু আইন সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হয় এমনকি এই দুর্ভিক্ষগুলির প্রকৃত কারণ ও দেশের ধ্বসে যাওয়া অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যও একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি এন.জি. চন্দ্রভারকর দুর্ভিক্ষের ফলাফল উল্লেখ করে বলেন যে এই দুর্ভিক্ষের ও আর্থিক দারিদ্রের সুযোগে রায়তের জমি মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের Deccan Agriculturist's Relief Act এবং Punjab Land Alienation Bill-এর সমালোচনা করে তিনি আরো বলেন যে এদের মূল যে উদ্দেশ্য তা কোনো ক্ষেত্রে পূরণ হচ্ছে না। বরং এক মহাজনের থেকে অন্যজনের হাতে জমি দখল চলে যাচ্ছে। কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা এবং ঋণের পরিমাণ কিছুই লাঘব হচ্ছে না — উপরন্তু কৃষক শেষে গিয়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। তাই তিনি কৃষকের ভূমি রাজস্ব কমানোর ও ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্পগুলিকে ব্রিটিশ শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার দাবি জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরেজ সরকার স্যার রিচার্ড গার্থের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে মোট ১১ জন সদস্য ছিলেন, তার মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন একমাত্র ভারতীয় সদস্য। এই রিচার্ড গার্থের কমিশন বড়োলাটকে দুর্ভিক্ষের নিবারণ ও প্রতিকারের জন্য যেসব সুপারিশ করেছিল, রমেশচন্দ্র দত্ত 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ : তাহার কারণ ও প্রতিকার' শিরোনামে গুরত্বপূর্ণ তথ্যসহ সংক্ষিপ্ত আকারে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ('ভারতী' : আষাঢ়, ১৩০৮)। ১) ভূমিক্ষয় রোধ, ২) জলপ্রণালী ও কূপাদি খনন, ৩) প্রতিবছর ভারতবর্ষ থেকে যে বিপুল পরিমাণ টাকা ইংল্যান্ডে যায় তার পরিমাণ হ্রাস করা। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতবর্ষ থেকে টাকা রপ্তানির বিষয়টিকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন — যা তাঁর কাছে দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে হয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্তের এই লেখাটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের এই দুর্ভিক্ষ আর্থিক বিপর্যয় নিয়ে তেমন কিছু বললেন না। কংগ্রেসের এই লোক দেখানো আন্দোলনকে যে রবীন্দ্রনাথ ভরসা করতেন না তা ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দরিদ্র কৃষক ও গ্রামবাসীকে তো তিনি অন্তর থেকে ভালোবাসতেন। সেই কৃষক ও দরিদ্র মানুষের এহেন বিপদের দিনে তিনি কিছুই বললেন না — এটা অনেকের কাছেই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নীরবতার একটা অন্য কারণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন আদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মনে তখন একটিই বিষয় প্রধান আকার ধারণ করে যে, ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ কী হবে? ভারতবর্ষ কি ইউরোপের 'ন্যাশনালিজম' ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অনুকরণ করবে, নাকি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আবার নতুন করে সজীব করে তুলবে?

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন, তখন এই জাতীয় আদর্শ নির্ধারণের প্রশ্নটি মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে ভাবলে দেখা যায় যে, জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে তৎকালীন চিন্তা-চেতনার মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা আছে। কারণ যে সময়ে ভারতবর্ষের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদী ভাবনার সবথেকে বেশি প্রয়োজন, সেই সময়ে ভারতবাসী আবার নতুন করে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলে

ভারতবর্ষের যত বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি-উপজাতি, বহু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠার প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠল এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ। ফলে এর প্রভাব থেকে 'বঙ্গদর্শন'-ও বাদ পড়েনি।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়নে অগ্রসর হন। ফরাসি ঐতিহাসিক গিজোর পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। গিজো-র এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন'-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গিজো-র মতামতকে খুব একটা অস্বীকার করেননি। বরং ইউরোপীয় সভ্যতা প্রকৃত ঐক্য ও মূলসূত্রকে তুলে ধরেছেন। ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার থেকে আধুনিক সভ্যতা সম্পূর্ণ বিপরীত, বিচিত্র, জটিল ও বিক্ষুব্ধ। তিনি প্রবন্ধে বলেন—

> "ইহার অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের সকল-রকম মূলতত্বই বিরাজমান; লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি, পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রধানতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়, সকল অবস্থাই বিজড়িত হইয়া দৃশ্যমান; স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার সর্বপ্রকার ক্রমান্বয় ইহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই বিচিত্র শক্তি স্থির নাই, ইহারা আপনা-আপনির মধ্যেই কেবল লড়িতেছে। অথচ ইহাদের কেহই আর-সকলকেই অভিভূত করিয়া সমাজকে একা অধিকার করিতে পারে না। একই কালে সমস্ত বিরোধী শক্তি পাশাপাশি কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখিতে পাই। তাহাদিগকে য়ুরোপীয় বলিয়া চিনিতে পারা যায়।

অন্যদিকে,

> ... অন্যান্য সভ্যতায় এক ভাব এক আদর্শের একাধিপত্য অধীনতা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু য়ুরোপে কোনো এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে না পারায় এবং ঘাত-প্রতিঘাতে পরস্পরকে সচেতন অথচ সংযত করিয়া রাখায়, য়ুরোপীয় সভ্যতায় স্বাধীনতার জন্ম হইয়াছে।
>
> ক্রমাগত বিবাদে এই সকল বিরোধী শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। এইজন্য ইহারা পরস্পরকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে না, এবং নানা প্রতিকূল পক্ষ আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।"[৪৭]

> "ইহাই আধুনিক ইউরোপের য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলপ্রকৃতি, ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। ... য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।"[৪৮]

এখন প্রশ্ন হল এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ কী? এবং এর প্রকৃতিটাই বা কেমন? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন —

> "প্রত্যেক জাতির যেমন একটা জাতিধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের।"[৪৯]

যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে বিরোধ অবধারিত। ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার মধ্যেও সেই বিরোধ দিন দিন প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

> "...য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জাবোধ করিতেছে না।"[৫০]

এই সব দেখেশুনে রবীন্দ্রনাথের মনে পাশ্চাত্যের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা, নেশন ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে এই সভ্যতার 'রিপুর প্রবল তারণা' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্বার্থভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সভ্যতাই হল সমস্ত সর্বনাশের মূল কারণ।

ইউরোপে যে আধুনিক নেশন ও রাষ্ট্রের সূচনা হয় তার কেন্দ্রবিন্দুই হল পুঁজিবাদের বিকাশ। পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী লোভ, লালসা, কামনা ও তার আগ্রাসী মনোভাব অনায়াসেই বিশ্বমানবতা, ন্যায়-নীতি ও ধর্মাধর্মবোধকে ভূলুণ্ঠিত করে। ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ কী হবে তা নিয়ে যে সংশয় ছিল তা আস্তে আস্তে দূরীভূত হতে থাকে। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষে আদর্শ হবে তার প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের আদর্শ যা ভারতবাসীকে একটি আদর্শ জাতিতে পরিণত করবে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে

'নেশন' গড়ে তোলার অর্থ হল ভারতবাসীর মৃত্যুর নামান্তর। তাই তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে আরও বলেন,

"'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা যুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন— তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা—মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।

যদযৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।।

এই আদর্শ যথাযথভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর।"[৫১]

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন (১৯০১) ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়েছেন। পৌষ উৎসব ও মাঘোৎসবে তিনি স্বয়ং আচার্য হয়েছেন। ফলে এই রবীন্দ্রনাথের কাছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরাই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে — সেটাই স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধের উপসংহারে এসে তিনি আরও বলেন,

"আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য — তবে আমরা ভুল বুঝিব।"[৫২]

এই রবীন্দ্রনাথ যেমন ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি, তেমনই আবার ইউরোপের সব কিছুকে খারাপও বলেননি। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এর আষাঢ় সংখ্যায় (১৩০৮) প্রকাশিত 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও ইউরোপের অনেক মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত সাহিত্যিক। ফলে তাঁর সেই স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি, নীতি ও মানবতাবোধ দিয়েই তিনি ইউরোপের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন সেইজন্য তিনি ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের আগ্রাসী মনোভাবকে যেমন তীব্র ভাষায় আক্রমণ ও নিন্দা করেছেন তেমনই আবার এশিয়া ও আফ্রিকার অত্যাচারিত, অবহেলিত, শোষিত ও পরাধীন জাতিগুলির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিতে কেঁদেছেন।

এই সময় যদি একবার ভারতবর্ষের দিকে তাকানো যায় তাহলে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতির একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ইংরেজ ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে তীব্র সমালোচনা করছেন, তখন অদ্ভুতভাবে ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতিবিদ ও কংগ্রেসের জাতীয় নেতারা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোনো কথাই বলছেন না।

এবার আসা যাক মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গে। গান্ধীজি এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ও অত্যাচারিত ভারতীয়দের হয়ে আন্দোলন করছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'বোয়ার যুদ্ধ'ও (১৮৯৯-১৯০২) শুরু হয়। ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্রে বোয়াররা ভারতীয়দের কোনোরকম নাগরিক অধিকার বা স্বত্ব দিতে রাজি নয়। ইংরেজরা আফ্রিকার এই ভারত-বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয়দের সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টা করে। বোয়াররা ভারতীয়দের কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে না চাওয়ায় ইংরেজরা বোয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইংরেজদের এই লোকদেখানো ও ভালোবাসা যে কতটা মিথ্যে তা বোয়ার-যুদ্ধের কিছুদিন পরেই ভারতীয়রা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। কারণ বোয়ারের যুদ্ধের পর ফ্রি স্টেট (Free State), কেপ্ কলোনি (Cape Colony), ট্রান্সভাল ও নাটাল — কোথাও ভারতীয়রা কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা পায়নি।

ইংরেজদের বোয়ার আক্রমণের প্রধান কারণই ছিল ট্রান্সভালের নব আবিস্কৃত স্বর্ণখনি। স্বয়ং গান্ধীজিও ইংরেজদের এই সাম্রাজ্যবাদী লালসাকে চিনতে পারলেন না। তিনি তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন,

"It must be largely conceded that justice is on the side of the Boers."[৫৩]

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ইংরেজদের বোয়ারের যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য গান্ধীজি আফ্রিকায় থাকা ভারতীয়দের নিয়ে এক 'সেবা বাহিনী' (Ambulance Corps) গঠন করেছিলেন। তবে যাঁরা গান্ধীজির অনুগামী ছিলেন সবাই তাঁর এই মতকে সমর্থন করেননি। আবার অনেকে মনে করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রাই তো একটি দাস গোষ্ঠী। ফলে এই ভারতীয়দের উচিত বোয়ার জনজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করায় তাঁদের পাশে দাঁড়ানো ও বোয়ারের যুদ্ধে বোয়ারদের পক্ষ গ্রহণ করা।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলির সমস্ত সম্পদ লুঠ ও আত্মসাৎ করার জন্য নিজেদের মধ্যে কুকুর-শিয়ালের মতো টানাটানি করছে — সেসব দেখেও গান্ধীজি কোনো প্রতিবাদ করলেন না। এরপর ১৯০৬ সালে যখন 'বোম্বাটা বিদ্রোহ' হয়, তখনও তিনি আবার একটি 'সেবা বাহিনী' গঠন করে ওই অত্যাচারিত ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সাহায্য করলেন। তবে এই যুদ্ধের পরে ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর একটু মত পরিবর্তন হয়। গান্ধীজির জীবনীকার তেন্ডুলকর লিখেছেন যে,

> "এই বিদ্রোহের ফলে গান্ধীজীর চোখ খুলিয়া যায়। তাহার ফলে তিনি দুইটি বিষয়ের ওপর গভীর চিন্তা করিতে থাকেন। প্রথমত ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দরিদ্র জীবন-যাপন।"[৫৪]

কিন্তু সত্যি কথা বলতে তখন তিনি সাম্রাজ্যবাদকে চিনতে পারলেন না।

'নেশন' কী? 'ন্যাশনালিজম' কী? ভারতের জাতীয় ঐক্য কী হবে? ইউরোপের ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হবে? কিংবা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী হবে কিনা — এই সমস্ত বিষয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত গভীরভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর উপর ইউরোপীয় লেখকদের গ্রন্থগুলি পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পড়েও রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হননি। বরং এই বিষয়ে তিনি 'বঙ্গদর্শন'-এ 'নেশন কী' ও 'হিন্দুত্ব' ('বঙ্গদর্শন' – ১৩০৮ শ্রাবণ) নামে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

‘নেশন কী’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসি ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ্ রেনাঁর (Renan, Earnest) নেশন-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন এবং এই প্রবন্ধে তিনি নেশনের একটি সংজ্ঞা প্রদান করলেন। ইউরোপীয় নেশনের মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন—

> “দেখা গেল, জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন-নামক মানস পদার্থ-সৃজনের মূল উপাদান নহে।”[৫৫]

তবে তার মূল উপাদান কী? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘নেশন কী’ প্রবন্ধেই দিয়েছেন—

> “নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। ... অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবৃত্তি দান করে তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে — সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট-পরিব্যপ্ত ইচ্ছা।”[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই ধারণা ইউরোপীয় আধুনিক ‘রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ন্যাশনাল ঐক্য’ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলছেন—

> “সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা — হিন্দু তাহার কী করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ন্যাশনাল নাম দাও বা যে-কোনো নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষ-বাঁধা লইয়াই বিষয়।”[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজে ঐক্যের সঙ্গে ইউরোপীয় ন্যাশনাল ঐক্যের একটি তুলনা করেছেন। এই তুলনা করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছেন। যেমন, ইউরোপীয়রা যখন আমেরিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তখন তারা তাদের খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার করে সকলের মন জয় করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার পাশাপাশি সেখানে তারা নৃশংস ও বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়েছিল তা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। সভ্য সমাজের কথা তো বাদই দেওয়া হল, আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের শুধু দেশ থেকে উচ্ছেদই করেছিলো তাই নয়, ইউরোপীয় সভ্য সমাজের মানুষ তাদের পশুর মতো হত্যা করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ ভাবনা ও স্বদেশের কাজ (১৮৯১-১৯০৮) পর্বের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের এত বৈচিত্র্য এবং সময়ের সাথে সাথে তার পরিবর্তন এই পর্বের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় লেখনি অনেক আগে শুরু করলেও রাজনৈতিক লেখা পত্রে তাঁর প্রবেশ 'মন্ত্রী অভিষেক'-এর (১৮৯০) হাত ধরে। তাঁর এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল সেই সময়কার পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতি ও ভারতীয়দের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচার। তাই এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র লেখনীর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত থাকেননি। প্রথমে দিকে তিনি যেমন সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাগুলিতে যোগদান করেছেন, দিয়েছেন বক্তৃতাও। সেই বক্তৃতাগুলিই পরবর্তীকালে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আবার পরবর্তীকালে তিনি খুব সচেতনভাবে রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। যদিও তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি তার কারণ ছিল পারিবারিক ও প্রিয়জনের মৃত্যু। তিনি কখনো মনে করেননি যে, যা চলছে তাকে সবসময় পুরোপুরি সমর্থনই করে যাবেন বা সব কিছুকে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন। তিনি সবসময় তাঁর যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কখনো তার সমালোচনা করেছেন আবার কখনো তাকে পূর্ণ সমর্থনও জানিয়েছেন। প্রথম দিকে তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যাবলীগুলিকে সমর্থন জানালেও পরবর্তীকালে আর তা করতে পারেননি। আবার স্বদেশি আন্দোলন ও স্বরাজের প্রশ্নেও তিনি সমকালীন নেতৃত্বদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। দেশের জন্যে যখন যেটা ভালো ও কল্যাণকর বলে তিনি ভেবেছেন বিনা দ্বিধায় সেটাই করেছেন। জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁর সেই ভাবনা আজ সব থেকে বেশি করে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ বড্ড ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এমনকি ভয়ংকর বিপদের মধ্যে অবস্থান করছে। প্রকৃত জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশও স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। বর্তমানে ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদ আর দেশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে না। তাঁদের জাতীয়তাবাদ এসে দাঁড়িয়েছে ভাষা, রাজ্য, ধর্ম, অর্থ বা রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দেশ ও জাতি পক্ষে ধ্বংসাত্মক। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দেশের উন্নতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান চর্চা প্রভৃতির পরিপন্থী। তাই রবীন্দ্রনাথের দেখানো জাতীয়তাবাদ ও তাঁর নির্দেশিত পথ আজ সমগ্র দেশ ও জাতির কাছে পাথেয়।

আবার গোরক্ষাকে কেন্দ্র করে লোকমান্য তিলকের ডাকে পশ্চিম ভারতে যে আন্দোলন শুরু হয়, সেকালে দাঁড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারেননি। যদিও মহামান্য তিলকের প্রতি শ্রদ্ধাবশত

তিনি এই আন্দোলনের সরাসরি কোনো সমালোচনাও করেননি। এই পর্বেই উঠে আসে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে বিনাশ করে ইংরেজদের সুবিধা ভোগ করার কথা। এই প্রসঙ্গটি আজকের দিনে যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আসলে জাতীয়তাবাদী ঐক্য একটি দেশ ও জাতির উন্নতির অন্যতম প্রধান সোপান। তাই এই ঐক্যকে বিঘ্ন করার কাজ সেদিন তুলে নিয়েছিল ইংরেজ সরকার। আজও ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে দাঙ্গা ও ধর্মীয় বিবাদের খবর পাওয়া যায়। তখন রবীন্দ্রনাথ যেন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন এবং তাঁর চিন্তা-ভাবনাগুলিও আরও বেশি করে কার্যকরী হয়ে ওঠে। একশো কুড়ি বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা উপলব্ধি করে বলে গেছেন ভারতবাসী আজও তা অন্তরে ধারণ করতে পারেনি। আজও ভারতবাসী তাঁদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় নির্ধারণ করেন তাঁদের ধর্ম দিয়ে। আজও তাঁরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্মণ, হরিজন প্রভৃতি জাতপাতের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ভাবতে পারেনি তাঁরা ভারতবাসী, হতে পারেনি এক জাতি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধর্মীয় ভেদাভেদকেই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন ও দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায় বলে উল্লখ করেছেন। এই ধর্মীয় ভেদাভেদের মুনাফা পরাধীন ভারতবর্ষে তুলেছিল ইংরেজরা, আজ তুলছে দেশের রাজনৈতিক নেতারা। আজও দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মের জালে আটকে আছে। আর ঠিক সেই কারণেই আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র জাতির কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন যাতে ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে। অন্যদিকে ১৯০৫ -এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যখন বয়কটই প্রাধান্য লাভ করেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির দিকে মন দিয়েছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, কোনো কিছু না গড়ে শুধুমাত্র বর্জনের মাধ্যমে, ত্যাগের মাধ্যমে জাতির উন্নতি হতে পারে না। এমনকি সেই প্রশ্ন যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এসেছে, সেখানেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তার বিরোধিতা করার জন্য। অন্যদিকে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' মতো নির্মম স্বাধীনতা হরণকারী নিয়মের বিরুদ্ধেও তিনি রীতিমতো কলম ধরেছিলেন।

এই পর্বটিকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের সূচনাকাল হিসেবেও ধরা যেতে পারে। কারণ পরবর্তী কালে তার প্রায়োগ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপ্রস্তুত যেন এই পর্বেই ঘটেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা যেমন শান্তিনিকেতন, আর পল্লি-পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্র ছিল শিলাইদহ ও শ্রীনিকেতন। আবার এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গে বিরোধি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও ১৯১০ -এর পর আবার নিজেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নেন।

তথ্যসূত্র

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজনীতির দ্বিধা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২০৩।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজনীতির দ্বিধা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২০৫।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজনীতির দ্বিধা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২০৬।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ইংরেজের আতঙ্ক", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৯২।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ইংরেজের আতঙ্ক", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৯৫।

৬। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃষ্ঠা ১০৮।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সুবিচারের অধিকার", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২১২।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সুবিচারের অধিকার", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২১৪।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সুবিচারের অধিকার", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২১৫।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সুবিচারের অধিকার", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২১৫।

১১। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৫১।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কণ্ঠরোধ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২১৯।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “প্রসঙ্গ-কথা”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “চীনেম্যানের চিঠি”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৩৭।

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “চীনেম্যানের চিঠি”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪৪।

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “চীনেম্যানের চিঠি”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪৪-৪৫।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “সমাজভেদ”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “সমাজভেদ”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “অত্যুক্তি”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৬৩।

২০। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃষ্ঠা ২২৭।

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “নেশন কী”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৭।

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ভারতবর্ষীয় সমাজ”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪১।

২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৩২।

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৩২।

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজকুটুম্ব", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৩৪।

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজকুটুম্ব", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৩৫।

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঘুষাঘুষি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৩৭।

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঘুষাঘুষি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৩৭।

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঘুষাঘুষি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৩৭।

৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঘুষাঘুষি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৪১।

৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঘুষাঘুষি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৪২।

৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অবস্থা ও ব্যবস্থা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৯৩।

৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অবস্থা ও ব্যবস্থা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৯৩।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অবস্থা ও ব্যবস্থা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৯৪।

৩৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অবস্থা ও ব্যবস্থা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৯৬।

৩৬। দীক্ষিত সিংহ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩।

৩৭। দীক্ষিত সিংহ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪।

৩৮। দীক্ষিত সিংহ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১, পৃষ্ঠা ৯।

৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ"", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৮২

৪০। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃষ্ঠা ২০৯।

৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নববর্ষ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১১৬।

৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নববর্ষ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১১৯।

৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্রাহ্মণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১২৮।

৪৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্রাহ্মণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১২৮।

৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্রাহ্মণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১২৯।

৪৬। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৫।

৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪৬-৪৭।

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪৭-৪৮।

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪৯।

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৫০।

৫২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৫১।

৫৩। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃষ্ঠা ২০০।

৫৪। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃষ্ঠা ২০১।

৫৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নেশন কী", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৮।

৫৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নেশন কী", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।

৫৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভারতবর্ষীয় সমাজ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪০।

তৃতীয় অধ্যায়

আশ্রম বিদ্যালয় ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯-১৯১৯)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯০৮ সাল নাগাদ তৈরি হয়েছিল এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। একদিকে আলিপুর বোমার মামলা, সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি হয়। আবার অন্যদিকে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে চরমপন্থীদের উদ্বুদ্ধ করেন। এই এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণেও রবীন্দ্রনাথের কোনো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় তখন সমস্ত রাজনৈতিক বেড়াজাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে তাঁর সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের উন্নতিতে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর এই সময়কার সাহিত্য রচনাগুলির দিকে তাকালেও বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ যেন এক মোহ-মায়াহীন, সাংসারিক, রাজনৈতিক জটিলতা থেকে দূরে এক শান্ত নিরিবিলি স্থানে ঋষির মতো মুক্তির সন্ধান করছেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যজনকভাবে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত মৌনব্রত নিয়েছিলেন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে। ১৯০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিক গান্ধীজির নেতৃত্বে যখন অহিংস আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন, কিংবা মদনমোহন মালব্য যখন লাহোর কংগ্রেসে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যাপারে মৌন ছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের সময় কঠিন কঠোর ভাষায় রাজনীতিতে সামিল হয়েছিলেন। এবং বিভিন্নভাবে কখনো প্রকাশ্য সভায় কখনোবা লেখালেখির মাধ্যমে তাঁর মতামত জানিয়ে ছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ এত মৌন কেন?

আসলে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এসেছিল তাঁর জীবদ্দশার সবথেকে বড়ো মর্মান্তিক মৃত্যু শোকটি। এমনিতেই তাঁর জীবনে একের পর এক মৃত্যু শোক এসেছে। কিন্তু ১৯০৮ সালের ৭ অগ্রহায়ণ (২৪ নভেম্বর) রবীন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে হারান। কবির এই ছোটো ছেলেটি ছিলেন অনেকটা কবির মতো দেখতে। এমন কি এই ছোটো বয়সেই তাঁর ‘বিসর্জনে’র (১৮৯০) সংলাপ ছিল মুখস্থ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের নামের অনুকরণে তিনি তাঁকে শমী ঠাকুর বলে ডাকতেন। মুঙ্গেরে

কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১১ বছর বয়সে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান। পুত্র হারানোর শোক যে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে আঘাত করেছিল তা বিস্তারিত পাওয়া যায় ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের বর্ণনায়।

> "আমি সারারাত্রি শমীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই জাগিয়া বসিয়া রহিলেন। যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই শমীর জীবন প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই রহিয়াছেন, এ ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতে যাইবার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- "এ সময়ের যাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম, এখন অবশেষ যাহা কর্তব্য আপনি করুন। ব্রাহ্মণের মতনই শমীর শেষ কৃত্য যেন হয়, আর আমার কিছু বলিবার নাই।" পরে আমরা কয়েকজনে শমীর শবদেহ শ্মশানে লইয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রস্তরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন।"[১]

বহুকাল পরেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই পুত্রের মৃত্যুর প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন। এই মৃত্যুশোকই তাঁকে তৎকালীন রাজনৈতিক সক্রিয়তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বঙ্গভঙ্গ এবং তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ একাধিক সভায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই সময়কার প্রবন্ধগুলিতেও তাঁর ইংরেজ বিরোধিতার সুর লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎই যেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নেন। তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। আর সেই পরিবর্তনটি তাঁর সেই সময়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৯০৮) সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

তিনি এই প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে, ভারতের ইতিহাস আসলে মিলনের ইতিহাস। কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতি কখনো ভারতের ইতিহাসকে নিজেদের ইতিহাস বলে দাবি করতে পারে না। সে আর্য, মুসলমান যেই হোক না কেন। ভারতবর্ষ চিরকাল যা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যা চরম সত্য, সেই সকলকে নিয়েই আঘাত এবং সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার লড়াই চালিয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আসলে মানব ইতিহাসের এক সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। মানবের সামগ্রী করে তুলেছে। তাই ভারতবর্ষ কখনো খণ্ডতায় বিশ্বাস করেনি; সমগ্রের সঙ্গে মিলতে চেয়েছে।

পশ্চিম থেকে ইংরেজ এসে ভারতের যে স্থান অধিকার করেছে, রবীন্দ্রনাথের মতে এই ঘটনাও আকস্মিক নয়। আসলে পশ্চিমের সংস্রব থেকে মুক্ত হলে ভারতবর্ষ নিজেই বঞ্চিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে,

> "য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে।"[২]

আসলে ইংরেজকে গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায়ও নেই। কারণ ইংরেজকে বল প্রয়োগ করে তাড়নোর শক্তি ভারতবাসীর সেই মুহূর্তে ছিলো না। তাই মিলন ছাড়া অন্য উপায় নেই। আবার অতীতের ভারতের দিকে তাকালে বোঝা যায় ইংরেজরা হয়তো ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যই এসেছিলো। আসলে বৃহৎ ভারতবর্ষ তার কল্যাণের জন্য হয়তো তাই চায়।

> "ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।"[৩]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্তি দিতে গিয়ে বেশ কিছু মনীষীর কথা তুলে ধরেছেন। যারা প্রাচ্যর সঙ্গে পাশ্চাত্যকে মিলিয়ে ভারতবর্ষকে আরও একধাপ সম্মুখের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন রাজা রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, দক্ষিণ ভারতের রানাডে প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই প্রাচ্যকে অবহেলা না করেই পশ্চিমকে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিলেন। রানাডের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "ভারত-ইতিহাসের যে-উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।"[৪]

এমনকি শুধু সমাজ সংস্কার বা জাতির উন্নতির ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব এবং পশ্চিমকে মিলিয়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের যে ধারা তৈরি করেছিলেন সে কথাও তিনি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বের উল্লেখ করে বলেছেন যে, বিরোধ আসলে মিলন সাধনারই একটি অঙ্গ। রামায়ণে যেমন রাবণ ভগবানের শত্রুতা করে মুক্তি লাভ করেছিল। অর্থাৎ সত্যের নিকট যদি হার মানা যায়, তাহলে নিবিড় ভাবে সে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। সত্যকে বিরোধহীন ভাবে বা সংশয়হীন ভাবে সহজে গ্রহণ করলে তাকে সত্যিকারের বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে কঠোর লড়াইয়ের মাধ্যমে। ভারতবাসী আবার একসময়ে মুগ্ধভাবে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে ইউরোপীয়দের কাছে তাঁদের দাবী-দাওয়াগুলি পৌঁছেতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সে পথেরও বিরোধিতা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> “আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বল আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বল, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে; কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে-ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।”[৫]

তৎকালীন সময়ে ইংরেজ ও ভারতবাসীর বিরোধের অন্যতম কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এটি একটি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের প্রভাব। কিন্তু ভারতবর্ষের ঘরের মধ্যেই যখন পশ্চিম এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তাকে কোনোমতেই ফেরানো যাবে না। আসলে ইংরেজদের যা সত্য, যা শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে যদি ভারতীয়দের সংস্রব না ঘটে তাহলে ভারতবর্ষেরই ক্ষতি।

> “নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্যপ্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও

উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। ... ইংরেজেকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না; ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে; তখন বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক মতাদর্শের পট পরিবর্তনের মানসিকতা উঠে এসেছে 'সদুপায়' (১৯০৮) প্রবন্ধটিতেও। রবীন্দ্রনাথ নিজে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন। কিন্তু স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলনের নামে তখন যা চলছিল তা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। আসলে পার্টিশনের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে ভারতীয়রা কেবল বিলাতি কাপড় ছাড়ার পণ বোধহয় করেই ফেলেছিল- এর থেকে বেশি দূর আর ভাবতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলাদেশকে দু'ভাগ করার যে আশঙ্কার কারণ ঘটেছে সেই কারণটিকে দূর করা অপেক্ষা রাগ প্রকাশটাই মানুষের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ রাগ প্রকাশটা হওয়া উচিত ছিল গৌণ। ভারতবর্ষের মতো এই নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা জাতির দেশে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেওয়াটা খুবই সহজ কাজ। ইংরেজরাও সে কাজ করতে খুব একটা দেরি করেনি, সহজেই করেতে পেরেছিলো।। আসলে ইংরেজরা যাতে এই বিভাজন না করতে পারে সেই চেষ্টাই করা উচিত ছিল। কিন্তু-

"সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনপ্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিমাণ আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিমাণকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।"[৭]

আসলে বয়কটের জেদ সকলকে সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন ক'রে হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন যে, সেইসময় বাজারগুলিতে পর্যন্ত নোটিশ পাঠানো হয়েছিল যদি বিলেতি জিনিস পরিত্যাগ না করা হয়, তাহলে সেখানে আগুন লাগানো হবে। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ও দুঃখের কারণ এটাই যে, এই ধরনের উৎপাতকেও দেশের বেশিরভাগ ভদ্রশ্রেণির মানুষ অন্যায় বলে মনে করেননি। তাঁদের স্থির বিশ্বাস দেশের ভালোর জন্য এ রূপ উপদ্রব করা যেতেই পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ বারবার সতর্ক করে বলেছেন,

> "তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য-ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড়ো অহিত আর কিছুই নাই। দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণপক্ষকে নিজের মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে, ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দেমাতরম্-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না-এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না; ভয় দেখাইয়া, এমন-কি কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া, মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য-সাধন বলে না।"[৮]

আসলে তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সময় যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তা সেইসময়কার কোনো মহলেই সমাদৃত হয়নি। এই নিদারুণ অভিমানই হয়তো রাজনীতির দিক থেকে তাঁকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছিল। এবং বাইরের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে দূরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি বিদ্যালয়টিকে ধীরে ধীরে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে তুলছিলেন।

এই পর্বের শুরুতে দেখা যায় শিলাইদহ এবং কলকাতায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে বারবার যেতে হয়। (শিলাইদহে হুঙ্কার সংক্রান্ত ঝামেলা এবং মামলা) কিন্তু তিনি সময় পেলেই শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের টানে ফিরে এসেছেন বারবার। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ অগ্রাহায়ণ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি চিঠিতে আশ্রম বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিদ্যালয়ের নূতন সেশন আরম্ভ হয়েছে। তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাকেও ক্লাস নিতে হচ্চে তাতে ক্লাসের সুবিধা হচ্চে কিনা বলা কঠিন কিন্তু আমার সমস্ত অবসর মারা যাচ্চে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।"[৯]

আবার তিনি আশ্রম বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নিয়ে যে চিন্তিত সেই বিষয়টি পাওয়া যায় হিমাংশু প্রকাশ রায়কে লেখা চিঠিতে। সেই সময়ে হিমাংশু প্রকাশ কণিকা-র অনুকরণে গদ্য আকারে বালকদের পাঠ্য হিসেবে 'কতকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ খণ্ডচিন্তা'[১০] রচনা করেন।

বলাবাহুল্য হিমাংশু প্রকাশের লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথকে খুব একটা খুশি করতে পারেনি। রচনার ভাষা সম্পর্কেও তিনি বলেছেন,

"নিতান্ত কথিত ভাষায় লিখিবেন না - তাহার আর কোন কারন নাই, কেবল কথিত ভাষা বাংলাদেশের সকল জেলার ভাষা হইতেই পারেনা ইহাই কারণ। তাই বলিয়া উগ্র বইয়ের ভাষা হইলেও চলিবে না, যাহাতে কথিত ভাষার রসটুকু থাকে অথচ পুঁথির ভাষার সম্ভ্রমটুকুও রক্ষা হয় এমন হওয়া চাই।"[১১]

এখানে কথিত ভাষা বলতে তিনি আঞ্চলিক ভাষাগুলি কথাই বলতে চেয়েছেন এবং পরবর্তীকালে তিনি চলিত ভাষার স্বপক্ষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ইতিহাস শিক্ষার জন্য জীবনচরিত বা ইতিহাস বইয়ের ছোটো ছোটো গল্প সংগ্রহ করে ছেলেদের পড়ানোর কথা বলেছেন। এমনকি রাজপুত্র ও শিখদের ইতিহাস থেকে ছেলেদের উৎসাহজনক গল্পের মাধ্যমে তাঁদের ত্যাগ বীর্য অধ্যবসায় ধর্মনিষ্ঠ সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। তার মধ্যে এই গল্পগুলি বালকদের মনে মুগ্ধতা ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে। এখানে বলা দরকার এই সমস্ত কিছু যে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সে চাহিদা পূরণ হয় রাজপুতদের কাহিনি অবলম্বনে কথ্য ভাষায় লেখা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী (মেবার) প্রথম খণ্ড' -এর মাধ্যমে (জুন, ১৯০৯)।

তিনি নিজেও এই সময়ে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের জন্য ‘মুকুট’ নামে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস থেকে ‘মুকুট’ (১৯০৮) নাটিকা রচনা করেন। এই নাটকটিতেও মনোমুগ্ধকর চরিত্র, গঠনাত্মক অধ্যবসায়, ধর্মনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত চিত্রিত হয়েছে।

বিদ্যালয় নিয়েই বহির্মুখী কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক নিগূঢ় অন্তর্মুখী সাধনা চর্চাতেও লিপ্ত হচ্ছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রতি বুধবারে ‘ব্রম্ভপাসোনার প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দ প্রথম থেকে ব্যাখ্যা করেছেন’। যদিও এই বহির্মূখী কাজেও তাঁর স্বাভাবিক সংকোচ ছিল। কিন্তু অন্যের তাগিদে নিজের ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্যকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

এবিষয়ে ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন,

> “দেখিতাম তখন প্রতিদিন শেষরাত্রিতে ৩টা ৩ || টার সময় তিনি মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া ধ্যানে বসিতেন। তাঁহার সেই ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্যের একটু প্রসাদকণার আবেদন তাঁহার কাছে বার বার জানাইয়াছিলাম। একদিন তিনি জানিলেন যে আগামী ১৬ই অগ্রহায়ণ আমার একটি বিশেষ দিন। সেই উপলক্ষে কি আশীর্বাদ তিনি দিবেন সেই কথাই যখন তিনি ভাবিতেছেন তখন তাঁহার কাছে আমি সেই প্রভাত-উপাসনারই একটু প্রসাদ ভিক্ষা করিলাম। প্রভাতকালের এই ব্রাহ্মমুহূর্তটি তাঁহার বড় যত্নের ধন। এই সময়টুকুই একান্তভাবে তাঁহার অধ্যাত্মলগ্ন। তাই যখন তিনি একটু ইতস্তত করিতেছেন তখন আমরা অনেকেই তাঁহার কাছে ঐ একই আবেদন জানাইলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিন্তু অতিশয় সংকোচের সহিত তিনি কিছুদিনের মত রাজী হইলেন।
>
> শীতকাল। অগ্রহায়ণ মাস। শান্তিনিকেতনের মন্দিরের বারান্দায় শেষরাত্রি ৪ || টায় আমরা কয়েক জন একত্র হইতাম । তিনি তারও বহুপূর্বে সেখানে বসিতেন। ৪ || টা হইতে ৫টা আমরা তাঁহার সদ্যপ্রাপ্ত ভাগবত সত্যের কিছু প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া যাইতাম। তিনি তাহার পর আরও অনেক ক্ষণ সেই আসনে বসিয়া থাকিতেন। কিছুকাল এইরূপ চলিল। যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা তাহাতে খুবই উপকৃত ও তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু তিনি আপনার মর্মের এই সব কথা শুনাইতে বড়ই সংকোচ বোধ করিতেন। তিনি কোথাও গেলে বা অন্য কারণে মাঝে মাঝে বাধাও পড়িত। তবু প্রতিদিন প্রভাতের এই ব্যবস্থা বেশি দিন চলিল না। ছয়টি মাস পূর্ণ না হইতেই তিনি নম্রভাবে একান্ত সঙ্কোচ জানাইয়া বিদায় লইলেন।

১৩১৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩১৬ সালের ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঐসব অধ্যাত্ম মুহূর্তগুলির কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা আমাদের ভাষায় এক অমর সম্পদ হইয়া রহিল।”[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণগুলি ‘শান্তিনিকেতন’ নামে বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তাঁর মনের অনেকটা অংশ যে আশ্রম বিদ্যালয় অধিকার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা ৬ পৌষের একটি চিঠি থেকে। বিদ্যালয়েকে তিনি কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রের মধ্যে সীমিত রাখতে চাননি। বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি আত্মিক বিকাশের সাধনাও যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর কাছে তা প্রকাশ পেয়েছে এই চিঠিতে।

“আমাদের বিদ্যালয় অল্পে অল্পে উন্নতির পথে যাচ্চে বলে অনুভব করচি। এর উপরে এখন দেশের লোকের বিশ্বাস আকৃষ্ট হয়েছে। ৮৫ জন ছেলে হয়েছে—আর রাখবার জায়গা নেই। শুধু ছাত্র বৃদ্ধিতেই যে আমরা উন্নতি অনুভব করচি তা নয়—আমাদের নিজের চিত্তও যেন কাজের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্চে। এই আশ্রমের উপর, কর্ম্মের উপর, আমাদের হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করচি- আমাদের সাধনার মধ্যে সেই সিদ্ধিদাতাও যে আছেন এখন সে কথাটা যেন আর প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই।”[১৩]

আবার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়,

“আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের সূচনা হয়েছিল শারদোৎসব লেখারও আগে। ১৯০২ সালেই আশ্রমের উদ্যোগে বিসর্জন নাটকের অভিনয় হয়েছিল। তখন ওখানে না ছিল মঞ্চ, না ছিল এর সঙ্গে সম্পর্কিত জিনিসপত্র কিন্তু এ সকল বস্তুর অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল আন্তরিকতা ও উদ্যম। তখন ছাত্রসংখ্যাও বেশি ছিল না। কাজেই সন্তোষ মজুমদার, নয়ন চট্টোপাধ্যায় আর আমি-এ তিনজনকেই প্রধান প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। রিহার্সাল চলতে লাগল নিয়মিত। এর মধ্যে এন্ট্রান্স পরীক্ষা এসে গেল। শিক্ষকগণ বাবাকে বোঝালেন যে আপাতত নাট্যচর্চা বন্ধ না করলে আমাদের পরীক্ষা পাসের কোনো আশা নেই। বাবা অবশ্য তাঁদের কথায় কান দিলেন না। আমাদের খুশি দেখে কে?

> শিক্ষকদের আপত্তি কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। তাঁরা দিনের পর দিন এর বিরোধিতা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু বাবা কখনোই তাঁদের সঙ্গে একমত হননি।
>
> লাইব্রেরির পিছনের লম্বা ছাউনি খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেখানেই নাটকের মঞ্চায়ন করা হবে ঠিক হল। কিন্তু মঞ্চ তৈরির যোগাড়যন্ত্র বলতে ছিল কেবল কয়েকটি আধভাঙা খাট। পর্দায় বিভিন্ন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কোলকাতা থেকে একজন চিত্রকরকে আনা হল। একটি সাধারণ তুলি হাতে নিয়ে তিনি অসম্ভব দৃশ্যাদি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।"[১৪]

এখান থেকেই আশ্রম বিদ্যালয়ের একদম গোড়ার পরিস্থিতিটি স্পষ্টভাবে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই যে পাশের পড়াকে ততখানি গুরুত্ব দেননি যতটা দিয়েছিলেন আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষালাভকে।

রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের গ্রন্থ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতাটি দেন। যা পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী' (ফাল্গুন সংখ্যা), 'ভারতী' ও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। পাদটিকা সহ বক্তৃতাটি 'দুই ইচ্ছা' নামে মুদ্রিত হয়। যদিও পরবর্তীকালে এই রচনাটি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

অথচ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্বের মূল ভাবনাটির সূচনা প্রথম এই বক্তৃতার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। 'আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন' যা গীতাঞ্জলি পর্বের মূলভাবনা। সেই ভাবনাটির মাধ্যমে ব্রহ্মোৎসবকে মিলন উৎসব ঘোষণা করে তার মধ্যেই দুটি মিলনকে প্রত্যক্ষ করেন।

এই সময় রবীন্দ্র ভাবনায় প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের এক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ১৩১৫ মাঘোৎসবের সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন 'নবযুগের উৎসব' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে তিনি ব্রহ্মোৎসবে পূর্বের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যদিও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যকে নিয়ে একসাথে চলার ভাবনা রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই ভেবেছেন। তাঁর বহু রচনা এই দুই সভ্যতার ধারার অমিলগুলি পর্যালোচনা করে মিল খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে জমিদারির কাজে রবীন্দ্রনাথকে আবার শিলাইদহ যেতে হয় এবং এই সময়ে তিনি কলকাতা থেকে খবর পান শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে সতীশ চন্দ্র রায়ের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

একটি স্মরণ সভা হচ্ছে। এই সংবাদটি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ অজিত কুমার চক্রবর্তীকে একটি চিঠি লেখেন ১৩১৫, ২৪ মাঘ।

> "সতীশের জীবনটুকু আমাদের বিদ্যালয় এবং আমাদের সাধনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। সে আমাদের বিদ্যালয়কে শক্তিও দিয়েছে সৌন্দর্যও দিয়েছে - স তপোইতপ্যত এবং সে আনন্দে নন্দিত হয়েছে। তার সেই জীবনের দানটি ক্রমেই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠতে থাকবে। আমাদের বিদ্যালয়ের মূল সুরটি, সেই কবি-তপস্বী তরুণ যুবা ধরিয়ে দিয়ে গেছে- ত্যাগ এবং লাভের সম্পূর্ণতাটুকু তার ঐ কয় দিনের জীবনে সে পবিত্র এবং মধুর করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে - আমাদের সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে তার সেই সুরটি নিশ্চয়ই ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। ... এই কাজটির জন্যেই কি সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল? তাই যদি হয় তাহলে নিশ্চয় জানতে হবে আমাদের এই কাজের আয়োজন অনেক দিন থেকে হচ্চে এবং আমাদের এই কাজটির মৃত্যু নেই, সতীশের এই মৃত্যু দ্বারা আমাদের এই সাধনা অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। আমি যে কাকে চাচ্চি, কেমন করে চাচ্চি, সমস্ত জীবনটা যে কোন্ উদ্দেশে চলেছে সেই প্রশ্নের উত্তরটা যখন তোমাদের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আমার কাছে আসে তখন আমি বিশেষ একটা শক্তি লাভ করি—বুঝতে পারি আমার কোনো সত্য যদি তোমাদের সম্মুখে মূর্তিগ্রহণ করে থাকে তবে সেটা কাল্পনিক নয়। নিজের জীবনের মূলগত সত্যকে কর্মক্ষেত্রে এবং তোমাদের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে দেখতে পাব ততই তার জন্যে ত্যাগ আমার পক্ষে সহজ, দুঃখ আমার পক্ষে আনন্দময় হয়ে উঠবে।"[১৫]

এই সময় রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে কতখানি আত্মিক সাধনার ক্ষেত্র রূপে প্রস্তুত করেছিলেন তার প্রমাণ এই পত্র। তাঁর লেখনি এবং কর্মক্ষেত্রকে একই রূপে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি এখানে ফুটে উঠেছে।

এই সময়ে একদিকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, অন্যদিকে পারিবারিক টানা -পোড়েন, আবার জমিদারি এইসব নিয়ে ছিল তাঁর ব্যস্ততা। তিনি তাঁর বড়ো জামাতা শরৎকুমার চক্রবর্তীকে ব্যারিস্টারি পড়ানোর জন্য বিলেত পাঠান ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এবং বিলেত থেকে পরের বছর তিনি ফিরে এসে জোড়াসাঁকো

ঠাকুরবাড়ি থেকেই আইন ব্যবসায় লিপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথের ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়।

> "শরৎ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছেন। আপাতত মজঃফরপুরে গিয়াছেন–ইস্টারের ছুটির পর কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায়ে যোগ দিবেন। তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে আমার সংসারের একটা দিকের চিন্তার অবসান হইবে।"[১৬]

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই আশা পূরণ হয়নি। বরং তাঁকেই সংসারের দায়ভার বহন করতে হয়েছিল। এই সময়ে তাঁর জমিদারিতেও বেশ কিছু সংকট দেখা দেয়। তিনি জমিদারিতে বিভিন্ন সংস্কার করেন এবং প্রজাকল্যাণমূলক বিভিন্ন দায়িত্ব তাঁর বিশ্বস্ত কয়েকজন কর্মচারীর ওপর তিনি দিয়ে আসেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই কর্মচারীদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। জানকীনাথ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে তারই উল্লেখ পাওয়া যায়।

> "মধু [সূদন দাস] বোলপুর আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম– সত্যকুমারের [মজুমদার] বিরুদ্ধে তোমার মনে বিকার দেখা দিয়াছে। এবং সেই বিকার যথোচিত উপায়ে সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া মধুকে তুমি তোমার সহায় করিয়াছ। ... তুমি মধুকে যে পত্র লিখিয়াছ তাহার মধ্যে তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় নাই– তাহার মধ্যে গূঢ় বিদ্বেষের ভাষা আছে। আমার তাহা পড়িয়া মনে হইল– মধুও সদর হইতে কোনো অত্যুক্তির দ্বারা তোমার মন কলুষিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ...
>
> সত্যকুমার সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা জন্মিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমার কোনো কাজের বিরুদ্ধে সত্যকুমার চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রত্যয় হয় তবে তাহা অমূলক। যদি সমূলকও হয় তবু নিজের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা রাখিয়োনা। সংসারে কোথাও কোনো পাপ উঠিতেছে যদি দেখ তবে বাহির হইতেই তাহা মুছিয়া ফেলিবে- তৎক্ষণাৎ তাহার যাহা উচিত প্রতিকার তাহা সারিয়া একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে–তাহাকে নিজের মনের মধ্যে কোনো মতেই তুলিয়া রাখিবেনা। তোমার এই কর্ম্মক্ষেত্রই কি তোমার চিরজীবনের ক্ষেত্র? এইখানকার বাধাবিঘ্ন মান অপমান রাগ দ্বেষ ঈর্ষাই কি তোমার চিরদিনের? ... কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে তোমার কোনো ক্ষুদ্রতার সহায় করিয়োনা–তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রতা

দূর না হইয়া কেবলি প্রশ্রয় পাইবে। তুমি নিশ্চয় জানিয়ো ক্ষুদ্রতার বন্ধুরা যখনি সুযোগ পাইবে তখনি তোমার শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইবেনা–ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কর্ম্মের সম্বন্ধ রাখিবে। হৃদয়ের সম্বন্ধ রাখিবে না।"[১৭]

এই পত্রটির আরো একটি গুরুত্ব রয়েছে _সেটি হল এটি রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মানব চরিত্রকে দেখতেন, তার পরিচয় দেয় এই চিঠি। তিনি জমিদারি কর্ম পরিচালনার যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তা তিনি নিজের আদর্শ দিয়ে পরিচালনা করতে চেয়েছেন। এই বছরই ১১ এপ্রিল জানকীনাথকে লেখা আরও একটি চিঠিতে তার জমিদারি পরিচালনার এই আদর্শটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

"আমি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারিনা। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন তাহারা অনেকে কর্ম্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের যথার্থ কর্তব্যসাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে–তোমাদের কর্ম্ম ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পুণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব। এই জন্যই তোমাদের চিন্তা ও ব্যবহার কেবলমাত্র বৈষয়িক কর্ম্মের উপযুক্ত না হয় এই দিকে আমার দৃষ্টি আছে । ... তোমাদের চরিত্রে ব্যবহারে ও কর্ম্মপ্রণালীতে আমাদের জমিদারী যেন সকল দিক হইতে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠে।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথের এই আশা সম্পূর্ণ পূরণ হয়তো হয়নি। কিন্তু সে যুগে দাঁড়িয়ে একজন জমিদার যে এই কথা ভেবেছেন- তা হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ কেবল নিজে নয় বরং প্রজাকল্যাণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তিনি বন্ধু ত্রিপুরা রাজ রাধাকিশোর মানিক্যকেও উপদেশ দিয়েছিলেন। যদিও খামখেয়ালী রাধা কিশোরমানিক্য কবির সেই উপদেশ খুব একটা গ্রাহ্য করেননি। তাই তাঁর সাথে কবির দূরত্বও তৈরি হয়। কিন্তু দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর, ত্রিপুরার উন্নতির জন্য ত্রিপুরার উত্তরাধিকারী যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরকে তিনি একটি পত্র

লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণের জন্য তাঁকে বেশ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন এবং এই পত্র প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই প্রজা কল্যাণকামী ছিলেন। তিনি যখন যেখানে যেভাবে সুযোগ পেয়েছেন প্রজা কল্যাণ করার চেষ্টা করে গেছেন।

ত্রিপুরারাজ্যের কল্যাণের স্বার্থে ভাবী রাজা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার উপদেশ দিয়ে লেখেন:

> "ত্রিপুরার রাজ্যভার যাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আনুকূল্যে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে-কারণ, তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ তোমাদের সকলের কল্যাণ। রাজ-সিংহাসনের চারিদিকে অনেক শত্রু আছে, এই সময়ে তোমাদের নূতন রাজাকে তাহাদের কপট বন্ধুতা হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এক্ষণে তুমিই তাঁহার সকলের চেয়ে নিকটতম আত্মীয়–তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মঙ্গল সম্বন্ধ যেন কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন না হয়–তাহা হইলে বাহিরের শত্রুরা সুযোগ পাইয়া বসিবে। তাহারা তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাহাদের সেরূপ কুচক্রান্ত যেন কোনোদিন সফল না হয় – তোমার অবিচলিত হিতৈষিতার প্রতি রাজার মনে কেহ যেন কোনো দিন সন্দেহ না জন্মাইতে পারে–তোমার স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা সততার দ্বারা তুমি যেন সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের উপরে জয়ী হইয়া তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনে তোমার শক্তিকে নিযুক্ত করিতে পার।"[১৯]

এই ত্রিপুরার রাজ্যের সঙ্গে আশ্রম বিদ্যালয়েরও একটি যোগসূত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ত্রিপুরার মহারাজ রাধা কিশোর মানিক্য আশ্রম বিদ্যালয়কে বার্ষিক ১০০০ টাকা সাহায্য করতেন। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুর পর সেই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তবে আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগসূত্র কিন্তু থেকেই যায়। ত্রিপুরা থেকে বহু ছাত্র শান্তিনিকেতনে পড়তে আসে।

১৯০৮-১৯০৯ থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের বেশিরভাগ ঘটনাই আবর্তিত হয়েছে আশ্রমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এবং রবীন্দ্রনাথের সহচর্যে এই আশ্রম বিদ্যালয় ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় জল কষ্টের জন্য গ্রীষ্মকালে বন্ধ থাকতো। ১৬ বৈশাখ থেকে ১ আষাঢ় পর্যন্ত প্রায় দেড় মাস এই গরমের ছুটি থাকতো। কিন্তু এই জল কষ্ট দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বারংবার

চেষ্টা করেছেন। কখনো তিনি বারবার চিঠি লিখেছেন বিভিন্ন জায়গায় শুধুমাত্র ইঁদারা খননের জন্য এবং তার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে ধার পর্যন্ত করেছেন।

প্রাক্তন আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন:

> "তোমার সন্ধানে ওখানে ইঁদারা খননে অভিজ্ঞ ভালো লোক আছে কি, গভীর ইঁদারা খুড়িতে হইবে - ১০০০। ১২০০ টাকা খরচ হইবে কিন্তু লোক পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।"[২০]

আবার সত্য প্রসাদের হিসাবের খাতা থেকে জানা যায় যে, বিদ্যালয়ের কূপ খনন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এই ঋণ তিনি শোধ করেছেন কখনো বিভিন্ন গল্প উপন্যাস লিখে। আবার কখনো বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন এবং তাঁদের রচনা শক্তি উন্নত করার চেষ্টা করেছেন। আর এই সমস্ত লেখা পত্র থেকে যে আয় হতো তা তিনি আশ্রম বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে লাগিয়েছেন।

আশুতোষ রায় চৌধুরীকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, আশ্রম বিদ্যালয় রোগীদের থাকার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করা হয়েছিল, তার জন্য যে ৪৫০ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার উল্লেখ এই চিঠিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের এই নির্মাণ কার্য অর্থাৎ আমরা যাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলাপমেন্ট বলে থাকি সেটির পাশাপাশি তিনি পঠন পাঠনের উন্নতির জন্য শিক্ষক নিয়োগও করেছেন। যখন বিদ্যালয়ের নির্মাণকার্যগুলির জন্য এত টাকা খরচ হচ্ছে তখন গ্রীষ্ম অবকাশের পর বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ও সর্বাধিক বেতনভোগী শিক্ষক বেদ উপনিষদ মধ্যযুগের সন্তসাহিত্যে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) বিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শুধু বালকদের জন্য ছিল না। ধীরে ধীরে সেখানে বালিকাদেরও সমাগম ঘটে। এমনকি শিশু ছাত্রদের পড়ানোর জন্য এবং তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯০৯ সালে শরৎকুমার চক্রবর্তী বিলেত যাওয়ার পর মাধুরীলতা শিশু ছাত্রদের

পড়ানোর দায়িত্ব নেয়। তবে রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বটিকে কেবলমাত্র ইচ্ছের ওপর নির্ভর না করে নিয়ম করার চেষ্টায় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে অজিত কুমারের মা সুশীলা দেবীকে শিশু বিভাগের দায়িত্ব দেয়ার কথাও তুলেছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গটি বারবার তোলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে যেসব মেয়েরা পড়তে এসেছিলেন তাদের জন্য শিথিল ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ে একে একে বিভুচরণ গুহঠাকুরতার বোন বাল্য বিধবা লাবণ্যলেখা, ক্ষিতিমোহন সেনের শ্যালিকা হেমলতা, ডাক্তার প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা হিরণ ও ইন্দু, জগদানন্দের কন্যাদ্বয় তরুবালা ও পারুল- এরা শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসেন এবং এদেরকে নিয়ে একটি ছোটোখাটো বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৩১৫ সালের ৩১ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন,

> "বিদ্যালয়টি বেশ পূর্ণ হয়ে এসেছে। ক্রমে এর পাশে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে উঠেছে এবং হু হু করে সেটি বেড়ে ওঠবার মতলব করচে। অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভয়ে এগইনি- ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।"[২১]

তবে এই মেয়েগুলি বিদ্যালয়ের বালকদের সঙ্গেই পড়াশোনা করত। এদের দেখাশোনার জন্য আলাদা স্ত্রীলোক কর্ত্রী নিয়োগ করা হতো। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পরলোকগত মোহিত চন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী এই কাজে নিযুক্ত হন। তবে এই বছর পুজোর ছুটির পর তিনি আর কাজে ফিরে আসেননি এবং কিছুকাল পরই বালিকা বিদ্যালয়টিও বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। প্রায় ৮৫ জন ছাত্র এই সময় আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছিল।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে যে বালিকা বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেই স্কুলেই নিজের মেয়েকে ভর্তি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মনোরঞ্জন বাবু। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানান যে, মেয়েদের ইস্কুলের বেতন ও নিয়মাবলী ছেলেদের বিদ্যালয়েরই সমান, এমনকি তাঁকে একবার শান্তিনিকেতনে এসে সবকিছু দেখে শুনে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপদেশ দেন। এই সময় সতী নামের একজন ব্রাহ্মসমাজের কুমারী কন্যাকে শিশু বিভাগের কর্তৃপদে নিয়োগ করার জন্য কাদম্বিনী দত্ত প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে খুব একটা রাজী

ছিলেন না। ১৯০৯ সালের ২৪ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে বালিকা বিদ্যালয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে চিঠিতে কিছু কথা লেখেন-

> "এখন ৬ টি মেয়ে পড়ে- ছুটির পরে আষাঢ় মাসে আরো কয়টি আসিবে কথা আছে। মোহিত বাবুর স্ত্রী এবং আর দুই একটি বয়স্কা মহিলা এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন।"[২২]

এই সময় রবীন্দ্রনাথ নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে আশ্রম বিদ্যালয় নিয়ে তাঁর উৎসাহ ও চর্চা বন্ধ ছিল না। ১৯০৯ সালের ১৯ বৈশাখ রিপন কলেজের অধ্যাপক জীতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপুরহাটের প্রসিদ্ধ স্বদেশি প্রচারক ও গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করার জন্য শান্তিনিকেতনে যান। ঐদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেন।

'প্রবাসী'-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ক্রমশ মজবুত হচ্ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে বেশ কিছু পত্রিকা পাঠিয়ে দিতেন প্রবাসী পত্রিকার 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের জন্য এবং মুদ্রিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার ও সমালোচনামূলক মন্তব্য লিখতেন কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আবার কখনো বা আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক হিমাংশু প্রকাশ রায়কে লেখা চিঠিতে জানা যায়-

> "প্রবাসীর জন্য সেই সংকলনগুলির প্রতি মন দিবেন। প্রবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দ্বারা বদ্ধ ছিলাম, সম্প্রতি তিনি বিদ্যালয়কে ১০০ টাকা দান করাতে ঋণেও আবদ্ধ আছি- এই জন্য উদ্বিগ্ন আছি।"[২৩]

এই সময় একাধিক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় তিনি নিউর‍্যালজিয়ার বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই তিনি এসময় এলাহাবাদ স্টেশনে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গৃহে আশ্রয় নেয়। তারপর সেখান থেকে দিল্লিতে বিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা হেমচন্দ্র সেনের বাড়িতেও কিছুদিন বিশ্রাম নেন। ১৯০৯ এর ১৯ মে অজিত কুমারকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন,

"দিল্লিতে নিশিকান্তের [সেন] সঙ্গে আলাপ করে বেশ আনন্দ পেয়েছি। নেপাল [চন্দ্র রায়] বাবুর সঙ্গে পরিচয়েও তৃপ্তি লাভ করেছি।"[২৪]

অসুস্থতার জন্য এখানে থাকাকালীন সময়ে তিনি এলাহাবাদে এক সভায়ও অংশগ্রহণ করেন। নেপালচন্দ্রের পুত্র কালিপদ রায় এই সভা প্রসঙ্গে বলেছেন –

"গাছের তলায় শিক্ষককে ঘিরে ছেলেরা কম্বলাসনে বসে পড়া আরম্ভ করল, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত ছেলেরা সব গাছের আগডালে উঠে বসে আছে"- কথাটি আমি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম শান্তিনিকেতনে আসবার এক বছর আগেই, সেই আমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা। সেদিন এলাহাবাদের অ্যাংলো-বেঙলি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি প্রবাসী বাঙালি ছাত্রদের বাংলা শিক্ষাকে সরস করে তুলবার চেষ্টাকে উৎসাহিত করেছিলেন, যাতে তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন জীবন্ত এবং আনন্দময় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে বোলপুরের উন্মুক্ত মাঠের বিদ্যালয়টির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বলেছিলেন।"[২৫]

একদিকে কবি যেমন স্বপ্নের ব্রহ্মচার্য আশ্রমকে ধীরে ধীরে বিকশিত করছিলেন, তেমনি তাঁর শক্তি একের পর এক অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক শরৎকুমার রায়ের লেখা 'শিবাজী ও মারাঠি জাতি' বইটি প্রকাশিত হয় এবং মনে করা হয় ১৯০৯ এর আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন। লক্ষণীয় যে, ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ মারাঠি জাতির দেশপ্রেম, শিবাজীর উত্থান ইত্যাদি নিয়ে তিনি একটি সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন যা তাঁর জাতীয়তাবাদ বোধেরই অন্যতম প্রকাশ।

তাঁর মতে শিবাজী সৃষ্টি করেছিলেন স্বয়ং মারাঠা জাতি। কারণ মারাঠা জাতির মধ্যেই কেবলমাত্র 'আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্ট সত্তা অনুভব' ছিল। কারণ মারাঠা জাতি বহুদিন ধরেই বহু বীরের

মাধ্যমে উচ্চ-নিচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি কৃত্রিম ব্যবধান দূর করে সকলকে সমান গৌরবের অধিকারী করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শিবাজীর মতো প্রতিভা সেই মন্থন থেকেই উদ্ভূত। এছাড়াও তিনি মনে করেন দেশের ধর্ম বুদ্ধির সঙ্গে তা শিবাজীর চেষ্টার যোগ ছিল বলেই তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তার কীর্তি ধ্বংস হয়নি। কিন্তু ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হয়ে গেলে মারাঠা জাতিরও অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করেছিল এবং স্বার্থই তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে- ‘ইহাই মারাঠা- অভ্যুত্থান পতনের ইতিহাস’। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, ধর্মের উদার বুদ্ধি যখন সমস্ত ভেদ বুদ্ধিকে অতিক্রম করে, তখনই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একযোগে কাজ করে সফলতা নিয়ে আসে এবং মারাঠা জাতির ইতিহাস সেই প্রমাণই দেয়। কোনো ক্রমে এর ব্যতিক্রম ঘটলে যত শক্তিশালীই হোক না কেন সে জাতির পতন অনিবার্য।

১৯০৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতাতে থাকাকালীনই তিনি অজিত কুমার চক্রবর্তী এবং সুশীলা সেনকে দুটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি থেকে অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাওয়া যায়। এক রবীন্দ্রনাথ যিনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জমিদারি এলাকার ক্ষয়-ক্ষতি দেখে জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে অন্য এক আভাস দিয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ আবার সুশীলা সেনকে লেখা চিঠিতে বালিকা বিদ্যালয়ের ভবিতব্য নিয়ে আশঙ্কা করেছেন।

অজিত কুমারকে লেখা পত্রটিতে দেখা যায়-

> “ঝড়ে আমাদের জমিদারি বিস্তর ক্ষতি করেছে। ... যখন সংসারে কোন ক্ষতিকে ক্ষতি বলে গণ্য করি তখন তার থেকে প্রমাণ হয় অন্তরের ভিতরকার লাভকে লাভ বলে উপলব্ধি করচি নে।...
>
> তাঁর প্রেম তাঁর আনন্দকে হৃদয়ে যথার্থভাবে লাভ করলে তখনই এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে এড়ানো যায়। সংসারের ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই -একমাত্র প্রেম আছে।...
>
> এই বেদনাটা আমার হৃদয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংসারকে বড় করা চলবে না। সংসার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্ত করবার সাধনা ও শক্তি আমার নেই বলে ভয় করচি অথচ তাঁকে পাওয়া ছাড়া কোন গতি নেই এও নিশ্চয় জানি। অতএব এই দ্বন্দ্ব খুব একটা দুঃখের ভিতর দিয়ে ছাড়া কাটবে না। মনে হচ্চে যেন ঈশ্বর দয়া করে এই রকমের একটা দুঃখ আমার কপালে লিখে রেখেছেন। আমার পথ

সহজ নয়। যে লোক একটায় আটকা পড়েছে অথচ আর একটাকে চায় তাকে নাড়ি ছেদন করে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হতে হবে।”[২৬]

অন্যদিকে সুশীলা সেনকে লেখা চিঠিটি মূলত বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কিত। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে গিয়ে তাঁকে যে ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এবং সেই বিদ্যালয়েও যে তার ভবিতব্য এড়িয়ে যেতে পারবে না সেই কথা তিনি চিঠিতে লিখেছেন।

“... যেন বিরোধ নেই এমন একটা অমূলক কল্পনা নিয়ে কাজ করতে গেলে বিপদ ঘটতে বাধ্য। বিরোধ যে আছে তার প্রমাণ তো পাচ্চই- সেইটিই ত আমাদের এত আঘাত করচে কষ্ট দিচ্চে।

আশার বিষয় এই যে আমরা আঘাত পাচ্চি। যদি আশ্রমের অধি দেবতা জাগ্রত না থাকতেন তাহলে এত দুঃখ পেতুম না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অবস্থা সেখানকার আদর্শের উপযোগী না হয়ে উঠবে - ততক্ষণ কেবলই থেকে থেকে ঝড় জাগবে- ভাঙাচোরা চলবে- ততক্ষণ আমাদের শান্তি থাকবেনা। যে সত্য সামঞ্জস্যের মধ্যে সমস্ত বিরোধের অবসান হয় সেখানে আমরা চোখ বুজে পৌঁছতে পারিনে-বিস্তর দুঃখদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সেই বৃহৎ শান্তি ও সফলতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে হয়। ... দুঃখকে স্বীকার না করে সার্থকতাকে পাব না এ যখন নিঃসন্দেহ তখন একটাকে বাঁচাতে গেলে অন্যটা ত্যাগ করতে হবে।”[২৭]

এই সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতার বিভিন্ন হলে একের পর এক বক্তৃতা দিতে থাকেন। এই জন্য কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে তাঁকে যেতে হয়েছে। এমনকি এই সভাগুলিতে বক্তৃতার জন্য তিনি বেশ কিছুদিন বোলপুর থেকে দূরে অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার এইসব কাজ সেরে তিনি অক্টোবর মাসে ভাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও জামাতা শরৎকুমারকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই নির্জন মন্দিরে উপাসনা করতেন এবং তাঁর এই সময়ের সঙ্গী ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়। যদিও পরবর্তীকালে তিনি জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়কে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কাজকর্ম থেকে মুক্তি দেন। দুঃখের বিষয় হল, সেই মুক্তির কারণ ছিল আশ্রম বিদ্যালয়ের ব্যয় সংকোচন।

“সম্প্রতি আমাদের একটা বৈষয়িক পরিবর্ত্তনে সহসা আমার স্কন্ধে দুর্ভর দায় চাপিয়াছে। এতদিন আর্থিক বিষয়ে বিদ্যালয়ের চরম দায়িত্ব আমি নিজের পরেই রাখিয়াছিলাম। এখন তাহা রাখা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হইবে ।

সুতরাং যে পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় বিদ্যালয় এক্ষণে নিজের আয় হইতে যোগাইতে পারিতেছে না, তাহা নিতান্তই সংক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আমার হাতে নাই। ত্রিপুরার দানসাহায্যও (বাৎসরিক এক হাজার টাকা) বন্ধ হইয়া গেল। এই কারণেই গভীরতর আন্তরিক বেদনার সহিত আপনাকে কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হইতেছি। ...বিদ্যালয়ের হিসাবপত্র সম্প্রতি যে অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাতে এই অত্যন্ত অপ্রিয় পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইল। এজন্য আপনাকে যে আঘাত দিতেছি তাহা অপেক্ষা যে অল্প আঘাত নিজে পাইতেছি, এমন কথা মনেও করিবেন না।”[২৮]

বিদ্যালয়ের কর্ম থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেও তিনি তাঁর কর্মানুসন্ধান করে গেছেন অন্যত্র। এমন কি জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের চাকরির জন্য তিনি ত্রিপুরার রাজপুত্রকেও অনুরোধ করে পত্র লিখেছিলেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে চার বছর আগে পালিত হওয়া রাখি বন্ধন ও অরন্ধন উৎসবটির দিন শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে আবার পালিত হয়। পূর্বের চার বছর এই নির্দিষ্ট দিনটি পুজোর ছুটির মধ্যে পড়ে যাওয়ায় পালন করা হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ এইদিনটি পালন করার ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ দেখাননি। পরবর্তীকালে অজিত কুমারকে লেখা একটি পত্রে রাখি বন্ধন সম্পর্কে তাঁর পরিবর্তিত মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৯ অক্টোবর ১৯০৯ সালে অজিত কুমারকে লেখা একটি চিঠির অংশ থেকেই তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট হয়।

“ঐ দিন সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের দেশে যে ভাবের উত্তেজনা প্রচলিত হয়েছে আমি সেই ভাবটিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের উপযোগী মনে করি নে-বস্তুত সে ভাবটি ও-জায়গার পক্ষে অসঙ্গত।

ছুটি পর্য্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব মনে ছিল। যদি থাকতুম তাহলে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবকে আমি একটা বড় দিক থেকে সত্য দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করতুম। আমি কোনো সঙ্কীর্ণ বিরোধের ভাব এবং তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না। আমার রাখিবন্ধনের মধ্যে কোনো

> সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না। যে রাখিতে আত্মপর শত্রুমিত্র স্বজাতি বিজাতি সকলকেই বাঁধে সেই রাখিই শান্তিনিকেতনের রাখি। ...বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলতা আছে এ রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না।... আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটা অতি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলচে এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস–তার মধ্যে বাঙ্গালীও যেমন আছে ইংরেজও তেমনি আছে... যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে তাদেরও আমরা আত্মসাৎ করব আমাদের উপর এই আদেশ আছে। এখনকার দিনে একথা বল্লে কারো কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে না–অনেকে মনে করবেন এ একটা কাপুরুষতার লক্ষণ–কিন্তু তবু এই সত্য কথাটি বলা চাই। সত্যকে কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই সীমাবদ্ধ করা চলবে না। ভারতবর্ষে ইংরাজও সত্য–আজ তারা যদি আমাদের অসুখকর হয়েই থাকে তবু ভারতবর্ষের হিসাবে তারা সত্য–তাদের সুখকর কল্যাণকর করে তুলতে হবে–যতই বাধা পাই ততই চেষ্টাকে জাগ্রত রাখতে হবে । কারণ এই আমাদের স্বধর্ম। ...আমাদের আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পান–সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকালস্থায়ী মৃন্ময় দেবতার পূজার মত্ততাই সঞ্চারিত হয় তাহলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িক নেশায় ভোর হয়ে আছি–সেই জন্য ৩০শে আশ্বিনের মত দেশব্যাপী উন্মত্ততার দিনে নিত্য সত্যকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা আছে–এই জন্যই আমি বারবার করে তোমাদের সতর্ক করতে চাই । যা শ্রেষ্ঠ যা মহত্তম, যা সত্যতম তার থেকে লক্ষ্য কোনো কারণেই কোনোমতেই ফেরাতে দিয়ো না। ... সেদিন তোমরা ছেলেদের ডেকে ভারতবর্ষের সকলের বড় যে বাণী তাই শুনিয়ে দিয়ো । সেদিন সংযম পালন যখন হচ্চে তখন সেই সংযমের উপযোগী সাধনাও যেন অবলম্বন করা হয়–এই তোমাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ।”[২৯]

আগেই আলোচনা করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এই সময় জমিদারি সম্পত্তি নিয়েও কিছু সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। তাই তাঁকে বারবার কলকাতাতে আসতে হয়েছিল। তাঁর পিতা মহর্ষির উইল অনুসারে বিরাহিমপুর ও কালিগ্রামের সমস্ত জমিদারি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ বার্ষিক ৪৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ও কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথকে ৯৯৯ বছরের জন্য ইজারা দিতে চান। এই ইজারা সংক্রান্ত দলিলটি ১৯১২ সালের ২৪ মে স্বাক্ষরিত হলেও এই ইজারা চালু হয়েছিল ১৯০৯ এপ্রিল মাস থেকে। (

১৩১৬ এর, ১ বৈশাখ)। এই সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য জামাতা ব্যারিস্টার শরৎকুমার ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

এই সময়ে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে রাজশাহী জেলার ছোটোখাটো জমিদারি তালুক ও শিলাইদহের জমিদারি অংশ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সঙ্গে নেন। পিতা-পুত্রের দীর্ঘ নদীপথে ভ্রমণ রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকেই পাওয়া যায়।

> "ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা আমায় নিয়ে বেরোলেন জমিদারি অঞ্চলে — উদ্দেশ্য, প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হবে ও সেইসঙ্গে জমিদারির কাজকর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেব। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। হাউসবোটে কেবল বাবা আর আমি। বার বার মৃত্যুশোকের আঘাতে, বিশেষ করে অকালে শমী চলে যাওয়ায়, তাঁর মনে তখন গভীর বেদনা, তিনি নিতান্ত একাকী। দীর্ঘকাল প্রবাসের পর আমি ফিরে এসেছি, সুতরাং তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসা তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিলেন। অনেক দিনের চেনাজানা নদীর বুকে আমরা দুজন ভেসে চলেছি। প্রতি সন্ধ্যায় ডেকে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। এর আগে এমন মন খুলে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ কখনো পাই নি। স্বভাবত আমি মুখচোরা মানুষ, প্রথম প্রথম তাই একটু বাধো-বাধো ঠেকত। সদ্য কলেজ-পাস-করা ছোকরার মুখে কৃষিবিদ্যা, সৌজাত্যবিদ্যা অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ধারকরা কেতাবি মতামত শুনে বাবা নিশ্চয় খুব কৌতুক অনুভব করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি চুপ করে থাকতেন ও আমার মুখের বাঁধা বুলি ধৈর্যসহকারে শুনে যেতেন। মাঝে মাঝে যখন তিনি নিজে কিছু বলতেন, তার বিষয় হত দেশের প্রজাসাধারণের সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থা এবং তার প্রতিকারকল্পে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ক্বচিৎ হত–তিনি হয়তো ভাবতেন তাঁর বিজ্ঞানী ছেলের পক্ষে সাহিত্যের রসবোধ কঠিন হবে।"[৩০]

পুত্রের সাথে বোট ভ্রমণের পরই নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি যে আশ্রম বিদ্যালয় নিয়ে সব সময় সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর চিঠিগুলি। অজিত কুমারকে লেখা এরকমই একটি চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিটি লেখা হয়েছিল ৬ অগ্রহায়ণ এবং সেই চিঠিতে তিনি তপোবন প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। 'বিদ্যালয়ের ভিতরকার জিনিষটিকে' যাতে 'আরো পরিপূর্ণ, উজ্বল, সরস ও কলেবর

বিশিষ্ট' করা যায় সেই চেষ্টার কথাই তিনি বলেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবন সভ্যতাকে এবং সেই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মচর্যের সংযমকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধ বুদ্ধির ওপরের স্থান দিয়েছেন। যদিও তাঁর আশঙ্কা ছিল তাঁর এই বক্তব্য অনেকের কাছে উপহাসের বিষয় হতে পারে। তবুও তিনি সেই কালের শিক্ষাকে একালের উপযোগী শিক্ষা বলে মনে করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের ঊর্ধে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।"[৩১]

ন্যাশনাল বিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কে ইউরোপীয় আদর্শকে তিনি গ্রহণ করতে চাননি।

> "আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটাই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।"[৩২]

এই 'তপোবন' প্রবন্ধে বারবার উঠে এসেছে ন্যাশনাল কথাটি। তিনি "সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যিই উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।" এই সফলতার কথা তিনি বলেছেন। তিনি স্বরাজ স্বদেশ স্বাদেশিকতা এসবের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশ্বজাগতিকতার কথা বলতে চেয়েছেন। প্রবন্ধের শেষ অংশে পরিপূর্ণতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

“ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়।”[৩৩]

আসলে রবীন্দ্রনাথ কখনোই উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। সে ইউরোপের ক্ষেত্রে হোক কিংবা ভারতে স্বদেশি আন্দোলনের উগ্রতাই হোক। তিনি এই জাতীয়তাবাদ থেকে চিরকালই শঙ্কিত ছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ ও দেশের স্বাধীনতা। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই লক্ষ্যের বিরোধী ছিলেন না। তবে এই দুই লক্ষ্য পূরণে তাঁর মত ও পথ ছিল ভিন্ন। তিনি সমসাময়িক লক্ষ্যটির বাইরে গিয়ে বৃহত্তর লক্ষ্য পূরণ করতে চেয়েছেন। তবে তাঁর সমসাময়িক কেউ এই বৃহত্তর লক্ষ্যটি বুঝতে চায়নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভিন্ন জগতের দিকপাল ব্যক্তিত্বদের একটি সুসম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে সেইসব ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আশ্রম বিদ্যালয়েরও একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে যায়। সেরকমই একজন হলেন ডক্টর যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। সেই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, ছোটোগল্পগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বাংলার বাইরে ও রবীন্দ্রনাথকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ইতিহাসে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য শরৎকুমার রায় তাঁর ‘শিবাজী ও মারাঠিজাতি’ বইটি তাঁকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চান। ডক্টর সরকার সেই বইয়ের ভূয়ষি প্রশংসা করেন এবং সেই সূত্র ধরেই শরৎকুমার তাঁকে শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইতিহাস বিষয়ক কিছু বলার জন্য আহ্বান করেন। বলা বাহুল্য যদুনাথ সরকার তাতে সম্মতি জানান। যদুনাথ সরকারের লেখা থেকেই পাওয়া যায়-

> “আমি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও মুসলিম সৌধ ও দৃশ্যের প্রায় এক শত ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন স্লাইড নিজের খরচে প্রস্তুত করাইয়া শান্তিনিকেতনে উপহার দিই, এবং এই পত্রের পূর্ব্বকার বোলপুর-প্রবাসের সময় তাহার কতকগুলি দেখাইয়া ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করি। কবি উপস্থিত ছিলেন।”[৩৪]

আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ভালো ফলাফল করতে শুরু করে। ১৯১০ সালে এরকম দু'জন ছাত্র হলেন গৌরগোপাল ঘোষ ও নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। এই দু'জন ছাত্র আশ্রম বিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন কারণ এই দু'জন ছাত্র আশ্রম থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরবর্তীকালে এই দুজনেই পড়াশুনা শেষ করে আশ্রমে ফিরে আসেন এবং বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে দীর্ঘকাল কাজ করেন এবং ১৯৪০ সালে গৌরগোপালের শান্তিনিকেতনেই জীবন অবসান হয়।

রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে কতখানি আত্মিকভাবে যুক্ত ছিলেন তা বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যাগুলেকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা থেকেই বোঝা যায়। কখনো পানীয় জলের অভাবের জন্য পাতকোয়া খোঁড়া নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, আবার কখনো বা ছাত্রদের খাবারে দুধের অভাব তাঁকে চিন্তিত করেছিল। এই দুধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি পরিকল্পনা উঠে আসে। সকলেই জানে যে, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর সমস্ত সংসারের দায়িত্ব সন্তোষচন্দ্রের উপরেই এসে পড়ে। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে একটি গোশালা খুলতে মনস্থ করলে রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন। কারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুধ সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সমস্যা সম্মুখীন হতে হতো। ১৯০৯ সালের ১৪ মার্চ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় –

> "সন্তোষ পাঁচটি গরু নিয়ে বোলপুর বিদ্যালয়েই একটি ছোটোখাটো dairy খুলছে।
>
> বোলপুরে গরুর রাখার বিস্তর অসুবিধা- ঘাস নেই, গোরুর অন্যান্য খাবারও বহুদূর থেকে বেশি দাম দিয়ে আনিয়ে নিতে হয়। তবু দেখা যাচ্ছে লোকসান হবার আশঙ্কা নেই। আরো যদি গোটা দশেক গরু আনা যায় তাহলে ঐ জায়গাতেই ১৫০। ২০০ টাকা মাসে খরচ বাদে পাওয়া যেতে পারে। ... এটা বেশ দেখা যাচ্ছে চাষের চেয়ে আমাদের দেশে গোরুর ব্যবসা অনেক বেশি লাভজনক। দেশে গোরুর উন্নতি

করা বিশেষ প্রয়োজন। ... বাংলা দেশের সকল পাড়াগাঁয়েই দুধ ঘি দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে শুধু কতকগুলো মসলাগোলা জল দিয়ে ভাত খেয়ে বাঙালী কখনো মানুষ হতে পারবে?”[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ, সমকালীন রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তাঁর তৎকালীন বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন উঠে এসেছে তেমনি বিভিন্ন চিঠিপত্রেও তাঁর সেই মনোভাব দেখা গেছে। ১৯১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা এমনই একটি চিঠি পাওয়া যায়। এই চিঠিতে তিনি জামাতাকে রথীন্দ্রনাথের মতো কাজের ক্ষেত্রটি নির্বাচন করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

“দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের উন্নতি বিধান করাই এখন যথার্থ আমাদের কাজ। ... রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তাহলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষাদের সঙ্গে co-operation -এ চাষ করা, ব্যাংক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা, ঋণ মোচন করা, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তা সূত্রে আবদ্ধ করা এমন কত কাজ তার সীমা নেই। এক জায়গায় যদি আমরা এইরকম আদর্শপল্লীস্থাপনে কৃতকার্য হতে পারি তবে সমস্ত দেশের পক্ষে তার চেয়ে লাভের আর কিছুই হতে পারে না। এই সমস্ত মঙ্গলকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করতে কাউকেই দেখতে পাইনে- কেবলি উত্তেজনা উন্মাদনা উৎপাত। যেখানে যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ কাজ, সেখানে কারো উৎসাহ দেখিনে। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে হীন শ্রেণীর উন্নতির জন্য পড়ে থাকায় কেউ সুখ পায় না- তার কারণ, দেশকে সত্যভাবে কেউ ভালোবাসে না- কেউ সেবা করতে চায় না প্রভুত্ব করতেই চায়।

মঙ্গলের ভিতর দিয়ে দেশকে সৃষ্টি করে তোলার কাজে যদি তোমরা লাগ তাহলে বড় খুসি হব- এই হচ্চে ধর্ম্মের কাজ- এই হচ্ছে পুণ্যকর্ম্ম- এই হচ্চে ঈশ্বরের সেবা। মনকে সমস্ত অনাবশ্যক বিরোধ বিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে বিদেশী ইতিহাসের সমস্ত তামসিক অন্ধ সংস্কার থেকে চিত্তকে নির্ম্মল করে তুলে স্নিগ্ধভাবে শান্তভাবে সাত্ত্বিকভাবে একেবারে মূলের থেকে দেশের কাজে আমরা প্রবৃত্ত হব - অসাধ্য সাধন আমাদের ব্রত -আমরা পূর্ব্ব পশ্চিমকে শত্রু মিত্রকে মহৎ প্রেমে পরম মঙ্গলে এক করব এই আমাদের লক্ষ্য থাক্।”[৩৬]

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের বরাবরই প্রিয়। তাই বিভিন্ন সময়ে তিনি নিজেরে পরিকল্পনা বাতিল করেও ছুটে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। এরকমই একটি সিদ্ধান্ত হল ১৯১০ এর ১ মে। যেখানে তিনি পুরী যাত্রার উদ্দেশ্যে কলকাতা গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই যাত্রা বাতিল করে ১৮ বৈশাখ তিনি ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে এবং তিনি তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনটি পালন করেন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের সঙ্গে।

সেই সময় ঠাকুর পরিবার এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিন্তু ইংরেজ পুলিশের সন্দেহের চোখের বাইরে ছিলেন না। তাই কখনো ঠাকুরবাড়িতে আবার কখনো শান্তিনিকেতনে পুলিশের গুপ্তচরদের আনাগোনা লেগেই ছিল। সেরকমই এক মজার ঘটনা হল-

> "সে সময় প্রায়ই আশ্রমে পুলিসের গুপ্তচর আসতো। উৎসবের আভাস পেয়ে এসেছেন এক বৈরাগী — সদ্য-রঙ-করা গেরুয়া পরা। প্রশান্ত ও আমরা কয়জন সেই বৈরাগীকে নিয়ে বৈশাখের ঠিক দুপুরে খালিপায়ে আশ্রম ও চারপাশের মাঠ পরিক্রমা করলাম। বেচারাকে থামতে দেওয়া হচ্ছে না– আমরা রিলে করছি। ব্যাপার আরও কি গড়াতে পারে আন্দাজ করে বৈরাগী সরে পড়লেন।"[৩৭]

১৯০৯ সালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল- অজিত কুমার চক্রবর্তী সঙ্গে লাবণ্যলেখার বিবাহ। তাঁরা দুজনেই ছিলেন আশ্রমিক। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার। কিন্তু সেই সময় আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে আপত্তি তুলেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছিলেন অসবর্ণবিবাহের সন্তান হলেন অজিত। তাঁর পিতা ব্রাহ্মণ আর মাতা বিধবা, বৈদ্য কন্যা এবং বিয়ে হয়েছিল ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে। এই বিয়েতে রীতিমতো তাঁরা হিন্দু নয় বলে ঘোষণা করতে হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুযায়ী তাঁদের বিয়ে দিতে হয়েছিল। আসলে দ্বিপেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, এরকম একটি ব্যতিক্রমী বিয়ের মধ্যে আশ্রমকে কোনো ভাবে না জড়াতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে নিজে অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করেছেন তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় অজিত কুমারকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে।

"...অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। কারণ আমি অসবর্ণ বিবাহকে সমাজের মঙ্গল বলে জ্ঞান করি, সুতরাং সেখানে আমার কিছুই সঙ্কোচ করবার বা চিন্তা করবার নেই। অতএব যদি তোমাদের সমাজের সম্মতিক্রমে রেজেষ্ট্রি ব্যাপার বাদ দিতে পার তাহলে সম্প্রদানে আমি আপত্তি করবইনা। কিন্তু সমাজের অসম্মতিতে এই বিপ্লব ঘটানো তোমাদের অবস্থায় উচিত হবে বলে আমি মনে করিনে। ... তোমাদের বিবাহে আমি অন্তরে এবং বাহিরে যোগ দেব কেবলমাত্র অনুষ্ঠানভাগে যোগ না দেওয়াতে তোমরা কেন মনকে পীড়িত করবে?"[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত আনুষ্ঠানিক বিয়ের দিন উপস্থিত থেকে কন্যা সম্প্রদান করেন। কিন্তু বিবাহ আইনসিদ্ধ করার যে রেজিস্ট্রেশন সেই অনুষ্ঠানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। বিবাহ নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আরেক ছাত্র অরুণ চন্দ্র সেনকে নিয়েও রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ বলেই হয়তো সমস্ত বিষয়টিকে সুন্দরভাবে মিটিয়ে নিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অরুণ চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ নিয়ে তাঁর পিতা দীনেশচন্দ্র সেনের নানান রকম মতান্তর হচ্ছিল। আসলে অরুণচন্দ্র চাইছিলেন না লেখাপড়া চলাকালী কোনো রকমভাবে সাবলম্বী না হয়ে বিবাহ করতে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র বারবার বিবাহের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এর ফলে অরুণ চন্দ্র বাড়ি ছেড়ে গিরিডিতে তার বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এরপরেই অরুণ চন্দ্রের দাদা এবং ভগ্নিপতি শান্তিনিকেতনে আসেন। বলা বাহুল্য অরুণ চন্দ্রের এই মানসিকতার জন্য দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেই দায়ী করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে লেখেন (৮ আষাঢ়, ১৩১৭)

"অরুণ পালাইয়াছে কাল জানিলাম। অরুণ যে পাটনায় যায় নাই তাহা অজিত বলিলেন কিন্তু সে কোথায় গেছে তাহা বলিতে পারিলেন না। ... তাহারা [কিরণচন্দ্র ও তাঁর ভগ্নীপতি] চলিয়া যাইবার কিছু পরেই অরুণের টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাকে এখানে ধরিয়া আনিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছি। ...আপনি বোধহয় জানেন না অরুণ আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহার স্বভাব অত্যন্ত বেদনাশীল। এই ঘটনার পরে যদি তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক না হন তবে কোনদিন তাহাকে হারাইবেন। বোলপুরে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াই আমি তাহাকে আপনাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিব।

আমি অরুণের পলায়নে কোনোমতেই প্রশ্রয় দিই নাই একথা বিশ্বাস করিবেন। আমি তাহাকে নিরস্ত করিব জানিয়াই অরুণ আমার কাছে গোপন করিয়া গিয়াছে। ... আপনারা তাহাকে লইয়া টানাটানি করিতে গেলে পাছে তাহার হিতে বিপরীত হয় এই জন্য আমিই তাহাকে ফিরাইবার ব্যবস্থাভার নিজের উপর লইতেছি। যদি না পারি তখন আপনাদিগকে জানাইব।”[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কথা রাখেন। অরুণ চন্দ্র ১০ আষাঢ় আশ্রমে ফিরে আসেন এবং ফেরার পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পিতা দীনেশচন্দ্র সেন পুত্রকে ক্ষমা করলেও রবীন্দ্রনাথকে করতে পারেননি। পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু পত্র আদান-প্রদান হয়। তার মধ্যে একটি যাতে তারিখের কোনো উল্লেখ নেই সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

“... আপনার চিঠি পড়িয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমি কোনোদিনই অরুণকে চিরকৌমার্য্যে দীক্ষিত করি নাই। করা আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ মানুষের পরিপূর্ণতার পক্ষে বিবাহ আবশ্যক ইহাই আমার মত- আমার ছেলের আমি বিবাহ দিয়াছি–সন্তোষের বিবাহের জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। একদিনের জন্যও অরুণের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার কথা হয় নাই।

পলায়ন ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিতাম না। সন্তোষ ও অজিত জানিত এবং সম্ভবত তাহাকে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু তাহারা বিদ্যালয় নহে এবং অরুণ তাহাদের নিকট পলায়নের কি কারণ বিবৃত করিয়াছে শুনিয়া তাহারা এই পলায়নের অনুমোদন করিয়াছে তাহা আপনিও জানেন না আমিও জানিনা। তাহারা সম্ভবত বিশেষ কারণে অরুণের পলায়নকে তাহাদের নিজের বুদ্ধি অনুসারে ভাল মনে করিয়া থাকিবে কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানি না।...

যাহা ব্যক্তিগত তাহাকে আপনি বিদ্যালয়ের সামগ্রী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অরুণের অসহিষ্ণুতা সম্পূর্ণই অরুণের নিজের- এখানকার শিক্ষায় কখনই এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহাতে ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে উদ্ধত করিয়া তুলে। ... ইহা আপনি জানিবেন আমি মানসিক উদ্বোধনের সহায়তা করিয়া থাকি কিন্তু কোনো বিশেষ মত শিক্ষা দিই না...

অরুণ অন্য লোকের কাছে কখনো কখনো বলিয়াছে যে সে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করে–আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন এ সম্বন্ধে আমি ইঙ্গিতেও তাহাকে উৎসাহ দিই নাই।...

আমি যে সকল ছাত্রকে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াছি আমি তাহাদের মঙ্গল চাহিয়াছি কিন্তু তাহাদিগকে চাই নাই। আমি দল বাড়াইতে যদি লোভ করিতাম তবে সহজেই পারিতাম কিন্তু আমি ছেলেধরা নই আমি কোনো ছাত্রকে কাছে টানিয়া ভুলাই না–অল্প ছেলেই বিদ্যালয়ের বাহিরে আমার সঙ্গ পায়। অবশ্য যাহারা ইচ্ছা করিয়া আমার কাছে আসে তাহাদিগকে আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করি– কিন্তু আমি কদাচ কাহাকেও টানাটানি করিনা। ... অবশ্য ইহা সত্য যে, যদি আমার কোনো ছাত্র কোনোদিন আমার এই বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক হয় আমি তাহাতে আনন্দিত হইব– কারণ এই কাজকে আমি যদি শুভকর্ম্ম না মনে করিতাম তবে কখনই আমার অত্যন্ত নিঃসম্বল অবস্থায় আমার পরিবারবর্গের বিশেষ ক্ষতি ও অসন্তোষ ঘটাইয়া এত বড় দায় এত কষ্টে বহন করিতাম না।”[৪০]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্রমের ছাত্রদের সম্পর্ক কত গভীর ছিল এবং বিদ্যালয় যে তাঁর হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিল তাও এই চিঠি থেকে অনুমান করা যায়।

পরবর্তীকালে অমৃতলাল সেনের কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে অরুণ চন্দ্রের বিবাহ হয় এবং অরুণ চন্দ্রই রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানান যে, এই বিবাহের জন্য তার পিতা তাকে বাধ্য করেননি। এরপর থেকে ক্রমশ দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সম্পর্কের জটিলতা লঘু হয়ে আসে। আষাঢ় মাসেই রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্ম অবকাশের পর বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হলে এক দুঃস্থ ছাত্র যার পক্ষে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাকেও গ্রহণ করার সম্মতি জানান। গৌর গোপাল ঘোষকে ৫ আষাঢ় মাসিক ১২ টাকাতেই একটি দুঃস্থ ছাত্রটিকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সম্মতি জানান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্র-মৃত্যুর মতো আকস্মিক হৃদয় বিদারক ঘটনারও সাক্ষী থেকেছেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১০ আষাঢ় রাত্রিবেলা শরৎচন্দ্র মজুমদার হৃদরোগে ইহলক ত্যাগ করেন। ১৫ আষাঢ় মন্দিরের ভাষণে সরোজ চন্দ্রের মৃত্যুকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন এবং তাঁর সহপাঠীরা তাঁর দাহ স্থানে একটি বেদী নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐদিনের ভাষণে বলেন -

“... জীবন হইতে জীবনান্তরে কাল হইতে কালান্তর পর্য্যন্ত আত্মাকে বহন করিতেছে এই মৃত্যু, সুতরাং মৃত্যুও যে গতিশীল। আর যে আত্মাকে তোমরা প্রতিদিনের ছোটো ছোটো কাজে, ব্যবহারে, খাটো করিয়া দেখিতেছিলে, মৃত্যুতে তাহার আত্মার যথার্থ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে।... তোমরা একসঙ্গে সখাভাবে মিলিত হইয়াছিলে বলিয়া তাহার আত্মাকে তোমরা দেখিতে পাও নাই, বাহিরের নানা আবরণ তাঁহার

যথার্থ হৃদয়কে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল-কিন্তু মৃত্যুতে সমস্ত আবরণ কাটিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার যথার্থ স্বরূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে, মৃত্যুতে তাঁহার আত্মাকে কত বিরাট বিপুলভাবে দেখিতেছ- তাই মৃত্যু আলোকময়।...

আমি বলছি তোমরা তাঁকে ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখছ; সেইজন্যই তোমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছ। তার ভিতরে যে অমরতা রয়েছে সেই অমরতাকেই 'অমর' করিয়া রাখিবার জন্য এই সব আয়োজনের সংকল্প। সেইজন্যই তোমরা তাঁর সমাধিস্থানটির উপর বেদি নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, আবার যাতে তার শ্রাদ্ধের দিনে গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা যায় তার সংকল্প করেছ- এই সবই ত তাঁর স্মৃতি অমর করে রাখবার জন্য।

মৃত্যু আজ আমাকে এই কথাটা ভাবতে শিক্ষা দিয়েছে, সারাদিন বসে বসে আমি এই চিন্তাই করেছি- আর যতই চিন্তা করেছি ততই তাঁহাকে আত্মারূপে অন্তরের মধ্যে দেখেছি, সে আর কোথাও নাই- কোন ছোটো জিনিষের মধ্যেই নয়, সে আজ অন্তরের মধ্যে অমরতার ভিতরে, আজ আর সে শিষ্য নহে, আজ সে আমার গুরু।"[৪১]

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল দেশের পুরুষদের শিক্ষা নিয়েই চিন্তিত ছিলেন তা নয়। তিনি নারী শিক্ষা নিয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তা স্পষ্ট বোঝা যায় পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। মহর্ষির পরিবারে এমনিতেই মেয়েদের শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রাধান্য পাচ্ছিল। যদিও সেকালে মেয়েদের প্রধানত শৈশব থেকেই বিয়ের জন্য প্রস্তুত করা হতো এবং খুব কম বয়সেই তাদের বিয়ে হতো। তাই বেশিরভাগ মেয়েরাই প্রাথমিক শ্রেণির গণ্ডি পার হয়ে বধূ রূপে শ্বশুরবাড়িতে আসতো। প্রতিমা দেবীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু প্রতিমা দেবীর শ্বশুর ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম থেকেই পুত্রবধূর শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং একাধিক পত্রে পুত্রবধূর শিক্ষাদানের জন্য একাধিক আয়োজন করতেও তাঁকে দেখা গেছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলার বিধান নিয়েও তাঁর ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায় একটি পত্রে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১২ অগ্রহায়ণ অজিত কুমারকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হবে।

"আমাদের বিদ্যালয়ে যদি শৃঙ্খলাবিধান ব্যবস্থার কঠোরতারদিকে দৃষ্টি রাখি তবেই এ দেশে আধ্যাত্মিকতা অতি সহজেই যে উদ্দাম বিকৃতির মধ্যে গিয়ে পড়ে তার থেকে রক্ষা হবার উপায় হবে।"[৪২]

তাই এই সময়ে তিনি আশ্রম বিদ্যালয়ে নানাবিধ নিয়মাবলী প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ একবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কলেজ শাখাটি কলকাতায় খোলার কথা ভেবেছিলেন। ১৯১০ সালে তাঁর সেই ভাবনাটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ নেন এবং এই বিষয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বেশ কিছু পত্রালাপও হয়। এমনকি তিনি ১৩১৭ -র ১৬ চৈত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখাও করেন। বলা বাহুল্য তাঁর কাছ থেকে তিনি সেভাবে ভরসা পাননি। সে কথা তিনি ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরী এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। যদিও যদুনাথ সরকারকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে, কলেজ খোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন স্বয়ং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ যেমন আশ্রম বিদ্যালয়ের বাইরেও তাঁর শিক্ষা দর্শন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন তেমনি আশ্রম বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁর একের পর এক ভাবনাকে রূপায়িত করে গেছেন। ১৩১৭-র পহেলা বৈশাখ প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রদের 'সাহিত্য সভা'। এই সভায় যেমন বিভিন্ন ছাত্রের হাতের লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। আবার এই সময় 'প্রবন্ধ পাঠ সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা ও পাঠ হতো।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের কতখানি জুড়ে ছিল তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায় জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী অবলা বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে। অবলা বসু রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো চান না অবলা বসু শান্তিনিকেতনে যান। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো এই বিদ্যালয়ের প্রতি অবলা বসুর ভাগিনেও অরবিন্দ মোহন এর অতিরিক্ত আগ্রহ ও আকর্ষণ অবলা বসু পছন্দ করেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে দেওয়া পত্রখানি উল্লেখ করার মতো। অন্য অনেক কথার সঙ্গে পত্রের শেষে তিনি লেখেন-

"এবারে আপনাকে বোলপুরে আসবার কথা বলি নি-তার কারণ, কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করছিলুম, এই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনার হৃদয় অনুকূল নেই। অথচ এই বিদ্যালয়টি আমার জীবনের সাধনার ক্ষেত্র-আমার দেবতা এইখানে, আমার মুক্তি এইখানে-এ সামান্য ইস্কুলমাত্র নয়-এখানে আপনি মনে লেশমাত্র বিমুখতা নিয়ে আসবেন, এখানে এসে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করে যাবেন, এ আমার পক্ষে অসহ্য। অনেক লোক তেমন ভাবে এখানে আসে যায়-আমি পৃথিবীর সকল লোকের কাছেই সহানুভূতির কাঙালবৃত্তি করতে তো চাই নে-কিন্তু আপনাদের তেমন উদাসীনভাবে দেখতে পারি নে। যে জায়গায় আমি সকলের চেয়ে সার্থকতা লাভ করেছি সে জায়গায় আপনাদের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে সেখানে খেলাচ্ছলেও আমাদের মিলন হতে পারে না-আর সব জায়গাই রইল-কলকাতা আছে, আমাদের পদ্মার চর আছে, আর যেখানেই বলেন সেখানেই কোনো বাধা নেই।"[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রিয় আশ্রম বিদ্যালয়টিকে তাঁর উপনিষদের চিন্তা-ভাবনাগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্র করতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হৃদয়ের ভক্তির সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে সকলকে মুগ্ধ করুক এবং ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বর নির্ভর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হোক।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে ২৬ বৈশাখ। এই প্রথম আশ্রম বিদ্যালয়ের ছুটি এতো পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথের ৫০ তম জন্ম উৎসব পালন করা। যদিও তখনও যে কারণে গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়া হতো অর্থাৎ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ, ইঁদারার জল শুকিয়ে জলের সমস্যা ইত্যাদি কোনোটারই সমাধান হয়নি। তথাপি আশ্রমের ছাত্রগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তাদের প্রিয় মানুষটির জন্ম উৎসব পালন নিয়ে। অন্যান্য বারের মতো কবির জন্ম উৎসবের আয়োজন কলকাতাতেও চলছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য কবির পক্ষে আশ্রমের ছাত্র শিক্ষকদের আয়োজনকে প্রত্যাখ্যান করে কলকাতা যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই সময় যদুনাথ সরকারকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকেই সে কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ ৭ বৈশাখ (২০ এপ্রিল) যদুনাথ সরকারকে লিখেছেন,

"আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব এখানকার ছেলেরা করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ যে উৎসব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সম্ভবত তাঁহাদের বার্ষিক

অধিবেশনের দিনে-সে কবে আমি জানি না। সে সভায় আমি উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি না-যদি কোন মতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কোথাও পালাইতে পারি সে চেষ্টা করিব।

আমার জন্মোৎসবের ভার যদি সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত চাঁদার টাকা লইয়া তাঁহারা সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন একটা কাজের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। ও দিকে দৃষ্টি দিয়া কোনো ফল হইবে মনে করি না। এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরের উদ্যোগ আয়োজনে আমি যে কিরূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি তাহা অন্তর্যামীই জানেন।”[৪৪]

তাঁর জন্ম উৎসবের জন্য যে চাঁদা তোলা হয়েছিল, সেই টাকা শান্তিনিকেতনে কলেজ প্রতিষ্ঠায় লাগতে পারে বলে ক্ষীণ আশা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। কারণ টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের অনেক পুরোনো এবং সেই সময় তাঁকে অনেকে আশা দিয়েছিলেন যে, সেই উপলক্ষ্যে চাঁদা তুলে দেওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার না। তবে তা যে রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ ভরসাযোগ্য ছিল না সেকথাও প্রকাশ পেয়েছে যদুনাথ সরকারকে লিখিত পূর্বে উল্লিখিত ঐ পত্রটির ‘ও দিকে দৃষ্টি দিয়া কোন ফল হইবে মনে করি না’ এই কথাটির মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে কোনো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হোক সেটা কখনো চাইতেন না। কারণ তিনি নিজেই এই সমস্ত অনুষ্ঠানে সংকোচ বোধ করতেন। যদুনাথ সরকারকে লিখিত চিঠিতে তা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন নিয়ে তাঁর মত ভিন্ন ছিল। তাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষকরা ও ছাত্ররা মিলে যে জন্ম উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদমই সংকুচিত ছিলেন না। ২১ বৈশাখ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে (১৮৬৪-১৯১৯) লেখা একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন-

“এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধবয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন- আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন সে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব- তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব।”[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের এই জন্মোৎসবে কলকাতা থেকে অনেকেই শান্তিনিকেতনে সমবেত হন। তার মধ্যে তরুণ কয়েকজন রবীন্দ্রভক্ত যেমন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) প্রমুখরা জন্ম উৎসবের অনেক আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে সমবেত হন। এই সময় শান্তিনিকেতনে আসেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা শান্তা এবং সীতা দেবী। এবং অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারের অধীনে থাকা আশ্রম বালকদের উপর। পরবর্তীকালে সীতা দেবীর কথায় আশ্রম বালকদের প্রশংসা পাওয়া যায়। এবং যেই জন্ম উৎসবের জন্য এত ঘটা, সেই দিনটি অর্থাৎ ২৫ বৈশাখ ভোরে আম্র কুঞ্জে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। কাশির ব্যাসবেদির মতো একটি বেদি নির্মাণ করা হয় এবং তাকে ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও আলপনা দিয়ে সাজানো হয়। সকলে স্নান করে উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও নেপাল চন্দ্র আচার্যের ভার গ্রহণ করেন।

আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিভাকেও তিনি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে সঠিক ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৭ বৈশাখ রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা একটি চিঠি থেকে অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৬৭-১৯৫৯) বাংলা অভিধান রচনার প্রসঙ্গটি উঠে আসে। প্রসঙ্গেক্রমে উল্লেখ্য, ১৩০৯ বঙ্গাব্দে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচনা করেন। এটির তিনটি খণ্ড। এই রচনার শেষে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে অভিধান সংকলনের কাজ শুরু করেন ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের শুরুতেই এই শব্দানুক্রমণিকার কাজ সমাপ্ত হয়। এরপরে বাংলা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দ সংযোজন করে লেখক শব্দের ব্যুৎপত্তি ও শিষ্ট প্রয়োগ সহ অর্থ লিখতে আরম্ভ করেন। এবং এটিই প্রধানত অভিধান কাজের সূচনা। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অর্থের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের সহায়তা চান। কিন্তু বলা বাহুল্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নিজে অর্থাভাবে ভুক্ত হওয়ায় এই কাজে সাহায্য করতে পারেনি। তবে রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেননি। তিনি কাশিম বাজারের মহারাজা মনিচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করে হরিচরণ অধ্যায়ের জন্য মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় স্বয়ং লিখেছেন-

“এইরূপে আমার অর্থসমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইলে, কবিবর দেখা করিবার নিমিত্ত আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার মুখে বৃত্তির কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমারই নিমিত্ত কবিবরের যাচকবৃত্তি, ইহা চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম... আমার হৃদয়গত ভাব বুঝিয়া কবিবর ধীর কণ্ঠে কহিলেন, ‘স্থির হও, আমি কর্তব্যই করিয়াছি।’...এই সময়ে একদিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে কবিবর বলিয়াছিলেন, ‘মহারাজের বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার জীবননাশের সম্ভাবনা নাই।’ কবি-গুরুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে ক্রমাগত ত্রয়োদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া, ১৩৩০ সালের ১১ই মাঘ এই বৃহৎ অভিধান সমাপ্ত করিয়াছি।”[৪৬]

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২ জ্যৈষ্ঠ চারুচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ দু-একদিনের মধ্যে একটি নাটক লিখতে চলেছেন। আবার ১৪ আষাঢ় চারুচন্দ্রকে লেখা আরেকটি চিঠি থেকে জানা যায়, নাটকটি লেখা শেষ করেছেন। এই নাটকটি হল ‘অচলায়তন’(১৯১২)। ‘অচলায়তনে’র বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- নিয়মের কড়া বন্ধন কীভাবে কোনো কিছুকে অচল করে রাখে, তারই যথার্থ নাট্যরূপ এই নাটক। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে পূর্বে ঘটে যাওয়া কিছু প্রসঙ্গ এই ব্যাপারে উঠে আসে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩০ কার্তিক অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, আশ্রম বিদ্যালয়ের আগামী সেশনের জন্য তিনি বেশ কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করার কথা ভাবছেন। কারণ তিনি মনে করছিলেন বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের কঠোরতার মধ্য দিয়ে দেশের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলোর মধ্যে ছিল বিদ্যালয় পরিচালনার নানান রকমের নিয়ম নিষেধ, অফিস পত্তন নানান রকম রিপোর্ট প্রতিবেদন পেশ, প্রাত্যহিকৃত সূচক ঘণ্টাধ্বনির সংকেতাবলি প্রণয়ন, আদ্য মধ্য শিশু বিভাগের অধ্যক্ষ ও সর্বাধক্ষ্য নির্বাচনের প্রথা, ছাত্র-ছাত্রীদের পালনীয় কর্তব্যসূচি, ছাত্র শাসনতন্ত্র ইত্যাদি। আসলে সেই সময় শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। শিক্ষকরা সপরিবারে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই নিয়ম পালনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সুশৃঙ্খলা চেয়েছিলেন। তাই তিনি উৎসাহের সঙ্গে এইসব প্রথা শুরু করেন। কিন্তু নিয়মের আধিপত্যে হয়তো তিনি নিজেই হাঁপিয়ে উঠছিলেন। যদিও ঠিক সেই সময়কার তাঁর কোনো রচনা বা চিঠিপত্রে এই বিষয়ের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবুও

বেশ কিছুকাল পরে তাঁর 'অচলায়তন' প্রমাণ করে নিয়মের গণ্ডিতে তিনি নিজেই বদ্ধ থাকতে চান না এবং অচলায়তনের আচার বিচারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে আচার্য সেই আচার্য হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

'তত্ত্ববোধিনী'-র চৈত্র সংখ্যায় অজিত কুমার চক্রবর্তী 'আশ্রম কথা'য় উল্লেখ করেছেন-

> "তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে তিনি নানা উপলক্ষ্যে আমাদিগকে কেবলি বলিয়াছেন যে, তিনি সেই সমস্ত বিশ্বের একটি হাওয়া আমাদের এই আশ্রমের মধ্যে বহাইতে চান। আমরা এই একটুখানি জায়গার মধ্যে আছি, এবং পঠনপাঠন করিতেছি, এ সংস্কারটাকে দূর করিয়া ইহাই আমাদের দ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করাইতে চান যে আমরা বিশ্বে আছি-যেখানে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে একটা চিন্তাশক্তি অহরহ অদ্ভুত সৃজনকাজে নিযুক্ত হইয়া আছে। সেই বিচিত্র জ্ঞানকর্ম্মপ্রেমের সৃজনের বিরাট ক্ষেত্রে আমরা আছি, সেইখানে কাজ করিতেছি, সেইখানে ভাবিতেছি, সেইখানে জ্ঞানলাভ করিতেছি-এই চেতনাটা যাহাতে বড়ো হয়-কেবল কতকগুলি বাহিরের শুষ্ক বিধিবিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস যাহাতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া না বসে, তদ্বিষয়ে তিনি যাইবার পূর্ব্বে বারম্বার আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।"[৪৭]

বলা বাহুল্য, এই ভাবনা এবং 'অচলায়তন' নাটকের মূল ভাবনা এক।

এই বছর (১৯১১) প্রায় শ্রাবণ মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং তিনি বারবার যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন সেটি হল বিদ্যালয়ের জন্য ধার-দেনা। ৬ শ্রাবণ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় তিনি বিদ্যালয়ের জন্য যে তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার নিয়েছিলেন, তা পরিশোধের ব্যাপারে বিশেষ দুর্ভাবনাগ্রস্ত।

এরপর রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকেন। বিলেত যাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি নতুন বইগুলির কপিরাইট বিক্রি করার জন্য অতুল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। তবে তিনি ইন্ডিয়ান প্রেসের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করতে পারেননি। তাই 'ডাকঘর' (১৯১২) নাটকটি প্রকাশের ভার তিনি সেখানেই দেন।

এই সময়ের জাতীয় রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যায় শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিল নিয়ে ভারতীয় শিক্ষা মহলে তখন বেশ আলোড়ন চলছিল। এই বিলগুলি হল- গোখলের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাবিল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাবিত কাশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকেও এই বিষয়গুলি ভাবিয়েছিল। এই সময়ে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে দুটি বড়ো সভা করা হয়। একটি প্রাথমিক শিক্ষা বিল সংক্রান্ত অন্যটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব সমর্থন সংক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সভাটিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং তাঁর যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু অর্শের রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যাওয়ার জন্য তিনি রেলে করে আর কলকাতায় যেতে পারেননি। তবে এই বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে জনমত তা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধ ও মীরা দেবীকে লেখা চিঠি থেকেই মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন-

> “কাল, গৌরহরি [সেন] বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। Primary Education-এর কথায় তিনি বলিলেন- ‘দেখুন, আপনি ইহাকে সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু পাঁ [চকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়] বাবু ভয় পাইতেছেন। তিনি বলেন যে, আমরা কয়েক সহস্র লোক যে risk লইয়াছি, দেশের আপামর সাধারণকে সেই risk-এর ভিতর ফেলিলে কি দেশের অনিষ্ট করা হইবে না?’ আমি বলিলাম- ‘বাস্তবিকই কি আমরা ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে ভয় করিতেছি? যদি বাস্তবিকই risk-এর ভয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের ছেলেপুলেকে ইস্কুলে দিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম? আমরা নিশ্চয়ই মনে মনে জানি, যে ইংরাজী শিক্ষায় risk অপেক্ষা advantage বেশী, তাহা নহিলে কখনও ইংরাজী শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতাম না। এত কোটি লোকের মধ্যে আমরা কয় সহস্র লোক ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেছি? যদি সকলে কোনও রকম একটু শিক্ষালাভ করে, তাহা হইলেই সমস্ত সমাজ-শরীরে একটা বিপুল স্পন্দন অনুভব করা যাইবে। সকলে যদি একটুও নড়ে, তাহা হইলে সমস্তটার momentum কত বেশী ভাবিয়া দেখুন দেখি।”[৪৮]

'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটি আলোচনা করলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর সমর্থনের কারণগুলি বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড ইত্যাদি দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সব সময় মিলন এক হলেই যে মহান হওয়া যায়, এ কথা সঠিক নয় বরং পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের পার্থক্যকে সম্মান রক্ষা করেও মিলন রক্ষা করা যায়। এই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য বারবার হিন্দু এবং মুসলমানকে এক করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানরা সাড়া দেয়নি বলে হিন্দুরা হয়তো রাগ করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, এই দুই জাতির মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য আসেনি বলেই মুসলমানরা ঐ রকম আচরণ করেছিল। হিন্দুর উগ্র হিন্দুত্ববাদীর প্রতিবাদ স্বরূপই মুসলমানদের অতিরিক্ত মুসলমানিত্ব জেগে উঠেছিল এবং এই হিন্দু বা মুসলমান কেউই চায় না এক সাথে মিশতে। তবে মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে অনেকটা বেশি পিছিয়ে পড়েছে কারণ তারা সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেননি। হিন্দুদের সমান হওয়ার জন্য তাদের দাবি অনেকটা বেশি। রবীন্দ্রনাথের মতে এই দাবি সমর্থনযোগ্য। মুসলিমরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে তাতে প্রতিযোগিতার ভাব থাকলেও সেটি 'স্থায়ী ও সত্য নয়' এবং মুসলিমদের মতো হিন্দুদেরও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা একই কারণে তিনি সমর্থন করেছেন। তবে বারবার করে হিন্দু সভ্যতার স্বরূপটি সবার মধ্যে স্পষ্ট করে নিতে বলেছেন। তিনি বারবার হিন্দু সমাজের গৌরবময় কালটিকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি সেই হিন্দু সমাজের কথা বলেছেন যেখানে বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান ও মুসলমানরাও সেই সমাজের অংশ হতে পারত। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই হিন্দুত্বে ধারণাটিকে আরো বড় করে তোলার চেষ্টা করে তবে আধুনিক কালের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হবে বলে তিনি মনে করেছেন। আর অন্যদিকে বিচারহীন আচারকে বড়ো করার কারখানা যদি হয়ে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়, তবে তাঁর মতে তা হবে ডাইনির হাতে পুত্র সমর্পণ। একদিকে তিনি যেমন হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে আশঙ্কার কারণকেও উড়িয়ে দেননি তেমনি আবার এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্ত বাড়াবাড়ি মিটিয়ে আসল সত্যটি যথাযথ ভাবে প্রকাশ করবে- সেই শুভাকাঙ্ক্ষাটিও ত্যাগ করেননি। বারবার চেয়েছেন হিন্দু বা মুসলমান যে বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক না কেন সেখানে প্রথমে বিশ্বকে স্থান দিতে হবে, তার সঙ্গে স্থান পাবে স্বতন্ত্রতা। আর তাহলে সেখানে বিরোধের সম্ভাবনা নেই।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের আরেকটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায় সেটি হল – 'ভগিনী নিবেদিতা'। প্রবন্ধটি তিনি প্রবাসীর জন্য লিখেছিলেন এবং এই লেখার পেছনে জগদীশচন্দ্র বসুর অনুরোধ কাজ করেছিল। প্রবন্ধটিকে নিছক প্রশস্তিমূলক গতানুগতিক প্রবন্ধ বলা যায় না। বরং তিনি ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র লক্ষণকে একেবারে ভেতর থেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এই প্রবন্ধে। শিক্ষা বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বৈপরীত্য একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর জন্য কোথাও নিবেদিতার মহত্ব, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিবোধ খাটো হয়নি। এই প্রবন্ধে তিনি নিবেদিতাকে 'লোকমাতা', 'সতী' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজরোষের সন্দেহ দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। এমনকি আশ্রম বিদ্যালয়েও মাঝে মাঝে গুপ্তচরের দেখা মিলত সে ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল এফ সি ডেইলি একটি সার্কুলার জারি করেছিলেন। এখানেই ঘটনাটি থেমে থাকেনি। এরপরেও ইংরেজের সন্দেহভাজন কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায় ও কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হীরালাল সেনকে যখন আশ্রমের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়, তৎকালীন ইংরেজ সরকার যে তা একেবারেই পছন্দ করেনি তার প্রমাণ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন মিস্টার শার্পের গোপন একটি সার্কুলার। এই গোপন সার্কুলার ২৬ জানুয়ারী ১৯১২ (শুক্রবার, ১২ মাঘ) তারিখের 'The Bengalee' তে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের ৫০ তম জন্ম উৎসবের ঠিক আগে।

> "It has come to my knowledge that an institution known as the Santiniketan or Brahmacharyasrama at Bolpur in the Birbhum district of Bengal, is a place altogether unsuitable for the education of the sons of Government servants. As I have information that some Government servants in this province have sent their children there, I think it is necessary to ask you to warn any well-disposed Government servant whom you may know or believe to have sons at this institution or to be about to send sons to it, to withdraw them or refrain from sending them as the case may be; any connection with this institution in question is likely to prejudice the future of the boys who remain pupils of it after the issue of the present warning."[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে রামানন্দকে লেখেন:

> “আমাদের বিদ্যালয়ের পরেও এতদিন পরে গোপনে রাজদণ্ডপাত হইয়াছে। হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গের রাজকর্মচারীদের ছেলেরা বিদ্যালয় হইতে সরিতে আরম্ভ করিতেছে। এমন কি, টেলিগ্রাফযোগে তাহাদিগকে সরানো হইতেছে। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতিই একান্তভাবে লক্ষ্য রাখিয়া আমি ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও বিদ্যালয়ে কোনোপ্রকার অশান্তিকর আলোচনা ঘটিতে দিই না। বস্তুত আমি ছাত্রদের মন সেদিক হইতে একেবারে ফিরাইয়া দিয়াছি- সেজন্য আমাকে নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ধর্ম্মপ্রচার হউক অথবা অন্য যে কোনো হিতকর্ম্মই হউক- কোনো কিছু গড়িয়া তুলিতে গেলেই দেশের রাজার নিকট হইতে বাধা পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে মুখামুখি একটা বোঝাপড়ার নামা যাইবে সে রাস্তাও বন্ধ - মেঘনাদের মত মেঘের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যখন রাজশক্তি অস্ত্রপাত করে তখন তাহার জবাব দিবারও যো নাই নিজেকে বাঁচাইবারও পথ বন্ধ। ...
>
> গবর্মেন্টের এই গুপ্ত ছুরির আঘাতে কি পরিমাণে আমাদের রক্তশোষণ করিতে পারে তাহা আর কিছুদিন গেলে বুঝিতে পারিব। কিন্তু এই অন্যায়ের ছুরির বাঁট নাই - যে আঘাত করে সে কখনই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না।”[৫০]

‘রক্তশোষণ’ যে শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা ১৬ কার্তিক [২ নভেম্বর] নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা পত্র থেকে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন আশ্রমের কর্মচারী না বাড়িয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ ছুটির পরে ছাত্র সংখ্যা বাড়েনি। তবে এই সময়ে আশ্রমের ছোটো ছোটো ছেলেরা চোখের জল ফেলে আশ্রম ত্যাগ করেছিল। ম্যারিয়ন ফিলপস নামে নিউইয়র্কের এক বিখ্যাত আইনজীবী সেই সময় শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তিনিও বিদ্যালয়কে এইভাবে আপন করে নেওয়ার দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিলেন।

‘হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও মুসলমানকে পাশাপাশি আনার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার একটি সুযোগ তিনি এই সময়ে পান। এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর পুত্রকে আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে উৎসাহিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি দীপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে বাধা আসার আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন। তবে তিনি যে এই ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা ১৬ কার্তিকের চিঠিটি।

"মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একটি চাকর দিতে তাহার পিতা রাজি অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে একত্রে খাইবেন। শুধু তাই নয় - সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে এক ঘরে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যুথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা সুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শাল বাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটি কয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্র রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিবে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না? ... প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা। আবার একবার বিবেচনা করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে আপনাদের আশ্রমদ্বারে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন না - যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র ভগবান তাঁহার নাম করিয়া প্রসন্নমনে নিশ্চিন্ত চিত্তে এই গ্রহণ করুন; আপাতত যদিবা কিছু অসুবিধা ঘটে সমস্ত কাটিয়া গিয়া মঙ্গল হইবে।"[৫১]

কিন্তু বলাবাহুল্য অন্যদের আপত্তির কাছে রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। ওই মুসলিম ছাত্রটিকে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে প্রথম যে মুসলিম, ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন তিনি হলেন সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪)।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের উইলপত্র সম্পাদনা করা। তিনি নিজের হাতে বাংলায় একটি উইলপত্র সম্পাদন করেন। যদিও উইলটি তিনি রেজিস্ট্রি করে যাননি। তথাপি উইলিটির কিছু অংশ থেকে আশ্রম বিদ্যালয়ের সম্পর্কে তাঁর যে সুদূরপ্রসারী ভাবনা তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশ্রম বিদ্যালয়ে নিজের শ্রাদ্ধক্রিয়ার জন্য এক হাজার টাকা তিনি নির্ধারণ করে যান।

উইলের 'আমার মনোবাঞ্ছা নিবেদন' অংশে তিনি লিখেছেন-

"বোলপুর বিদ্যালয়কে রক্ষা করা সম্বন্ধে আমার যে রূপ অভিপ্রায় তাহা রথীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবগত আছেন। সে সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কোনরূপে আবদ্ধ করিতে চাহিনা। কারণ বিদ্যালয়ের কখন্ কিরূপ অবস্থা ঘটিবে এবং সে সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য হইবে তাহা আগে হইতে চিন্তা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে যখন যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পাদন করিবেন।

জমিদারী সম্পত্তির আয় নিজের ভোগে না লাগাইয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহাতে নিযুক্ত করেন রথীন্দ্রকে সে সম্বন্ধে বারবার উপদেশ দিয়াছি। তদনুসারে এইরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানে তিনি যদি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রসন্ন চিত্তে উৎসর্গ করিতে পারেন তবে আমার বহুকালের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়।"[৫২]

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১০ থেকে ১২ পৌষ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে একেশ্বরবাদীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্গালোরের রঘুনাথাইয়া ইনানের সভাপতিত্বে সিটি কলেজ ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন সম্মেলনের জন্য। যদিও কবে তিনি প্রবন্ধটি পাঠ করেন এই নিয়ে সংশয় আছে। তথাপি এই প্রবন্ধে রবীন্দ্র জীবনের যে ১১ বছর কেটেছে এই আশ্রম বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার পূর্ণাঙ্গ সাধনার রূপটি এক আবেগময় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজে কীভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে বন্ধুদের অনুরোধে এই প্রবন্ধে তিনি তাই আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁর মতে ধর্মশিক্ষা সেখানেই স্বাভাবিকভাবে হতে পারে যেখানে ধর্ম পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আধুনিক জীবনে ধর্মস্থান যত সংকীর্ণ হবে সাধারণ বিদ্যার-শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগও তত বিচ্ছিন্ন হবে - তা তিনি বলেছেন। এমনকি ধর্মশিক্ষা বলতে যে সাধারণ ধারণা রয়েছে অর্থাৎ বাঁধা বচন মুখস্থ করা, কিছু প্রচলিত আচার অভ্যাস করা ইত্যাদিকে তিনি ধর্মশিক্ষা বলতে নারাজ। ধর্ম আসলে রয়েছে মানুষের সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে। আসলে ধর্মশিক্ষার জন্য প্রয়োজন পরিবেশ। আর এই অনুকূল পরিবেশ সর্বত্র পাওয়া দুরূহ। এজন্যই তিনি আশ্রমের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছেন। 'যেখানে বিশ্ব প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম।'[৫৩]

রবীন্দ্রনাথের মতে, এমন পরিবেশেই স্বাভাবিকভাবে ধর্ম সাধন সম্ভাবপর। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সেই চেষ্টাই চলছিল। যদিও তাঁর বন্ধু মহলে সমালোচনা উঠেছিল জনতার থেকে দূরে এরকম গৃহীত

বেষ্টনের মধ্যে আসলে জীবনযাত্রায় শৌখিনতা আছে কিন্তু তার মধ্যে নাকি সত্যি নেই। তাই সমালোচক বন্ধুর মত অনুযায়ী সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নয়।

> "রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেন, এক-শ দু-শ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আয়োজনের সমস্যা-কণ্টকিত জীবনযাপন শৌখিনতা-বিলাস নয় এবং সংসারের দাবি, বৈষয়িকতার আড়ম্বর, প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহং-পুরুষের উদ্ধত মূর্তির সাক্ষাৎ সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়- বরং ভালোমন্দে মেশানো সাধারণ লোকালয়ের চেয়ে মন্দকে সেখানে সহজে দেখা যায়। আসলে, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই তার পরিচয় নয়, যেখানে সে দৃষ্টি রেখেছে সেখানেই তার প্রকাশ। 'এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে, যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়।'"[৫৪]

কংগ্রেসের এই সভাতেই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন- অধিনায়ক জয় হে' গানটি সমবেত ভাবে গাওয়ার মাধ্যমে। যদিও এই গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই গানটি কবে কোথায় রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও সঠিক তথ্য জানা যায় না। গানটি ভারতে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, সমালোচকরা প্রচার করেন গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। তাই গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পুলিনবিহারী সেন গানটির রচনার উপলক্ষ জানতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন, ১৯৩৭ সালের ২০ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ সেই ছাত্রকে চিঠি লিখে জানান–

> "সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি; পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের

মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক বুদ্ধির অভাব ছিল না।"[৫৫]

আসলে কংগ্রেসের ওই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সম্পর্কে কিছু তথ্য বিকৃতভাবে 'দ্যা ইংলিশ ম্যান' ও 'দ্যা স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ও রয়টারের টেলিগ্রাম অবলম্বনে বিলেতের 'ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য 'জনগণমন' যে রাজ প্রশস্তির জন্য রচিত হয়েছিল এই ধরনের ভুল এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের জন্য এই তিনটি পত্রিকাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এই অপপ্রচার কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রমাণ হল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে আমেরিকান তরুণ কবি Ezra Pound -এর লন্ডন থেকে লেখা একটি চিঠি। তিনি এটি পাঠিয়েছিলেন তাঁর পিতা Homer L. Pound -কে।

"There is a charming tale of the last durbar anent R.T. one Bengali here in London was wailing to W.B.Y. "How can one speak of patriotism of Bengal, when our greatest poet has written this ode to the King?" And Yeats taxing one of Rabindranath's students elicited this response. "Ah! I will tell you about that poem. The national committee came to Mr. Tagore and asked him to write something for the reception. And as you know Mr. Tagore is very obliging. And all that afternoon he tried to write them a poem, and he could not. And that evening the poet as usual retired to his meditation. And in the morning he descended with a sheet of paper. He said, 'Here is a poem I have written. It is addressed to the deity. But you may give it to the national committee. Perhaps it will content them.

The joke, which is worthy of Voltaire, is for private consumption only, as it might be construed politically if it were printed."[৫৬]

পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'-র মাঘ সংখ্যায় 'ভারত-বিধাতা/(ব্রহ্মসংগীত)' শিরোনামায় গানটি ছাপিয়ে তাঁর মতামতকে যথার্থ ভাবে ব্যক্ত করেন এবং এর কয়েকদিন পরই মাঘোৎসবে (২৫ জানুয়ারি) ব্রহ্মসঙ্গীত হিসেবে এই গানটি গাওয়া হয়। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' (১৩৫৬) পুস্তিকায় প্রাসঙ্গিক তথ্য সাজিয়ে গানটি সম্পর্কে অপপ্রচারের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে

দেশ স্বাধীন হলে রাজনৈতিকভাবে গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেয় এবং এখানেই সমস্ত অপপ্রচারের সমাপ্তি ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ একসময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল ঘটতে শুরু করে। ফলে রবীন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে ভাষণ দিচ্ছিলেন তা সেই সময় অনেক সদস্যের পছন্দ হচ্ছিলনা। এমনকি অনেক প্রবীণ সদস্য পর্যন্ত তাঁকে সাধ্যমত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের জেদ বজায় রেখেই পুরাতন ব্রাহ্মগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ করেছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং পরবর্তীতে বিশ্বভারতীতে তাঁর দর্শনের প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পরিমাণের অর্থ সাহায্য। হয়তো তিনি পেয়েও ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই সামান্য। অথচ তিনি যদি তখনকার বহু বিখ্যাত প্রচারকদের মতো যুগের সঙ্গে, সময়ের সাথে, আবেগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধ্যাত্মিকতা মিশিয়ে ভাষণ দিতেন, তাহলে হয়তো খুব সহজেই সেই অর্থের অভাব মিটে যেত। কিন্তু নিজের উপলব্ধি থেকে, নিজের সত্য থেকে এই পূজারী কখনো সরে আসেননি। তাই হয়তো একসময়ের জাতীয়তাবাদের পূজারী হিসাবে পরিচিত জাপান এবং আমেরিকাকে তিনি ন্যাশনালিজম বিরোধী ভাষণগুলি শোনাতে পেরেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের মুহূর্তে যখন দেশবাসী উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন তখন তিনি তাঁদেরকে মহত্ত্বের ও আদর্শের দীক্ষায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বরাবরই যেন যুগের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে বরং স্রোতের বিপরীতে হেঁটে সত্যের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। আর তার ফলে তাঁকে বারবার পড়তে হয়েছে সংকটের মুখে।

তবে তিনি তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও আশ্রম বিদ্যালয়কে কখনো অবহেলা করেননি। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৩ মাঘ ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে তিনি চিঠিতে জানান, এবারে তিনি বোলপুর যাবেন তবে বেশিদিন থাকতে পারবেন না, কেবলমাত্র ছাত্রদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেই ফিরে আসবেন। আসলে ছাত্রদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার পেছনে ছিল বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থাকে আরেকটু সঠিকভাবে দেখা এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে কোনো রকমের অসুবিধা না হয়। এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দায়িত্বে ছিলেন। বিদেশ থেকে পাঠানো পত্রগুলি থেকে সেই প্রমাণই পাওয়া যায়। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৪ ফাল্গুন যখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন তখন ভাবা হয়েছিল,

তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য শান্তিনিকেতন ত্যাগ করছেন। তাই এই সময় তিনি ছাত্র এবং শিক্ষকদের বেশ কিছু উপদেশ দান করেন। যদিও তার কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায়নি। তবে 'তত্ত্ববোধিনী'র চৈত্র সংখ্যার 'আশ্রম কথা'য় অজিত কুমার চক্রবর্তীর লেখায় এই ধরনের আভাস পাওয়া যায়।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ একের পর এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই অতিরিক্ত বক্তৃতায় এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ভাবনায় তিনি রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এই অর্থনৈতিক ভাবনার অন্যতম কারণ ছিল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেইসময় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের উপর নির্ভর না করে দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শান্তিনিকেতনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের একজন অন্যতম ট্রাস্টি। উপরন্তু তিনি সেখানকার বাসিন্দা ও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়। এই সময়ে দীপেন্দ্রনাথকে লেখা বেশ কিছু চিঠি থেকে তাঁর এই অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার কথা জানা যায়।

> "এ পর্য্যন্ত বই লিখে কিম্বা অন্য কোনোপ্রকার সৎ বা অসৎ উপায়ে আমি টাকা উপার্জ্জন করতে পারিনি- আমার বইয়ের আয়ের উপর ভরসা করেই আমি গোড়ায় বিদ্যালয় ফেঁদেছিলুম- কিন্তু গোড়াতেই শৈলেশের কবলে আমার আশা ভরসা তলিয়ে গেল।"
>
> এমনকি ৪ ঠা চৈত্র তিনি দীপেন্দ্রনাথকে এও লেখেন, "আমি ত আমার সামর্থ্যের একেবারে চরম সীমায় এসেছি।"[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ এই সময় নিজে বিদেশ যেতে পারেননি। কিন্তু আশ্রম বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য একাধিক শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র প্রমুখকে (কালীমোহন ঘোষ যাচ্ছিলেন শিশু শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন এবং বিদেশের বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য, শিশুর শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষক নারায়ণ কাশীনাথ দেব বিলেতে যাচ্ছিলেন ভাস্কর্য শেখার জন্য) বিদেশ যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত রেখেছিলেন। এই সবদিক সামলানো তাঁর পক্ষে যে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম নিয়ে, বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিলেন। যখন বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিধান রচনায় নিযুক্ত হয়ে পড়েন, তাঁর বদলে সংস্কৃত শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পাঠান। এমনকি শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপনও দেন বেঙ্গলি পত্রিকায় (৩১ মে, ১৩১৮)। কেবলমাত্র শিক্ষক নিয়োগ নয়, শিক্ষার্থীর ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্যভার দিতে চেয়েছিলেন। কারণ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় শিক্ষকদের মানভঞ্জন করে তাঁদেরকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়েও এনেছেন। এরকম একটি উদাহরণ হল শরৎকুমার রায়। তিনি কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বারবার চিঠি দিয়ে ফিরিয়ে আনেন। যদিও শরৎকুমার রায় পরবর্তীতে বলেছেন বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ম-প্রণালী সঙ্গে তাঁর কোনো মাত্র বিরোধ নেই। শুধু শিক্ষক নয়, এমনকি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি নিয়েও তিনি যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। কোন ছাত্র কোথায় ভর্তি হবে, কোন হোস্টেলে থাকবে- এইসব নিয়েও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখা একটি পত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায় –

> "তোমার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনো খবর না পাইয়া আশঙ্কা হইতেছে হয়ত এবারকার পরীক্ষায় তুমি কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। ...আমাদের ছাত্রেরা কলিকাতায় কোথায় থাকিবে এখনো তাহা স্থির হয় নাই। যাহারা Science Course না লইবে তাহারা সম্ভবত Scottish Church এ যাইবে ও সেখানকার hostelএ গোরাদের সঙ্গে থাকিবে, দেবলও সম্ভবত সেই কলেজেই যাইবে, বীরেন ও বিশু বোধ হয় বাঁকিপুরে ভর্তি হইবে।"[৫৮]

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার বিদেশ যাত্রায় বের হন। তিনি ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বা প্রাচ্যের বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত কাব্য, নাটক, মধ্যযুগের সন্তবাণী প্রভৃতি ইতিহাসের ধারায় প্রাচ্যকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এবারের যাত্রা ইউরোপের আত্মার সন্ধানে। খেয়াল করলে দেখা যাবে,

তাঁর আগের দুটি ভ্রমণ ছিল মূলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা। যদিও প্রথমবারের ভ্রমণে তিনি বয়সে বেশ ছোটো, নিতান্তই কিশোর ছিলেন এবং দ্বিতীয়বারের ভ্রমণে তিনি সদ্য যুবক। সেই সময় তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল নিতান্তই কম। কিন্তু এই পরবর্তী কুড়ি বছরের চিন্তা-ভাবনা ও সাধনায় এইবার অন্য এক পরিণত রবীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা করছেন। কলকাতা থেকে বিলেত যাওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ বোম্বাই যাত্রার পূর্বে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল স্বাক্ষর করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বার্ষিক ৪৫০০০ টাকার বিনিময়ে জমিদারিতে তাঁর অংশ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৯৯৯ বছরের জন্য শর্তসাপেক্ষ ইজারা দেন। যদিও এই শর্ত এবং বন্দোবস্ত ১৯০৯ সাল থেকেই আলোচিত হচ্ছিল, তবে তা স্বাক্ষরিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (২৪ মে, ১৯১২)।

বিদেশ যাওয়ার পূর্বে তিনি বিদ্যালয় সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সকলকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনবাসী দুই আত্মীয় হেমলতা দেবী ও দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখে কিছু দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধও করে গিয়েছিলেন এবং অভাব অভিযোগ যাই আসুক না কেন সেই সমস্ত কিছু সঠিকভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে দূর করার পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিলেত ভ্রমণকালে Arthur Fox Strangways, (ইনি ছিলেন তৎকালীন ইন্ডিয়া সোসাইটির সেক্রেটারি) চেষ্টা করেছিলেন অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যাতে রবীন্দ্রনাথকে একটি সাম্মানিক ডিগ্রি দেয়। কিন্তু বলাবাহুল্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলার লর্ড কার্জন প্রস্তাবটি বাতিল করে দেন। তাঁর যুক্তি ছিল 'there were more distinguished men in India than Tagore'[৫৯] এবং এই হাস্যকর যুক্তিটির পেছনে কার্জনের কোন স্মৃতি কাজ করছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আসলে রবীন্দ্রনাথের লেখা স্বদেশি গান এবং তাঁর কার্যকলাপ লর্ড কার্জনের রাজত্বকালের শেষ দিনগুলোকে যে সুখের করে তোলেনি তা তিনি তখনও ভুলতে পারেননি।

বিদেশ ভ্রমণ কালে, রবীন্দ্রনাথ একাধিক সভা, সম্বর্ধনা, অনুবাদ ইত্যাদি একাধিক কাজে চূড়ান্তভাবে ব্যস্ত ছিলেন। তবুও তিনি তাঁর মনকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় থেকে চিন্তামুক্ত রাখতে পারেননি। ১০ ভাদ্র ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনে জগদানন্দ রায়কে লেখেন-

> "তোমাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক চটি বই পাঠাব বলে কিনে রেখেছি। এগুলি খুব ভাল। শিশু-পাঠ্য নয় অথচ সহজবোধ্য। এগুলি অবলম্বন করে তোমরা যদি ছেলেদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত বক্তৃতা দিতে পার তাহলে ভাল হয়। এর পরে পাঠ্যপুস্তকরূপে সে সমস্ত ছাপাও হতে পারে।' অনেকগুলি চিঠিতেই এই বইয়ের প্রসঙ্গ আছে এবং বইয়ের বাক্স যথাসময়ে পৌঁছয়নি বলে তিনি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।"[৬০]

এই সময়ে কেবল শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের নিয়ে নয়, বিলেতে অবস্থিত শান্তিনিকেতনের কয়েকজন ছাত্র শিক্ষককে নিয়েও তিনি চিন্তিত ছিলেন। তার মধ্যে ছাত্র সোমেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মনের কথা পাওয়া যায়। আশ্রমের অন্য একজন ছাত্র চণ্ডীচরণ সিংহ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। কালীমোহন ঘোষ ইংরেজি সাহিত্যের কোর্স নিয়ে ভর্তি হন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র রায় আমেরিকায় ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে যান। এইভাবে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিদেশ যাত্রা কালেও শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ বহু পরামর্শ পেয়েছিলেন, কীভাবে বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট দূর করা যায়। যেমন রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য ছাত্রদের বেতন বাড়ানো ও অধ্যাপকদের বেতন কমানোর প্রস্তাব করেছিলেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রস্তাবটির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সম্মতি প্রদান করলেও দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে যে চিঠিটি তিনি রামানন্দকে লিখেছিলেন, সেটি এই প্রসঙ্গে বেশ উল্লেখযোগ্য-

> "ত্যাগ করিবার দাবি একমাত্র আমারই উপর আছে - বিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব যথার্থভাবে আমারই গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ আমি অন্যের কাছে হাত পাতিতে পারি না। ...অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদায় করা একটা পন্থা বটে কিন্তু তাহা হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্যয় বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কারণ তাঁহারাই বিদ্যালয়ের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছেন।"[৬১]

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে বসে আশ্রম বিদ্যালয়ের একের পর এক আর্থিক সংকটের খবর পাচ্ছিলেন। যেমন রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'পাঠ সঞ্চয়' ছাপা হয়েছিল এই আশায় যে, এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠতালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। তাই লভ্যাংশ থেকে আশ্রম বিদ্যালয়ের উন্নতি তো দূরে থাক, ছাপার খরচটুকু কীভাবে মেটানো যায় তা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান চর্চা ও বিদ্যালয়ের সুবিধার জন্য তিনি সুরুলের কুঠিবাড়ি ক্রয় করেছিলেন ৮০০০ টাকার হ্যান্ড নোট দিয়ে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে রায়পুরের জমিদার ডাক্তার নরেন্দ্র প্রসাদ সিংহের কাছ থেকে ছ'টাকা সুদে ৮ হাজার টাকায় ১০০ বিঘা জমিসহ সুরুলের বাগান ও বাড়ি কিনেছিলেন। এই ক্রয়ের পেছনে তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি হল কৃষি বিষয়ক গবেষণা। যদিও সেই সময়ে ম্যালেরিয়ার উৎপাতে রবীন্দ্রনাথের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি কর্মযজ্ঞ সেই শ্রীনিকেতনেই শুরু হয়। কিন্তু সন্তোষচন্দ্রর কাছ থেকে তিনি বাড়িটির যে ভগ্নপ্রায় দশার বিবরণ পেয়েছিলেন তা তাঁর মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে ঠাকুর কোম্পানির দেনা শোধের জন্য ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের লাল বাড়ি বন্ধক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে ১৯০৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ৩০ হাজার টাকা ধার করেছিলেন। তারকনাথ সেই সম্পত্তি তাঁর অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে ৮ ই অক্টোবর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের উপর শুধু সুদ নয় আসল মেটানোর জন্যও চাপ আসতে থাকে। শেষে নোবেল প্রাইজের টাকা থেকে তিনি এই ঋণ পরিশোধ করেন।

সব আর্থিক সংকট দূর করার জন্য তিনি বিদেশে বসেই তাঁর লেখা বিভিন্ন নাটক ও কবিতাগুলি আমেরিকার প্রকাশকদের দেওয়ার কথা ভাবলেন। এমনকি তাঁর ভাষণগুলিও আমেরিকার পত্রিকায় ছাপাবার তাগিদ অনুভব করলেন। বহু বছর ধরে ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশক ছিল।

আমেরিকায় থাকাকালীন শ্রীমতি মূডি, রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন এবং তিনি (শ্রীমতি মূডি) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৪ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে একটি চিঠিতে লেখেন-

"ইনি আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ একটি আনন্দ অনুভব করেছেন। কিসে আমাদের বিদ্যালয়ের অর্থাভাব দূর হয়ে যায় সেই চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে রয়েছে। হয়তো তিনি একটা সুযোগ আবিষ্কার করতেও পারেন।"[৬২]

যদিও রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোনোদিন শ্রীমতি মূডির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চাননি। বরং শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেন আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি ও জীবিকা সংস্থান শিক্ষা করতে চাইলে তিনি শ্রীমতি মূডি ও ডক্টর উডসের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন। এমন কি শ্রীমতি মূডির মিষ্টান্ন ব্যবসায় অন্নদাচরণ রায় বর্ধন, কাশিনাথ দে বল, কালী মোহন ঘোষ প্রমুখকে শিক্ষার্থী হিসেবে নিয়োগ করার কথাও ভাবা হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়নি।

এই সময় শান্তিনিকেতনে সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশুনোর ওপরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার একটি নিষেধাজ্ঞামূলক সার্কুলার জারি করেছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা দেখলে বোঝা যায় যে, তার বিশেষ প্রভাব এখানে পড়েনি। বরং এই সময়ে ত্রিপুরা থেকে ৪৩ জন, কলকাতা থেকে ৪২ জন, ঢাকা থেকে ৩২ জন, ময়মনসিংহ থেকে ১২ জন, শ্রীহট্ট থেকে ১৬ জন, পাবনা থেকে ১০ জন, উড়িষ্যা, আসাম, ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই ও রাজপুতানা থেকে ৩ জন করে এবং পাঞ্জাব থেকে ১ জন ছাত্র ছিল আশ্রম বিদ্যালয়ে। এটাও লক্ষণীয় যে, চোখে পড়ার মতো একটা বড় সংখ্যার অ-বাঙালি ছাত্র তখন শান্তিনিকেতনে পড়ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বাংলার বাইরের প্রদেশগুলিতে বাংলার যে গুরুত্ব বাড়ছিল ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধিই তার প্রমাণ। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের বন্ধু গোবিন্দ সরদেশাই তাঁর পুত্রকে আশ্রম বিদ্যালয় ভর্তি করেন। গোবিন্দ সরদেশাইয়ের পুত্র শ্যামকান্ত পৌষ উৎসবের সময়ে বিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হন এবং এর কিছু দিন পর আরেকটি মারাঠি ছাত্র জয়রাম হরি আঠলে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। যদিও গোবিন্দ সরদেশাই খুব কম বয়সে মারা যান তবুও আশ্রমে থাকাকালীন তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে যেসব চিঠিগুলি লিখতেন তা আশ্রম বিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি যে কতটা প্রতিভাবান ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় আশ্রম বিদ্যালয়ের পত্রিকাগুলিতে তাঁর লেখা মহারাষ্ট্রের জীবনযাত্রা ও ইতিহাস নিয়ে লেখাগুলি থেকে।

এই বিদেশ যাত্রা কালে লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের সাথে উইলিয়াম পিয়ার্সন (১৮৮১-১৯২৪) এবং চার্লস এন্ড্রুজের (১৮৭১-১৯৪০) পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই অ্যান্ডরুজ যখন ভারতে আসেন তিনি শান্তিনিকেতন যাওয়ার পরিকল্পনা করেন এবং অবশেষে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৮ অগ্রহায়ণে তিনি বোলপুরে পৌঁছান। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান শিক্ষক সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার ও ছাত্ররা। যদিও অ্যান্ডরুজ সেই সময় দিল্লিতে একটি কাজে যুক্ত ছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানান যে, ভালো করে বাংলা শিখে কয়েক মাস পরেই তিনি আশ্রমে যোগ দিতে চান। অথচ রবীন্দ্রনাথ তখন লন্ডনে ছিলেন। এরপর তিনি আবার ৭ ফাল্গুন শান্তিনিকেতনে আসেন এবং তাঁর এই শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথা রবীন্দ্রনাথকে পত্র মারফত জানান।

একই মেলে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সংকট বিষয়েও অনেক পত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু পিয়ারসনের পত্র তাঁকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছিল। উইলিয়াম পিয়ার্সন বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগের যে সংকল্প নিয়েছিলেন তার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। এমনকি রবীন্দ্রনাথের সাথে পিয়ার্সনের মায়েরও দেখা হয় এবং সেই সাক্ষাতে রবীন্দ্রনাথ যে আরও কতখানি আপ্লুত হন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩ জুন পিয়ারসনকে লেখা একটি চিঠি থেকে। পিয়ার্সনের মাকে তিনি মাতৃ সম্বোধনে ডাকার ইচ্ছাও তাঁর এই চিঠিতে প্রকাশ করেন।

বিদেশে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের একাধিক বক্তৃতার মধ্যে ১৯ জুন স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের বাড়িতে দেওয়া ইন্ডিয়ান ওমেন্স এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সভার বক্তৃতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এইবারের বিদেশ যাত্রার অন্যতম কারণ ছিল অবসর যাপন ও তাঁর অর্শ্ব চিকিৎসা করানো। কিন্তু বলা বাহুল্য ইংল্যান্ডে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা বা বিশ্রাম কোনোটাই ঠিকমতো হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করানো আর তাতে যদি ফল না হয় তবেই অস্ত্র চিকিৎসা করানো। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের পীড়াপীড়িতে তাঁকে অস্ত্রোপচারের জন্য রাজি হতে হয়। ২৯ জুন তিনি ২ Beaumont Road -এ অবস্থিত Duchess Nursing Home -এ ভর্তি হন, এবং পরের দিনই ডাক্তার পলার্ড তাঁর অস্ত্রোপচার করেন। যদিও তাঁকে 'অজ্ঞানতিমিরান্ধ' করে অপারেশন করা হয়েছিল। তাই এই অপারেশনে তাঁকে খুব একটা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু এর পরবর্তী চিকিৎসা পর্বে তাঁকে

বেশ যন্ত্রণা পেতে হয়েছে। বিদেশ যাত্রা কালে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন এবং তাঁর মনে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাওয়ার বাসনাও জেগে উঠেছিল। এই সময় তিনি আশ্রমের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন বিদেশে আসার জন্য। তবে পরবর্তীকালে যখন সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি তখন তা নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৩২০-র ২৪ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ৭ জুন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কালিদাস বসুকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়-

"তোমাদের মধ্যে কারো মনে এ রকম ধারণা হয়েছে যে নিজের সম্বন্ধে, বিদ্যালয়ের প্রতি আমার আর্থিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমি অত্যুক্তি করতে বসেছি এবং যে সব সংকল্প মনের মধ্যে রেখে দেওয়া উচিত আমি তাই অযথাপরিমাণে প্রকাশ করচি। এই ভৎসনাবাক্য শুনে আমি চিন্তা করে দেখলুম এর মধ্যে সত্য আছে এবং তোমাদের মনে এ ধারণা হওয়া অন্যায় হয়নি। কিন্তু তবুও আমার নিজের দিকে যে একটা কথা বলবার আছে সেটা তোমাদের কাছে খোলসা করে বলা উচিত। বরাবর আমি দেখে আসছি আমি কেবল কথা কয়ে নিজেকে শিক্ষা দিয়েছি। নিজের ভিতরে কোনো ভাল জিনিষ ভাব আকারে বা সংকল্প আকারে দেখা দেবামাত্র সেটাকে প্রকাশ করার দ্বারাই আমি নিজের কাছে সেটা পরিস্ফুট করে তুলতে পারি। সেটা আমার ভাষায় ব্যক্ত হতে হতেই উত্তরোত্তর আমার জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠতে থাকে। এটা বিশেষভাবে আমার স্বভাব। এই জন্যেই বস্তুত অধিকাংশ স্থলে নিজের সাধনা সম্বন্ধে আমার অত্যুক্তি ঘটতে বাধ্য। কারণ বর্তমানে আমার শক্তির সীমা যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষার সীমা সেখানে নয়। ... সেইজন্যে আমার মধ্যে যে মানুষটি সাধক সে আমার সংসারী মানুষের ভাষা অতিক্রম করে কথা কয়- কিন্তু তার কথা যদি আমি চাপা দিয়ে ফেলি তাহলে আমার এই সংসারী মানুষের আর পরিত্রাণ নেই। তার উচ্চারিত বাণী ক্রমশ আমার উপর জয়লাভ করতে থাকে। এমন অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে বল যে যখন পারবে তখন কথা কোয়ো আগে থাকতে এ সব আলোচনা অসঙ্গত তাহলে সেটা আমার পক্ষে কল্যাণকর নয় - কেননা আমার স্বভাববশত কথাকওয়াই আমার সকলের চেয়ে প্রশস্ত পথ। ... বারবার দেখেছি জীবনের ক্ষেত্রে কোনো জিনিষের প্রকাশের বহু পূর্ব্বে বাণীর ক্ষেত্রে তার অভ্যুদয় হয়েছে - তার কারণ ঠিক অহঙ্কার নয়-তার কারণ আমার বাক্যের প্রকাশ আমার জীবনের প্রকাশের অঙ্গ। আমার এই জীবনের প্রক্রিয়া এমনি নিগুঢ় যে অনেক সময়ে এ আমার অগোচরে হয়ে থাকে।"[৬৩]

১৩২০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ নার্সিংহোম থেকে চিকিৎসার পর বেরিয়ে আসেন এবং তারপর প্রকাশিত হতে পারে এরকম গ্রন্থগুলি নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে কবি ইয়েটস সাহায্য করছিলেন। কিন্তু ক্রমশই তিনি এই ব্যাপারে অসহযোগী হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। তাই তিনি কবি ইয়েটসের উপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে টমাস স্টার্জ মূরের (১৮৭০-১৯৪৪) ওপরে নির্ভরশীল হচ্ছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ও মূর উভয়েই শংকিত ছিলেন ইয়েটসকে নিয়ে। কারণ তিনি কীভাবে ব্যাপারটিকে নেবেন সেটা রবীন্দ্রনাথ বা মূর কেউই বুঝতে পারছিলেন না।

তবে বলা বাহুল্য, পাউন্ড, ইয়েটস, ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের বন্ধুরা মূরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেননি। কিন্তু মূর নিজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুগামী। যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে মূর কতখানি রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁর এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত নিজের মতো করেই দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়ার পশ্চাতে মূরের কতখানি অবদান ছিল, তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুইডিশ একাডেমি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সাহিত্যে নোবেল কারা পাবেন সেই নাম সুপারিশ করতেন বিভিন্ন দেশের স্বীকৃত সাহিত্য সংস্থার সভ্যরা বা প্রাক্তন নোবেল পুরস্কার প্রাপকগণ। ইংল্যান্ডের হয়ে এই কাজ করতেন রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার অফ দা ইউনাইটেড কিংডমের সভ্যরা। এই কমিটি ১৯১৩ সালের জন্য টমাস হার্ডির নাম সুপারিশ করে। অন্যদিকে সোসাইটির একজন সদস্য হিসাবে স্টার্জ মূর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন। ১৯১৩ নোবেল প্রাইজের প্রস্তাব সমূহ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবটির যে কপি পাওয়া যায় সেটি হল –

> “N: o 17. Rabindra Nath Tagore.
>
> To the Secretary of the
>
> Nobel Committee of the Swedish Academy, Stockholm.
>
> Sir,

As a Fellow of the Royal Society of Literature of the United Kingdom, I have the honour to propose the name of Rabindra Nath Tagore as a person qualified, in my opinion, to be awarded the Nobel Prize in Literature.

T. Sturge Moore."[৬৪]

বলা বাহুল্য, এই চিঠির ভিত্তিতেই নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা বিবেচনা করে তাঁকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। যদিও রবীন্দ্রভবনে এই সংক্রান্ত পত্রাবলীর কোনো উল্লেখ নেই। আসলে ১৯৫৫ সালে কৃষ্ণ কৃপালিনী স্টকহোমে গিয়ে চিঠিটি নকল করেন এবং তাঁর 'Rabindranath Tagore: A Biography' (1962, p.228) গ্রন্থে এটি প্রকাশ করেন। তারপর এই চিঠিটি জনপ্রিয় হয়। এরপর যখন রবীন্দ্রনাথ ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৩ আশ্বিন হাওড়া স্টেশনে নামেন তখন তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে জোড়াসাঁকো শান্তিনিকেতনেও তাঁর অভ্যর্থনের ব্যবস্থা করা হয়।

সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার পাওয়ার বছরেই একটি বিশেষ অধিবেশনে ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আরো 6 জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও সাম্মানিক ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দেয়ার প্রস্তাব করেন। এবং সমগ্র প্রস্তাবটি সিলেটের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। এরই মধ্যে সুইডিস অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য ঘোষণা করেন। তবে এই ঘটনার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লজ্জা রক্ষা করেছিল সে কথা বলা বাহুল্য। কারণ এক বছর আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনী সমিতি রবীন্দ্রনাথের 'পাঠ সঞ্চয়কে ' মনোনীত করেনি। তবে এ কথাও মনে করা হয় বিদেশের রবীন্দ্রনাথের এই খ্যাতিলাভ না ঘটলে, একা ভাইস চ্যান্সেলর এর পক্ষে সিন্ডিকেট ও সিনেটের উভয়ের সমর্থন পাওয়া প্রায় মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবে রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার পাওয়া নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। বেশিরভাগ পত্রিকা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই বলে সুইডিশ একাডেমির সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানালেও কিছু কিছু পত্রিকা যেমন লস এঞ্জেলসের 'টাইমস' ১৫ নভেম্বর একটি সংবাদ প্রকাশ করে, যেখানে টমাস হার্ডি, আনাতোল ফ্রাঁস

প্রমুখো বিখ্যাত সাহিত্যিকদের দাবি উপেক্ষা করে একজন অখ্যাতকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্মান দেওয়াতে বিরোধিতা করেছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাথে সুইডেনের রাজকুমার উইলিয়ামের সুসম্পর্কও নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পাওয়ার খবর যখন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পৌঁছায়, তখন সেখানে আনন্দ উৎসব চালু হয়ে যায় এবং শান্তিনিকেতনের টেলিগ্রাফ অফিসও খুব ব্যস্ত হয় পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই পুরস্কার প্রাপ্তির খবরে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররাও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। আশ্রম বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে লিখেছেন,

> "লক্ষ্য করিলাম, অজিতবাবুর চলাফেরা প্রায় নৃত্যের তালে পরিণত হইয়াছে। ... তার পর ক্ষিতিমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন। স্বভাবত তিনি গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, চলাফেরায় সংযত, কিন্তু তাঁহাকেও চঞ্চল দেখিলাম।"[৬৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আশ্রমের আচার্য। আর তাই তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজকর্ম চারদিন বন্ধ ছিল। আসলে এই সময়ে দেশ-বিদেশ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে অসংখ্য চিঠি ও টেলিগ্রাম আসতে থাকে রবীন্দ্রনাথের নামে। তিনি নিজের হাতে সেই সমস্ত চিঠির উত্তর দেওয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক চিঠির উত্তর নিজের হাতে লিখে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছিল না ব'লে কিছুটা যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

এমনকি রোটেনস্টাইনও রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠাতে ভোলননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮ নভেম্বর (২ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার) তাঁর অভিনন্দন বার্তার উত্তরে লেখেন-

> "The very first moment I received the message of the great honour conferred on me by the award of the Nobel prize my heart turned towards you with love and gratitude. I felt certain that of all my friends none would be gladder at this news than you. But, all the same, it is a very great trial for me. The perfect whirlwind of public excitement it

has given rise to is frightful. It is almost as bad as tying a tin can at a dog's tail making it impossible for him to move without creating noise and collecting crowds all along. I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and the people who never read a line of my works are loudest in their protestations of joy."[৬৬]

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারের সাথে ৭৫ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, তিনি সেই টাকা কৃষি ব্যাংকে জমা রাখেন। সেই কৃষি ব্যাংকের সুদ কাজে লাগতো শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। এছাড়াও বিদেশ থেকেও অর্থাৎ ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকেও বিদ্যালয়ে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য আসার খবর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ক্যাশ বইয়ের হিসাব থেকে।

১৯১৩ সাল ছিল রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার বছর। এই বছরটি রবীন্দ্রনাথকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে একটি নতুন যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। ১৯১৪ অর্থাৎ ১৩২১ বঙ্গাব্দের বছরের প্রথম দিনটি তিনি কাটিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সঙ্গে। যদিও তিনি ১৩২০ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ কাটিয়েছিলেন আশ্রম থেকে বহু দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ভাসমান অলিম্পিক জাহাজে। তাই সেই বর্ষ শুরুর দিনটি ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে 'পথিকের নববর্ষ'। কিন্তু ১৩২১ বঙ্গাব্দে তিনি তাঁর প্রিয় জায়গায় থেকে বছরটি শুরু করেন। ইতিমধ্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সূত্র ধরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁর অবাধ যাতায়াত শুরু হয়। সেই সূত্র ধরে আশ্রম বিদ্যালয়ে বহু বিখ্যাত বিদেশি অতিথিদের আসা-যাওয়া প্রায় লেগেই থাকতো। যদিও নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে থেকেই বিদেশি ব্যক্তিত্বদের আনাগোনা ছিল। তথাপি পুরস্কার পাওয়ার পর সেই সংখ্যাটা যেন অনেকখানি বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন পেটাভেল ও তাঁর স্ত্রী, পিয়ার্সন, অ্যান্ড্রুজ প্রমুখরা একে একে বিদ্যালয়ে নিজেদেরকে যুক্ত করছেন বা নিজেদেরকে যুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্যদিকে আশ্রম বিদ্যালয়েও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে এবং এরকমই একটি পয়লা বৈশাখের দিনে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দেন। যা বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সকলের কাছে স্পষ্ট করে তোলে।

ছাত্রদের উদ্দেশে সেদিন (১৩২১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথ বললেন-

"দেখো, আমাদের এই আশ্রমটি কোথাও প্রাচীর তোলে নি, গণ্ডীর রেখা কোথাও আঁকে নি। একেবারে বিশ্বের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই আশ্রম। সেইজন্য আজ বিশ্বের নানা দিক থেকে যাত্রীর দল এখানে আসছে। যে ছেলেরা এখানে আসছে তাদের বিশ্বের চারি দিকে পথে পথে এই আশ্রম বের করে দেবে, উন্মুক্ত জীবনের পথে তাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে। আশ্রমকে তোমরা ছোটো করে দেখো না। দেখছ না সমুদ্র পার হয়ে ঘরের বেড়া লঙ্ঘন ক'রে, কত কত দূর থেকে আজ অতিথিরা আমাদের নিকটে এসেছেন! আশ্রমের দেবতা যে তাঁদের ডাক দিয়েছেন। সেই যাত্রীদের কণ্ঠ থেকে আজ যাত্রার সঙ্গীত বেজে উঠেছে- তাঁরা এসেছেন, তাঁরা এই ঘাটে এসে উঠবেন, তাঁরা আমাদের বেরিয়ে পড়বার ডাক দেবেন। আজ নববর্ষে তাঁদেরই কণ্ঠের সেই যাত্রার বাণীকে আমি তোমাদের কাছে বলছি, তাঁদেরই উপাসনাতে আমরা যোগ দিচ্ছি। তাঁরা আমাদের ভাষাকে গ্রহণ করেছেন- আমাদের মধ্যে আপন হয়ে এসে আমাদের বেরিয়ে পড়বার কথাটা তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেবেন ব'লেই আমাদের সঙ্গে তাঁরা সকল দিক থেকে এমন করে মিললেন। আজ যে আমরা বিশ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়েছি।... ঐ-যে এসে পড়ল বিশ্বযাত্রীর দল। তারা হাঁক দিয়ে বলল, 'আমরা বেরিয়েছি। তোমরা এখনও বেরোও নি? সমুদ্রের বাধা, জাতীয়তার বাধা, স্বাদেশিক অভ্যাসের বাধা, ধর্মসংস্কারের বাধা আমরা যে পার হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।' আমরা কোন্ লজ্জায় বলব যে, আমরা দরজা খুলে চৌকাট পার হতে সাহস পাচ্ছি না, আমাদের ঘর হতে আঙিনা বিদেশ হয়ে আছে! না, আমরা পথিক পিতার পথিক সন্তান। তিনি আমাদের বন্দী করে পাঠান নি, তিনি আমাদের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে বলেন নি। আমাদের আশ্রমের মধ্যে এই কথাই জাগছে। এই কথাই আজ নববর্ষ নতুন করে আমাদের মনে জাগিয়ে তুলছে।"[৬৭]

এই নববর্ষের দিনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা পাওয়া যায় তৎকালীন শিক্ষক সন্তোষ কুমার মিত্রের লেখা থেকে। তিনি বলেছেন এই সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী সুরুল কুটিরে প্রথম গৃহপ্রবেশ করেন। এই গৃহপ্রবেশের দিন তাঁদের গুরুদেবের সামনের বেদীতে বসিয়ে মন্ত্র পাঠ করেন শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন এবং এই উপলক্ষে আশ্রমের ছাত্রদের ও মাস্টার মশাইদের দুই বেলার নেমন্তন্ন ছিল। তবে তত্ত্ববোধিনীর 'আশ্রম সংবাদ'-এ আবার জানা যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে বিকেলে সুরুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কিন্তু অসময়ে বৃষ্টি আসার জন্য গৃহপ্রবেশের কাজ সঠিকভাবে হতে পারেনি। তবে গৃহপ্রবেশের ঘটনাটি যাই হয়ে থাক না কেন- কৃষি গবেষণার সুবিধার্থে যে ভগ্ন প্রায় সুরুলকুঠি বাড়ি রবীন্দ্রনাথ ক্রয় করেছিলেন, সেগুলো ধীরে ধীরে বাসযোগ্য এবং তাঁর স্বপ্ন পূরণের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, প্রবেশের ঘটনাই তার প্রমাণ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই বছর আশ্রম বিদ্যালয়ে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্বের সমাগম ঘটে। ১৯১৪ এপ্রিল অর্থাৎ ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৬ বৈশাখ অ্যান্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতনে আসেন এবং সেই দিন তাঁর আগমন উপলক্ষে তাঁকে রীতিমত অভ্যর্থনার মাধ্যমে আশ্রমে বরণ করে নেওয়া হয়। ইন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে সচন্দনে ভূষিত করে আশ্রমে বরণ করে নেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাঁকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজের মধ্যে দেখেছিলেন খ্রিস্টধর্ম ও ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। অ্যান্ড্রুজের আগমনের দু-দিন পর অর্থাৎ ২১ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে চিঠি লেখেন যা এই প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য।

> "Andrews is a perfect Godsend to me. My burden has been growing very heavy and I do not know what I would do but for his help. ...Andrews will be able to keep me from harm's way, though I have my doubts. Anyhow, his friendship is a clear gain for me which, I am sure, will last through all my disasters. We are planning to make ready for publication of my short stories during this summer vacation."[৬৮]

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই সন্দেহ একদম ঠিক ছিল। একাধিক কাজের চাপ ও অস্থিরতা এন্ড্রুজকে কখনোই একটি কাজের স্থির থাকতে দিত না এবং তার ফলে গল্পের অনুবাদ প্রকাশ অস্বাভাবিকভাবে বিলম্বিত হয়।

১৯১৪ সালের ১১ বৈশাখ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আসেন আরেক বিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলাল বসু। তাঁকেও রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিক রীতিমেনে বরণ করে নেন। যদিও তাঁর সংবর্ধনাটি হয় ১২ বৈশাখ আম্রকুঞ্জে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণ এবং সেখানকার বিভিন্ন বিষয়ের দিকপাল ব্যক্তিত্বদের সংসর্গ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো ব্যাপকতা ও গভীরতা দিয়েছিল। যে জাতীয়তাবাদকে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী সময় থেকেই তিনি আন্তর্জাতিকতায় মুক্ত করে দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই বিদেশ ভ্রমণকালে আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে দেশিয় বিভিন্ন সমস্যাকে বিচার করার জন্য উৎসাহ দিলেন। এর জন্য তাঁকে

বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখিও হতে হয়েছে বহুবার। এই বিদেশ ভ্রমণ কীভাবে রবীন্দ্র দৃষ্টিকে বদলে দিয়েছিল তার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কৃষ্ণ কৃপালনীর (১৯০৭-১৯৯২) লেখায়। তিনি লিখেছেন-

> "Henceforth he was more a world-citizen than an Indian. He was a world-citizen not because he became world-famous but because he felt with the world.... Tagore made the world's destiny his own and felt deeply the agony if there was suffering or injustice in any part of the world. This world-consciousness which was very real in him exposed him to not a little misunderstanding in his own country."[৬৯]

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানকার সংগীত শিক্ষা। এই সংগীত শিক্ষার খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বর পাথুরিয়াঘাটার রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা W. W. Hornell -এর কাছে তখনকার বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলিতে সংগীতশাস্ত্র পাঠ ও সঙ্গীত চর্চার অনুমতি চেয়ে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করে চিঠি লেখেন। শিক্ষা অধিকর্তা এই বিষয়ে একটি নোট প্রস্তুত করেন এবং ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তা পাঠান। এই বিদ্যালয় পরিদর্শকদের মধ্যে রাজশাহী ডিভিশনের পরিদর্শক ডক্টর পি চট্টোপাধ্যায় শিক্ষকদের গান শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্বীকৃত পথিকৃৎদের নাম প্রস্তাব করেন। তিনি এও স্বীকার করেন যে, গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে হয়তো আর কোনো যোগ্য ব্যক্তি নেই। এই প্রস্তাবটি শিক্ষা অধিকর্তা হর্নেল একটি পত্র মারফত রবীন্দ্রনাথকে জানান তাঁর অভিমত জানার জন্য। এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংগীতের ভূমিকা কী তা তিনি এখানে ভীষণ স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। এর চেয়ে স্পষ্ট করে সংগীতের ভূমিকা তিনি আর কোথাও উল্লেখ করেননি। তাই চিঠিটি এখানে উল্লেখ করা হল।

> "The subject you have mentioned interests me deeply as I regard music as of the first importance in the education of children especially in Bengal. In our own school, music is intimately bound up with every part of our life. Its teaching goes on consciously as

well as unconsciously. But I find it difficult to explain to you formally our instruction where so much is informal. One definite factor on which much depends is the school choir. This is carefully trained and keeps up a standard of vocal music. Each day, morning and evening, the choir goes round the Asram singing Bengali hymns. The rest of the School attain their love of music and pick up the tunes from the choir. In addition the whole School are taught simple hymns which are sung at religious services and there is School-song which all sing in unison. Our dramatic performances always include a number of songs and these become very familiar to the boys. Beyond this, most of their favorite poems are set to music and moreover in our music the different aspects of nature have each their particular tunes or modes. Thus the music as cultivated in our School stands for much more than what can be limited within the bounds of formal teaching. We have been fortunate in having among our teachers some who have themselves and have succeeded in imparting a genuine enthusiasm for music. I have tried, in addition, keeping professional musicians on my staff, but so far without much success."[৭০]

এরপর রবীন্দ্রনাথ সংগীত শিক্ষক হিসেবে আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন এবং তিনি এও বলেন বাংলাদেশের ধর্ম ভেদে অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানের সংগীতে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। তবুও বাঙালিরা ধর্ম নিরপেক্ষ সংগীতের চেয়ে ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ সংগীতের দিকেই বেশি আকর্ষণ বোধ করেন। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে কীভাবে কার্য নির্ধারণ করা যায় তা তাঁদের পরামর্শ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুরেন্দ্রমোহনের মৃত্যু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি এই পরিকল্পনাটির পরিসমাপ্তি ঘটায়।

অন্যদিকে এই সময় বিশ্ব রাজনীতি ছিল এক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে। শুরু হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। একের পর এক দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। ইংল্যান্ড ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যার প্রভাব এসে পড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষতেও। ইংল্যান্ডের এই যুদ্ধ ঘোষণার খবর শান্তিনিকেতনে না পৌঁছালেও, ইউরোপের যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবর পেয়েই রবীন্দ্রনাথ মন্দিরের উপাসনায় মানব ইতিহাসের এই ভয়ংকর পরিণতি থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানান। 'মা মা হিংসী' শিরোনামে 'তত্ত্ববোধিনী'-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় তা প্রকাশ পায়। তারই ধিক্কার তাঁর কাব্যগুলিতেও প্রকাশ পায়।

তবে বেলজিয়ামের মরণাপন সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথের মনে দাগ কেটেছিল। তিনি ছাত্রদের সাথে ওই বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। আসলে মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ এই যুদ্ধের অন্ধকারের মধ্যে মানব মুক্তির উদার সূর্যোদয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে যুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে তীব্র ভাষারূপ প্রকাশ পেয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর শ্রীমতি সেমূরকে লেখা একটি চিঠিতে।

> "In Europe the War-fiend is abroad. The chained barbarism in the heart of the Western Civilisation, fed in secret with the life-blood of alien races, has snapped its chain at last, springing at the throat of its own master. Greed of Empire, worship of force, cruel exploitation of the helpless have had the sanction of science in the West, but the time is ripe when God shall assert his own and man shall learn once again that his best instincts are based on Eternal truth and not upon any doctrine of science."[৭১]

ইতিমধ্যে গান্ধীজি তাঁর দর্শন অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ধর্ম, নীতি ও সাধারণ শিক্ষার আদর্শ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে আসেন, তখন বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক ভারতে চলে আসতে চান। প্রথমে তাঁরা হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তাঁদেরকে আশ্রয় দিতে পারেননি। অ্যান্ড্রুজ মারফত সেই খবর রবীন্দ্রনাথের কাছে এলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরকে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় দেন।

তবে বলা বাহুল্য, গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কাজ কর্মের সঙ্গে ক্রমশ পরিচিতি লাভ করে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন যে, তিনি নিয়মানুবর্তিতা ও সরল জীবন যাপনের পক্ষপাতী হলেও ফিনিক্স বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিকে তিনি সমর্থন করেননি এবং সেই কথাই প্রকাশ পায় ১৫ নভেম্বর অ্যান্ডরুজকে লেখা একটি চিঠিতে।

> "What little I have seen of the Phoenix boys they are very nice, but it is a pity to be so completely nice. They have discipline where they should have ideals. They are trained to obey which is bad for a human being, for obedience is good, not because it is good

in itself but because it is a sacrifice. Those boys are in danger of forgetting to wish for anything, and wishing is the best part of attainment. However they are happy, though they have no business to be happy."[৭২]

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মতাদর্শের ধারণাটি আরো পাওয়া যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লেখা ২১ কার্তিক ১৩২১ বঙ্গাব্দের একটি চিঠিতে। আসলে বিধুশেখর শাস্ত্রী নিজের গ্রাম মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রাচীন প্রথায় টোল খুলে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য আশ্রম বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন এবং 'মডার্ন রিভিউ'-এর অক্টোবর সংখ্যায় তিনি 'The Hindu University: Its conversion into a "Guru Griha" শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন, যেখানে প্রাচীন গুরুকুল প্রথা অবলম্বনে গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষার রীতিকে সমর্থন করেন। সেই প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই চিঠিটি লেখেন এবং সেখানে তিনি তাঁকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন।

"...মডার্ণ রিভিযুতে আপনার লেখাটি পড়িয়াছি- হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে সে কথা আপনার অগোচর নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে লেখালেখি করিয়া কোনো ফল হইবে না- খুব ছোটো করিয়াও যদি কোথাও কাজ আরম্ভ করিতে পারেন তবেই আপনার মত যে সত্য তাহা সপ্রমাণ হইবে। যাহারা সাধারণের কাজ হইতে ভিক্ষা লইয়া কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় তাহারা নূতন পথে চলিতে সাহস করে না কারণ তাহাদিককে সকলের মন জোগাইতে হইবে। যদি কাহারো দিকে না তাকাইয়া দুঃসাহসের তাড়নায় একটা কিছু করিয়া ফেলিতে পারেন তবেই ভালো - নহিলে আপনার কথা কেহ শুনিবে না এবং আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।"[৭৩]

এই কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছেন কিন্তু নিজের আদর্শের সঙ্গে কখনোই আপোষ করেননি। বরং নিজের আদর্শকে অপরের কাছে তুলে ধরে তাকে আরো ছড়িয়ে দিয়েছেন। আশ্রম বিদ্যালয় ক্রমশ বড়ো হতে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ কখনো আদর্শচ্যুত হননি। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে অর্থ সংকট এসেছে বারবার। নোবেল প্রাইজের অর্থের সুদ দিয়ে বিদ্যালয়ের সেই সংকট খানিকটা দূর হয়েছিল বটে। এই টাকায় অধ্যাপকদের বাসস্থান, রান্নাঘর নির্মাণ

ইত্যাদিও হয়েছিল। যদিও সেই টাকাও পর্যাপ্ত ছিল না। ২৬ কার্তিক ১৩২১ বঙ্গাব্দে অ্যান্ড্রুজকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন-

> "I know these school financial difficulties are good for us, but I must have strength enough to extract good. ...The whole Asram must rouse itself from its passive inanity and be ready to meet the danger, ...Even the little boys should not be kept entirely ignorant of our difficulties. They should be proud of the fact that they also bear their own share of the responsibility."[৭৪]

তিনি সবসময় চাইতেন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন হোক। আশ্রম বিদ্যালয় থেকে শারীরিকভাবে দূরে থাকলেও মানসিকভাবে তিনি সবসময় আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত থাকতেন। ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে। তিনি চাইতেন ছাত্র-শিক্ষক সকলেই স্বশক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠুক। অথচ বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা সব সময় রবীন্দ্রনাথের উপদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। এমনকি অধ্যক্ষ সভায় যার মূল কাজ ছিল শিক্ষকদের নিজেদের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা, সেখানেও রবীন্দ্রনাথকে সমস্যা মেটাতে হতো। বলবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এইসব মোটেই পছন্দ করতেন না এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৪ ফাল্গুন (৭ মার্চ, ১৯০৮) অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে।

> "শৃঙ্খলার অভিব্যক্তি বিদ্যালয়ের ভিতর থেকে সহজভাবে উঠচে না। এবং এই সহজভাবের বাধা আমার অস্তিত্ব। বিদ্যালয়ের কতকটা তার নিজের কতকটা আমার। যদি বিদ্যালয় আমার মুখের দিকে কিছুমাত্র না তাকিয়ে নিজের অভ্যন্তরের তত্ত্বটিকে নিজের জোরেই আকার দিতে থাকে তাহলে ওর দুর্ব্বলতা সমস্ত চলে যায়। আমার কি মত, আমি কি বলব, আমি কি চাই এই প্রশ্নটা বিদ্যালয়ের সকল ব্যবস্থার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ব্যাধির মত রয়ে গেছে। কোনটা যে তোমরা করচ এবং কোনটা আমি করচি তা বোঝা যায় না বলে তোমরা পরস্পর সম্পূর্ণ মিলে বিদ্যালয়ের কাজ সম্পন্ন করচ না। যখনি নিশ্চয় জানবে বিদ্যালয় তোমাদেরই তখনই ওর কাজ ঠিকভাবে চলবে।"[৭৫]

একই প্রসঙ্গে তিনি ১৫ নভেম্বর (২৯ কার্তিক) অ্যান্ডরুজকে লিখেছিলেন-

> "It is wicked of me to be away when you are returning to the Asram after your illness; but I feel that you will have a better opportunity of coming closer to the boys and teachers if I am not there, and that will compensate you for my absence."[৭৬]

তবে বিদ্যালয়ের অর্থের ব্যাপারে ছাত্ররা দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলে রবীন্দ্রনাথ তাতে বাধা দিয়েছেন। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে পাটের বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে তীব্র অর্থ সংকট শুরু হয়। আর শান্তিনিকেতনে সেই সময় বেশিরভাগ ছাত্রই ছিল পূর্ববঙ্গের। এর প্রতিকারের জন্য ২২ কার্তিক নেপালচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে একটি রিলিফ ফান্ড গঠন করা হয়। দা মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় 'A Noble Example' শিরোনামে একটি খবরও ছাপা হয়।

> "The boys of Babu Rabindranath Tagore's school at Bolpur have opened a relief fund. They have invited subscriptions to their fund, to be sent to Mr. W.W. Pearson, Santiniketan P.O. In addition to what the boys can personally contribute, they have in a body resolved to save Rs. 40 a month not consuming sugar. This amount will go to the relief fund. By not consuming ghee for three months they will be able to contribute Rs. 500 to their relief fund."[৭৭]

এই খবর পড়ে এলাহাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লেখেন-

> "কাগজে দেখলুম আমাদের ছেলেরা ঘি ও চিনি ছেড়ে দিয়েছে। এই হচ্ছে সাহেবী ছেলেদের নকল। এরকম নকল খুব সহজ। একথা মনে রেখো ছেলেরা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে স্বাধীন নয়। এ সম্বন্ধে কোনটা ত্যাগ করবে এবং কোনটা রাখবে সে তাদের হাতে নেই। ওরা যদি বলে বসে আমরা কিছুকাল পড়া ত্যাগ করে বই কেনা বন্ধ করব এবং সেই টাকা দান করব সে যেমন তাদের অধিকার বহির্ভূত-

ঘি চিনি খাব না বলাও ঠিক তেমনি। তারা আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও আমাদের কর্তব্য হচ্চে তাদের বাধা দেওয়া। ওরা মাছ মাংস খায় না, দুধ অতি সামান্যই পায়- ঘি চিনি ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সৎপন্থা হচ্চে না খেয়ে টাকা বাঁচানো নয় কাজ করে টাকা রোজগার করা। কুয়ো খুঁড়ুক, রাজমজুরের কাজ করুক, জল তুলুক, সাত-ই পৌষের কাজে লাগুক, সেই পুকুরের গর্ত বুজিয়ে দিক, বাসন মাজুক- এতে ওদের অকৃত্রিম উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাবে- এতে কোনো দিকেই ওদের কোনো অনিষ্ট নেই।”[৭৮]

শুধু এই উপদেশ টুকুই নয়, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের ওখানকার জমিতে চাষবাসের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিশ্বের সমস্ত বিদ্রোহ বা বিশ্বাস থেকে ছাত্রদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র পুথি পড়ার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, তাদের বিদ্যাকে ও জ্ঞানকে তিনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথ অন্যদের থেকে অসামান্য হয়ে উঠেছেন। আশ্রম বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য হয়েছে। তবে সে মনোমালিন্য কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অজিত কুমার চক্রবর্তী সঙ্গেও ১৩২১ বঙ্গাব্দের দিকে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের খানিক ফাটল দেখা দেয়। এই সময় আশ্রমে গৃহ সমস্যার জন্য অজিত কুমার চক্রবর্তীকে বাধ্য হয়ে স্ত্রী এবং কন্যাকে গিরিডি পাঠাতে হয়। তাঁর এই ক্ষোভ স্ত্রী লাবণ্যলেখাকে পাঠানো একটি তারিখহীন চিঠিতে ফুটে উঠেছে।

“এন্ড্রুজ বরাবর আমায় কি রকম ভালবাসা দেখিয়ে এসেছেন তা তো তুমি জান। কিন্তু এখানে তিনি আসবার পরেই আমি তাঁর ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলুম। তিনি বাংলা শেখা নিয়ে ও গল্পগুচ্ছ অনুবাদ করা নিয়ে মহা ব্যস্ত- আমি ভেবেছিলুম যে তাই জন্যে বোধহয় তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাননা। কিন্তু তা যে নয় তা আমার একটু একটু মনে হয়েছিল। হঠাৎ যখন সুরুলে যাবার ও প্রতিমাকে পড়াবার প্রস্তাব হল তখন এন্ড্রুজ তাতে খুব উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করলেন- আমি তাতে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কারণ পিয়ার্সন তাতে এত দুঃখিত হয়েছিলেন অথচ এন্ড্রুজ এত খুসী এটা আমার একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল। আমি কি তখন জানি যে তিনি প্রতিদিন আমাকে বিদ্যালয় থেকে সরাবার জন্য গুরুদেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্ছেন। তিনি গুরুদেবকে ক্রমাগত বোঝাচ্ছিলেন যে আমার সাহিত্যানুরাগই অত্যন্ত প্রবল, আমি সে জন্যে পড়াতে বা বিদ্যালয়ের কষ্টসাধ্য কাজ করতে চাই

না- পড়ানো ফাঁকি দিই- ইত্যাদি ইত্যাদি। ... আমি অবশ্য গুরুদেবকে তখনি লিখলাম যে আমাকে বিদ্যালয় থেকে সরাবার ইচ্ছা হলে স্পষ্ট বলাই ভাল- সুরুলে একটা অজুহাত ক'রে পাঠানো কেন? আমার কাছে সাহিত্য প্রিয় না বিদ্যালয় প্রিয় তা নিয়ে আমার তর্ক করতে ইচ্ছা নেই- অতএব যেদিন আমায় জানাবেন যে তোমায় চাই না, সেদিনই চলে যাব। গুরুদেবের সঙ্গে কথাবার্তাও তারপর হয়ে গিয়েছে- আমি বলেছি- আমি হতভাগ্য- অযোগ্য আমায় যদি আপনি ভুল বুঝবেন এই সম্ভাবনাই থাকে তাহলে আমায় বিদায় করে দিন। তিনি শুধু বললেন- আমি ভুল বুঝেছিলুম।"[৭৯]

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ে উৎসব ছিল একটি অন্যতম অঙ্গ। এই উৎসবগুলি উপলক্ষে বিভিন্ন ভাষণে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষা, মানবতা, ধর্ম ইত্যাদি একাধিক প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঘ মেলায় রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রীর উৎসব' ভাষণটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সাম্প্রদায়িক ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি মাঘ উৎসবকে যাত্রীর উৎসব বলে অভিহিত করেন এবং দুঃখ করে বলেন অসাম্প্রদায়িকতার কথা কেবল বইয়ের পাতাতে পাওয়া যায়। আর তাই মানুষ তার বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বারবার সাম্প্রদায়িক হিংসাকে ব্যবহার করে।

"সম্প্রদায় আপনার বাইরে আসতে চায় না সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশমান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান, সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়। ... যে চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে। যে চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনার সম্প্রদায়কে পাচ্ছে। ... সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। ...সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব- মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর- এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না? ... রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন; বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে।"[৮০]

এই প্রসঙ্গে তিনি ১২ মাঘ এন্ড্রুজকে একটি চিঠিও লেখেন-

> "It was a very severe strain on me but it was wanted of me and I am glad that I was not allowed to avoid it to follow my personal inclination."[৮১]

একদিকে আশ্রম বিদ্যালয়, অন্যদিকে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব এই সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অর্থ সংক্রান্ত দিক দিয়ে বারবার সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। এই সময় জামাতা নগেন্দ্রনাথকে একাধিক চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। তখন নগেন্দ্রনাথের আয় মাসোহারার ৩০০ টাকা। অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ তখন বিদ্যালয়ের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা দেনা করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে নগেন্দ্রনাথের মাসোহারা থেকে বিদ্যালয়ের দেনার সুদ বাবদ মাসে ৫০ টাকা কেটে নেওয়ার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়কে কখনো বঞ্চিত রাখতে চান নি। তার জন্য তাঁকে অনেক সময় পরিবারের কাছের মানুষগুলির সঙ্গেও অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করতে হয়েছে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রর 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'র সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। যদিও তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন ইনি ডাক্তার মৈত্রের অনুরোধেই সভায় যুক্ত হয়েছিলেন। ফলে এই সভার লোকহিতের পরিণতিতে তিনি খুব একটা বিশ্বাসী ছিলেন না।

১৯১৫ সালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড প্রাপ্তি। লর্ড হার্ডিঞ্জ এন্ড্রুজ ও মাইকেলের সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্যারাকপুরে আমন্ত্রণ করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই আমন্ত্রণ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একাধিক উপরোধ তাকে তা করতে দেয়নি। তাই পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে অর্থাৎ ২৩ জুন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'নাইটহুড' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। যদিও লর্ড হার্ডিঞ্জের সাহায্যেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সরকারি কর্মচারীদের সন্তানেরা পড়তে পারবে না এই অমূলক নির্দেশটি বাতিল হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ হার্ডিঞ্জের কাছে কৃতজ্ঞও ছিলেন। এখানে ভুল হতে পারে যে হার্ডিঞ্জ এবং রবীন্দ্রনাথের এই পারস্পারিক সম্পর্ক হয়তো তাঁকে নাইটহুড উপাধি এনে দিয়েছিল। আসলে তা নয়। ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথের প্রতি কখনোই এত ভক্তিভাবাপন্ন ছিলেন ছিল না। তাহলে তিনি আরো আগে অর্থাৎ ১৯১৪ সালেই সেটি পেতে পারতেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারতবাসীরা

ইংরেজদের ওপর ইতিমধ্যেই ক্ষিপ্ত। ভারতবাসীকে তুষ্ট করার জন্য এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের একটা সূক্ষ্ম চাল। কিন্তু বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সূক্ষ্ম সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি সেই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব হয়নি। না হলে তাঁকে পরবর্তীকালে নাইটহুড ত্যাগ করে আরো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো না।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়। তিনি শিক্ষাকে নিয়ে শুধু পরীক্ষাই করেননি, তাকে রূপ দিতে চেয়েছেন আশ্রম বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে। তিনি যখন বারবার বিদেশে যাচ্ছেন, সেখানেও তিনি খুঁজেছেন সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার ভালো দিকগুলি এবং তাঁর সেই সন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া গেছে একাধিক প্রবন্ধে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ অর্থাৎ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে (প্রথমবার আমেরিকায় যান) তিনি যখন চ্যালফোর্ডে, তখন লিখলেন ‘শিক্ষাবিধি’ নামক একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি আসলে জাতীয় শিক্ষা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন, আদতে তিনি কীরকম শিক্ষাব্যবস্থা চান তার যেন সামান্য আভাস এই প্রবন্ধটিতে তিনি দিয়েছেন।

প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলেছেন, বিদেশ আসার সময় অন্যান্য বিভিন্ন কাজের সঙ্গে এই দায়িত্ব নিয়েও তিনি আসেন যে, এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার ভালোদিকগুলি জেনে সেগুলি নিজের দেশে খাটে কিনা তা দেখে নেওয়া। তার জন্য তিনি সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, এমনকি কাগজপত্রে সেখানকার শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে কিছু আলোচনা পাঠ করা এগুলিও করেছেন। আসলে শিক্ষা সম্পর্কে বহু যুগ ধরেই বিভিন্ন দ্বন্দ্ব চলে আসছে। কারোর মতে শিক্ষা যথেষ্ট সুখকর হওয়া উচিত, আবার একদলের মধ্যে শিক্ষার মধ্যে দুঃখ না থাকলে সে শিক্ষা ঠিক শিক্ষা হয় না। একদলের মতে বিষয়কে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করে নেওয়াই হল শিক্ষা, আবার আর একদলের মতে, নিজের শক্তি প্রয়োগ ক’রে সাধনার দ্বারা বিষয়কে আয়ত্ত করাই শিক্ষা। তবে রবীন্দ্রনাথ এও বুঝেছিলেন যে, কোনো দলই সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বা ভুল নয়। আবার এই দুইয়ের মাঝখানে পথকে পাকা করে নিয়ে চলাও প্রায় অসম্ভব। আবার দেশ-কাল-জাতিভেদে শিক্ষার পথও ভিন্ন হয়।

> “কিন্তু যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং

ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো? যেমন নদী সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঁধাঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে; খেয়া নৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা-নাপিত বন্ধ। সুতরাং, ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।”[৮২]

এই অবস্থায় ভারতীয় সমাজ কালের উপযোগী শিক্ষা দিচ্ছে না। বরং দু'চার হাজার বছর পূর্বের শিক্ষা দিচ্ছে। তাই মানুষ গড়ে তোলার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বিদ্যালয় বড়ো সেই বিদ্যালয়ই ভারতে বন্ধ। ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে। অথচ ব্রাহ্মণ হওয়ার সময় ব্রহ্মচর্য নেই, কেবলমাত্র প্রহসনময় নিয়মগুলি থেকে গেছে। জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠান ঘুচে গেলেও বর্ণভেদ তখনো তার সমস্ত বাধা নিষেধ নিয়ে সমাজে স্বমহিমায় উপস্থিত। এইভাবে সমাজ জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির একটা বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় একটা কাল বিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই যেন আবদ্ধ হয়ে আছে। তাই সমাজ জীবন প্রবাহের সঙ্গে যেখানে সামঞ্জস্যের পথ খোলা রাখেনি সেখানে যে কালের ব্যবস্থা অচল বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরপর রবীন্দ্রনাথ সামাজিক বিদ্যালয় ছেড়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় বা রাজকীয় বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন।

“সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পর রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানীগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রীর বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না, ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা।”[৮৩]

ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার শুরুর দিনের কথা ফিরে দেখলে দেখা যায় ডিরোজিও, রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার প্রমুখরা শিক্ষক হিসাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁরা কখনোই ছাঁচে ঢালা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ও আলো-বাতাসহীন নিয়ম নীতির জালে জর্জরিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন ভারতবর্ষে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীর মুক্ত করতে। এই প্রসঙ্গে তিনি গুরু-শিষ্যের আত্মীয়তাই যে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে প্রাণ নিয়ে আসতে পারবে সেকথা জানাতেও ভোলেননি।

রবীন্দ্রনাথের নারী শিক্ষা নিয়ে যে মতাদর্শ, সেটি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে ‘স্ত্রীশিক্ষা’ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির শুরু হয়েছে শ্রীমতি লীলা মিত্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি চিঠির উল্লেখ নিয়ে। যার বিষয় ছিল পুরুষের প্রয়োজনের নিরিখে স্ত্রী শিক্ষার বিচার। অর্থাৎ বিভিন্ন দল বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে পুরুষের প্রয়োজনেই নারীর শিক্ষা প্রয়োজন এবং রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবে এই নীতির বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে-

> “বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।”[৮৪]

শিক্ষা প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের ব্যবহারিক শিক্ষার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন।

> “...শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষ কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?”[৮৫]

রবীন্দ্রনাথ যে সেইসময় শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন আর দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন সেটাও সত্যি নয়। সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক সভায় বিভিন্ন বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে, ভারতবাসীর তৎকালীন অবস্থার বিভিন্ন কারণ, এমনকি সেই অবস্থা থেকে মুক্তিরও উপায় যেন তিনি ভাষণগুলিতে বলে দিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন ভারতবাসীকে। তবে সেই দেশপ্রেমের পথ, বঙ্গভঙ্গ সময়কার রাজনৈতিকবোধ থেকে যে সম্পূর্ণ আলাদা প্রবন্ধগুলি পাঠ করলেই সেকথা বোঝা যায়। সেই রকম একটি প্রবন্ধ হল 'কর্মযজ্ঞ' (১৯১৪), যা 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত। হিতসাধন মন্ডলের প্রথম সভাধিবেশনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতার সারমর্মর লিখিত রূপই হল এই প্রবন্ধ।

দেশের তৎকালীন অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, দীর্ঘকাল ভারতবাসী নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে। অথচ অন্যান্য দেশ কীভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তার সমস্তটাই ভারতবাসীর জানা। কিন্তু ভারতবাসী কেবল নিজেদের দুর্বলতাকে বিশ্বাস করে, অকর্মণ্য হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। দেশজুড়ে কাজের বিশাল ক্ষেত্র, অথচ ভারতবাসীরা সে বিষয়ে উদাসীন এবং সে বিষয়ে প্রতিকারেরও বিন্দুমাত্র কোনো প্রচেষ্টা নেই। রবীন্দ্রনাথ শুধু এই নৈরাশ্যের চিত্রটি তুলে ধরেই ক্ষান্ত থাকেননি। ভারতবাসীর কর্তব্যগুলিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রাণের বেহিসেবে আনন্দের মাধ্যমে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে দিতে বলেছেন। নিজের ভেতরের আনন্দময় শক্তির ওপরে ভরসা রাখার কথা বলেছেন। নিজেদের অন্তরে যে রাজা আছেন, সেই রাজাকে শ্রদ্ধা করে রাজভক্তি আনতে বলেছেন।

তবে কর্তব্যবোধে বিভিন্ন রকম বাধা থাকে। সেই বাধার মুখোমুখি হয়ে ভারতবাসী যাতে পিছিয়ে না পড়ে, তার জন্যও তিনি সচেতন করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন কীভাবে ব্যর্থতাও সফলতা আনতে পারে সেই পথ বলে দিয়ে।

> "আমরা এতদিন পর্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বলছি না। বস্তুত অবাধ সফলতায় মানুষকে দুর্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরছে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারছে না-

এর জন্য নালিশ করব না। এই বারংবার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্ছে কোন জায়গায় আমাদের যথার্থ দূর্বলতা। আমরা এটা দেখতে পেলাম যে, যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েছি সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যে-সব দেশ বড়ো আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখি নি।"[৮৬]

এই বক্তৃতায় তিনি তাঁর পূর্ববর্তী বক্তার ইউরোপের প্রসঙ্গটি তুলে ধরে বলেছেন –

"কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি- আমরা শয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না, পরিবার-পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা, সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের দেশে দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান, দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন- বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহুদিনের, বহুযুগের; আমাদের প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত, একে মুক্ত করো! কে করবে। দেশের যৌবন-যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।"[৮৭]

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও তিনি সেদিন নিজেদের দুর্বলতাগুলিকেই শক্তি করে দাঁড়াতে বলেছেন এবং এই মুকুটময় দারিদ্র অবস্থাতেই প্রত্যেকে দেশের বীরপুত্র হয়ে উঠতে পারে, সেই কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

"আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মুগ্ধসংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, আমরা ছোটো নই। আমরা বড়ো, এ কথা হবেই প্রকাশ- নইলে এ সংকট আমাদের সামনে কেন।"[৮৮]

১৯১৮ সালের রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হল ‘ভূমিলক্ষ্মী’। বীরভূম জেলা থেকে ‘ভূমিলক্ষ্মী’ নামে একটি কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ভূমিলক্ষ্মীর সাফল্য কামনা করে আসলে দেশের কৃষিক্ষেত্র, কৃষক ও তৎকালীন পরিস্থিতির এক সুন্দর তাৎপর্যময় ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধগ্রন্থে পরবর্তীকালে স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথ এই সময় একদিকে যেমন শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়, একদিকে বিদেশ ভ্রমণ, বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তেমনি তিনি যে মাটিকে কখনো ভোলেননি, ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমি যে কৃষিক্ষেত্র তাকে ভোলেননি, তার প্রমাণ এই প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে, জমি একসময় ভারতবাসীর সকল স্বাচ্ছন্দ্য মেটাতো, সেদিন আর নেই। কিন্তু কৃষকরা মনেপ্রাণে চাইছেন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন অন্য কোনো পেশায় যায়। রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, তাঁর ছোটোবেলায় তিনি দেখেছেন, কৃষককে অতিরিক্ত জমি দিতে চাইলে তারা তা নিতে চাইতো না।

আশ্রম বিদ্যালয়ের রূপ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে দর্শন কাজ করেছিল, সেই দর্শন বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে উঠে এসেছে। ‘শিক্ষা’ প্রবন্ধগ্রন্থটি এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধের মধ্যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত ‘বিদ্যা সমবায়’ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, বিদ্যা কখনো এককভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে চলে না, তার জন্য দরকার দেশ-কাল-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সকলের মিলন বা সমবায়।

ভারতীয় বিদ্যা সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা বোঝানোর জন্য, শুরুতেই তিনি একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে একটি এলাহাবাদের ইংরেজি বাংলা স্কুলের ছাত্র সুন্দরভাবে ‘রিভার’-এর সংজ্ঞা বললেও গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থলে ব’সে থাকা এই ছেলেটি কোনো রিভারের উদাহরণ দিতে পারেনি। আসলে সেই ছাত্রটির ধারণা ছিল, পরের ভাষায় শেখা কোনো জিনিস কখনো আপন হতে পারে না, বা সেই গ্রন্থে থাকা কোনো বিষয় ভারতবর্ষেও থাকতে পারে না। আর সেখান থেকেই তার ধারণা হয় অন্য সকল জাতির দেশ আছে কেবল তার দেশ নেই। তাই ছাত্ররাও যেন মনে মনে গৃহহীন এবং গৌরবহীন হয়ে পড়ে। অথচ কোনো একসময় কোনো বিদেশি জিওগ্রাফি পণ্ডিত যদি তাকে বলে যে তার একটি প্রকাণ্ড দেশ আছে, সেই দেশে বড়ো বড়ো নদী-পাহাড়-পর্বত সবকিছুই আছে, তখন সে আর নিজের

সংযম ধরে রাখতে পারেনা। তখন তার মনে হয়–“আর সকলের দেশ দেশ মাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।”[৮৯]

আর রবীন্দ্রনাথ এখানেই ভুলটি ধরেছেন। আসলে ছাত্রটি কোনো সময়েই সঠিক ছিল না। তার পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সেটি হয়তো মার্জনীয়। কিন্তু যখন সে শিক্ষিত হয়ে মূঢ়তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে তখন তা হাস্যকর এবং অনিষ্টকর। ভারতীয় বিদ্যা সম্পর্কেও ভারতবাসীর ধারণা সেরূপ। অর্থাৎ প্রথমে ভারতবাসীর ধারণা- ভারতে বিদ্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, যা আছে সেটা কেবলমাত্র অপদার্থ। কিন্তু এই ভারতবাসীরাই বিদেশি পণ্ডিতের মুখে ভারতের বিদ্যার বাহবা শুনতে পেলে ভারতীয় বিদ্যাকে আবার দেবী বলে মনে করে। আসলে ভারতবাসী বিদ্যাকে দুভাবে একঘরে করে রেখেছিল। প্রথম পথ ছিল অবজ্ঞার দ্বারা আর দ্বিতীয় পথটি হল অতি সম্মানের দ্বারা। কিন্তু বলাবাহুল্য এই দুই পথই একই ফল দেয়। এই দুই মিলে তেজ নষ্ট করে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জাপানের রাজা শোগুন আর মিকাডোর ইতিহাসও তুলে ধরেছেন।

শিশুকে যেমন রক্ষা করতে হলে শিশুকালে ধাত্রীর কোলে রাখতে হয়, ঘর দোলনা সমস্ত কিছুই নিরাপদে রাখতে হয়। কিন্তু তাকে মানুষ করতে গিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘরের কোনে আড়ালে রাখলে তার ফলও যে উল্টো হয় সেটাও সবার জানা দরকার। অর্থাৎ শৈশবে শিশু স্বতন্ত্র সুরক্ষিত থেকে পরিপুষ্ট হয়ে উঠলেও বয়সকালে সেই সুরক্ষা ও নিভৃত বেষ্টন তাকে অকর্মণ্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তোলে। বিদ্যার ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটে। শুধু ভারতীয় বিদ্যাই নয়, চিন, মিশর, গ্রিস, রোম প্রভৃতি সমস্ত দেশের বড়ো বড়ো জাতিও এক সময়ে নিজেদেরকে সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে রেখে নিজের সভ্যতাকে বড়ো করে তুলেছিল। তবে সেযুগের সমাপ্তি ঘটেছে।

> “পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।
>
> অতএব আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।”[৯০]

ভারতীয় বিদ্যার রূপটি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ভারতীয় বিদ্যার নদীর মূলত চারটি শাখা, যথা- বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ এবং জৈন। সেখানেও কাল ও দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন শাখার সঙ্গে এই বিদ্যার শাখা মিলিত হয়েছে। কখনো তিব্বতের বিদ্যার সঙ্গে, কখনো আবার বাইরের থেকে আসা মুসলমানদের জ্ঞান ও ভাবের ধারাকেও এই বিদ্যা নদী বহন করে এসেছে।

সুতরাং ভারতীয় বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় ইউরোপীয় বিদ্যাকেও স্থান দেওয়া দরকার। কারণ ইউরোপীয় বিদ্যার বন্যা সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে দেশকে প্লাবিত করছে। তাকে আর কোনোভাবে আটকে রাখা সম্ভব নয়। যারা এর বিরোধিতা করে আসলে তারা ভারতকে সত্য বলে বিচার করে না।

> "সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ- বশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ- ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়া যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"[৯১]

শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে তাঁকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এক সময় আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি একটি মুসলিম ছাত্রকে ভর্তির আগ্রহ দেখালেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। ১৯২২ সালে রচিত কালান্তরের একটি উল্লেখযোগ্য

প্রবন্ধ 'হিন্দুমুসলমান' পাঠ করলে বোঝা যায়, আসলে এই হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, তার সমাধানের উপায়, এবং ভারতবাসীরা একে কী চোখে দেখে সেই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ এক বর্ষার দিনে শান্তিনিকেতনে বসেই লিখেছিলেন। এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি তাঁকে এতটাই উৎপীড়িত করেছিল যে বর্ষার সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে গিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্য কলম ধরেছিলেন।

হিন্দু মুসলমানের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে তিনি খ্রিস্টান ধর্মের কথাও নিয়ে এসেছেন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের একটি সুবিধা হল তাঁরা আধুনিক যুগের বাহন, তাঁদের মনের মধ্যে মধ্যযুগের অন্ধকার সেভাবে উপস্থিত নয়। এক্ষেত্রে তিনি আবার ইউরোপীয় এবং খ্রিস্টান শব্দ দুটিকে সমার্থক হিসেবে ধরতে মানা করেছেন। আসলে ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ হয়, ধর্মমতই তাঁদের প্রধান পরিচয় হয়। এই প্রবন্ধে হিন্দু এবং মুসলমানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হিন্দু জাতিও অনেকটা মুসলমানদের মতোই। তাঁরাও ধর্মের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।

> "হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়-অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু, সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু, মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।"[৯২]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর আচারের এই বাড়াবাড়ি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন জমিদার হিসাবে। তিনি দেখেছেন মুসলমান প্রজাকে কীভাবে অশুচি হিসেবে ধরা হতো। কাছাড়ি বাড়িতে অন্যান্য প্রজারা জাজিমের উপর বসলেও মুসলমান প্রজা এলে তাকে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে বসতে দেওয়া হতো। রবীন্দ্রনাথের

মতে এই আচার অবলম্বীদের অন্য মানুষকে অশুচি গণ্য করার মতো কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এক ভীষণ বাধা হয়ে দাঁড়ায় । অথচ ভারতবর্ষের মতো দেশে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্রিত হয়েছে। হিন্দু এবং মুসলমানের পার্থক্য গুলির ক্ষেত্রে প্রথম পার্থক্য হিসেবে তিনি বলেছেন ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, হিন্দুর প্রবলতা আচারে। অন্যদিকে মুসলিমরা আচারে তত প্রবল নয়, কিন্তু ধর্মমতে তারা প্রবল। অর্থাৎ একপক্ষের দ্বার যেখানে খোলা, অন্য পক্ষ সেদিকে দ্বার বন্ধ করে রেখেছে।

অন্যদিকে আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী একটা বেড়ার মতো করে গড়ে তুলেছে। যার কাজ হল নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান করা। বলা বাহুল্য মিলনের পক্ষে এরকম কৌশলের রচিত বাধা আর কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে হয়তো সৃষ্টি হয়নি। এবং এই বাধা কেবলমাত্র হিন্দু এবং মুসলমানের নয়। যে মানুষ স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায় তারাও সেখান থেকে পৃথক এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু সমস্যা কেই তুলে ধরেননি সমস্যার সমাধানের আভাস টুকু দিয়ে গেছে প্রবন্ধের মধ্যেই। ইউরোপীয়দের মতো ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানকেও জ্ঞান এবং সত্য সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেদের গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে রাখা চলবে না, তাহলে তাতে কারোরই উন্নতি নেই।

> "আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে-ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে-তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।"[৯৩]

অন্যদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে থেকেও অস্থির হয়ে উঠেছেন। বহুদিন পর্যন্ত তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঠিক খবর পাননি। শুধুমাত্র সংবাদপত্রে দেশের যতটুকু খবর প্রকাশিত হচ্ছিল তার বাইরে আর কিছু জানতে পারছিলেন না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হওয়ার পর এণ্ড্রুজ সাহেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৭ এপ্রিল দিল্লি যান। তার ঠিক পরদিন ১৮

এপ্রিল গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ২০ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে (পত্রটি খব সম্ভবত এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা) সেই মুহূর্তে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও গান্ধীজির সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার নিয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তিনি লিখেছেন,

> "Dear friend,
>
> I believe our outcry against the wrongs infected upon us by our governing power is becoming more vehement than is good for us. We must not claim sympathy or kind treatment with too great an insistence and intensify... He who causes suffering becomes small when his victims have the power to rise above it by their heroism of fearlessness. There is the lesson which Gandhi has been ?? preach to his countrymen. And now when his attempt to hold the banner of moral power above those of the brute forces has met with an apparent failure, when those of us who desire success without having to pay for it and other who wait interminable days to reap their harvest of comfortable politics from the soil of sycophancy are hastening to disown him with shrill protestation of innocence, Gandhi personality shines before us with a greater glory than when his light was blurred by the dust-storm of popularity. And this one fact of his presence in us ? reconciles us to whatever suffering we are passing through and whatever others we have to face. The expression of the best ideal of the age need not grow fat in bulk butt let it become immortal with its truth. And the rejection of it by a number of timid people overwhelmed with terror by no means proves its rejection by our history. Please convey my namaskar to Mahatmaji in these days of his trial."[১৪]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি তখনও বিস্তারিত খবর পাননি। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'-তে বলেছেন-

"পাঞ্জাবের এই অনাচার অত্যাচারের বিন্দু-বিসর্গ সংবাদ বেসরকারী মহলে প্রকাশিত হয় নাই। জনশ্রুতির মতো দুই একটি খবর আসিতেছে — তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণের উপায় নাই। ৮ জ্যৈষ্ঠ বা প্রায় মাসাধিককাল পর্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের মন কী উদ্‌বিগ্ন ও কী উত্তেজিত তাহার আভাস পাই। ওই দিনে ভানুসিংহের পত্রাবলীর কয়েকটি ছত্র হইতে — "আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয়না... পাঞ্জাবের... দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।

জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর হত্যাকাণ্ড খবর কবি কাহার কাছ হইতে পান স্পষ্ট জানা যায় না। কথা ছিল ২৯ মে শান্তিনিকেতনে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে কবি পৌরোহিত্য করিবেন। সেইভাবে নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়। কিন্তু পাঞ্জাবের খবর পাইয়া সে সমস্ত বাতিল করিয়া কলকাতা চলে আসেন।

কবি শান্তিনিকেতন স্থির হইয়া বাস করিতে পারিলেন না; ১২ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।... লেখক সেদিন কলিকাতায় রামানন্দবাবুর দ্বিতলের বারান্দায় উভয়কে কথাবার্তা কহিতে দেখিয়াছিলাম — কী গম্ভীর, কী স্তব্ধ মূর্তি। তখন আমরা জানিতামও না যে পঞ্জাবে কী ঘটিয়াছে এবং কবি রামানন্দবাবুর সহিত কী পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন।

কবি কলিকাতায় আসিয়া পঞ্জাব-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কোনো নেতার সাড়া পাওয়া গেলো না। শেষে ২৯ মে রাত্রে ভাইসরয়কে লিখিলেন তাঁহার চরমপত্র।"[৯৫]

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দিনটির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"... রাতে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয়নি — হয়তো চারটে হবে — উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম।... আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, পড়ো। বড়লাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি।...

কবি তখন বললেন, — সারারাত ঘুমাতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজী রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময়ে সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এই অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদসভা ডাকো।

আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে – বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয়না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললেন, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সব চেয়ে ভালো শুধু আপনার সভা ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে হবে করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোকে জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা আমার নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।"[৯৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন ইংরেজদের এই পৈশাচিক ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ উঠুক। সারা দেশজুড়ে শুরু না হোক অন্তত দেশের কোনো একটি প্রান্ত থেকেই এই প্রতিবাদের গর্জন শুরু হোক। আন্দোলন, মিটিং-মিছিল, দেশের নিদারুণ বিপদে সবার আগে ছুটে আসা কবি-সাহিত্যিকদের কাজ না। এগুলি দেশের নেতৃত্বের প্রাথমিক কাজ। অথচ রবীন্দ্রনাথের মতো একজন মানুষকে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিবাদ সভা ডাকার জন্য অনুরোধ করেও নিরাশ হতে হয়। অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে, প্রচণ্ড মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শেষে নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করাকে প্রতিবাদের শেষ উপায় হিসেবে বেছে নিলেন। সারা ভারতের পৌরুষ যখন কঠোর শাস্তির ভয়ে নপুংসকের ভূমিকা নিয়েছে, তখন বাংলার এক কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল নির্ভীক ধিক্কারবাণী-

"5, Dwarakanath Tagore Lane'

Calcutta, May 31st, 1919.

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbance has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments,

barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of Indi, and the universal agony of indignation roused in the heart of our people has been ignored by our rulers, possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the nobler vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of millions of my countrymen, surprised into dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully,

Rabindranath Tagore”[৯৭]

আশ্রম বিদ্যালয় ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯-১৯১৯) পর্বটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে বোধহয় সবচেয়ে ঘটনা বহুল সময়কাল। তবে সেই সবকিছু ছাপিয়ে, একাধিক বহির্মুখী কার্যকলাপের পাশাপাশি তিনি এক নিগূঢ় অন্তর্মুখী সাধনাতে ধীরে ধীরে লিপ্ত হচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন 'আমার সঙ্গে অধীশ্বরের' মিলন। এই সময়কালের মূল বহির্মুখী কার্যকলাপ মূলত শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাইতো তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ে ভারত এবং বহির্বিশ্বের জগতেও চলছিল একের পর এক ঘটনাবহুল পট পরিবর্তনের পালা। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে নিজেকে এক নতুন কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করেন। তাঁর আস্থা ছিল খণ্ডতায় নয়, পূর্ণতায়। তিনি খুঁজে নিচ্ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের আদি ও মূলভাব মিলন বা ঐক্যকে। ভারতের উন্নতির জন্য এই ঐক্যই প্রধান ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সে মিলন ধর্মের, জাতির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের। স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তা তৎকালীন সময়ে সমাদৃত হয়নি। এটিও হয়তো তাঁর রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। এই সময়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। পাশাপাশি শিলাইদহ ও পতিসরের কাজগুলিও দেখাশোনা করছিলেন। একজন মানুষ কতটা পরিশ্রমী হলে একসঙ্গে এতো কাজ করতে পারেন! আজকের দিনে প্রযুক্তি মানুষের জীবন-যাপনকে অনেক সহজ-সরল করে দিয়েছে, বিনিময়ে নিয়ে নিয়েছে মানুষের উৎসাহ, কৌতূহল ও পরিশ্রম করার মানসিকতা। আর ঠিক সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়, উদ্যম ও উদ্যোগ আজ সকলের কাছে এতো বেশি করে প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বলতে মনে করতেন যে, যেখানে বিশ্ব প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একসঙ্গে মিলে একটি যোগাসন রচনা করবে সেটাই সত্যিকারে আশ্রম। আর সেরকম একটি ক্ষেত্রকেই তিনি শিক্ষাদানের আদর্শ স্থান বলে মনে করতেন। তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবন সভ্যতা এবং সেই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মচর্য-র সংযমকে তাঁর আশ্রমেও গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে গোটা শিক্ষিত সমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকেই ভারতবাসীর জন্য উপযোগী বলে মনে করছেন। কারণ ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজকর্মচারি তৈরি করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনই চাননি ভারতবাসী লেখাপড়া শিখে চাকর তৈরি হোক, তিনি চেয়েছিলেন ভারতবাসী শিক্ষিত হয়ে নিজের

অধিকারটা বুঝে নিক আর কোনোকিছুর জন্যে যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকে, নিজেদের ভালো-মন্দ যেন নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কখনো উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি, তা সে প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যের। কিন্তু আজ উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার জন্য সমগ্র বিশ্ব অশান্ত ও জর্জরিত, চারিদিকে শুধু যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, বিঘ্নিত হচ্ছে বিশ্ব শান্তি। অথচ ভারতীয় ঐতিহ্য এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐতিহ্যের সেই সার কথাটি তুলে ধরেছেন বারবার, যা আজ নতুন করে আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে যখন জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তখন রবীন্দ্রনাথই সমগ্র জাতিকে পথ দেখান।

রবীন্দ্রনাথ, যিনি এই সময়ে একের পর এক প্রিয়জনের মৃত্যুর সাক্ষী থাকছেন, রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য সমালোচিত হচ্ছেন বারবার কিন্তু কোনো কিছুর জন্যেই তাঁর দেশের মঙ্গলের কাজ থেমে থাকেনি। বরং তিনি আরো বেশি করে দেশের উন্নতির কথা ভেবেছেন। তার প্রমাণ শিলাইদহ, পতিসর, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন। আশ্রম বিদ্যালয়ের দর্শনগত কাঠামোটি তিনি একাধিক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। আর সেই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তিনি তাঁর যথা সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছেন, এমনকি তার জন্য স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বিক্রি করেছেন। আবার কখনো নোবেল পুরস্কারের টাকা বিদ্যালয়ের কাজে লাগিয়েছেন। আবার কখনো হৃদয়কে শক্ত করে কেবলমাত্র খরচ কমানোর জন্য আশ্রম বিদ্যালয় থেকে প্রিয় শিক্ষক এবং কর্মীদের বিদায় জানালেও অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই আশ্রম বিদ্যালয় তাঁর কাছে ছিল সন্তানসম। তাই প্রিয়জনদের কাছ থেকে এর বিন্দুমাত্র অবহেলা বা লাঞ্ছনার আশঙ্কা দেখলে সেখান থেকে তিনি খুব সহজেই নিজেকে সরিয়ে নিতেন। শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের দিকে ছিল তাঁর বিশেষ নজর। তাই ইতিহাস বইয়ের ছোটো ছোটো গল্পগুলো সংগ্রহ করে ছেলেদেরকে পড়াতে বলেছেন। যা ইতিহাস পরিচয়ের সাথে সাথে বালকদের মনে মুগ্ধতা ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে। মূল পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ এই ইন্টারনেটের যুগে তথ্য ভাণ্ডার যখন মানুষের হাতের মুঠোয়, মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের বোধ নেই, তারা হারিয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের বোধও, সেই সময় আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে আশ্রম বিদ্যালয়ের জীবনযাপন ও সহপাঠ্যক্রমের গুরুত্ব। শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ শিক্ষকদের ক্ষেত্রটিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী সর্বাধিক বেতনভোগী শিক্ষককেও তিনি নিযুক্ত করেছেন। এই পর্বে তিনি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়লেও আশ্রম বিদ্যালয় নিয়ে তাঁর উৎসাহ ও চর্চা কিন্তু কখনোই বন্ধ

ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এলেও ইংরেজের বিষ নজর থেকে তিনি সরে আসেননি। তাই জোড়াসাঁকোর পাশাপাশি আশ্রম বিদ্যালয়েও ইংরেজ গুপ্তচরের আনাগোনা লেগেই থাকতো। এমনকি ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে আইন জারি করে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি বন্ধ করতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিদ্যালয়টি ছিল জীবন সাধনার ক্ষেত্র। এ শুধু একটি স্কুল ছিল না, এখানেই তিনি পেয়েছিলেন মুক্তির স্বাদ। তিনি তাঁর প্রিয় আশ্রম বিদ্যালয়টিকে উপনিষদের চিন্তাভাবনার প্রয়োগ ক্ষেত্র করতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হৃদয়ের ভক্তির সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। আজ যখন পাশ্চাত্যমুখী আড়ম্বরপূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির রমরমা তখন মানুষ ভুলছে হৃদয়ের শিক্ষা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার নামে নামছে অস্বাস্থ্যকর ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতায়। তাই রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয় আজ আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিল নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিল। যেমন গোখলের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিল, মদনমোহন মালব্য প্রস্তাবিত কাশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ইত্যাদি। আর এই সময়ের রচনায় বারবার হিন্দু কথাটি উঠে এসেছে। এখানে তিনি সেই হিন্দু সমাজের কথা বলেছেন যেখানে বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান মুসলমানরাও হিন্দু সমাজের অংশ হতে পারতো। হিন্দু বলতে হিন্দুত্বের ধারণাটিকে আরও বড়ো করতে চেয়েছেন। তাই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, হিন্দুত্বের ধারণাটি যদি আরও বড়ো করে তোলার চেষ্টা করে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, তাহলে তা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যখন মানুষ ধর্ম বলতে বিচারহীন আচারকেই বোঝে, রবীন্দ্রনাথ শতাধিক বছর পূর্বে সেই আচারকে বাদ দিয়ে তার মহত্ত্বকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি প্রথমে বিশ্বকে স্থান দিতে চেয়েছেন, চেয়েছেন বিচ্ছিন্নতার-বিরোধের অবসান। অথচ বর্তমানে বিরোধই প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই কালপর্বেই তিনি সম্মানিত হয়েছেন নোবেল পুরস্কারে। আবার ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্যাগ করেছেন 'নাইটহুড' উপাধি।

আজ আড়ম্বর প্রিয় মানুষ নিজের সৃষ্টিকে, কৃষ্টিকে, যোগ্যতাকে যখন বারবার পুরস্কারের মাপকাঠিতে মেপে নিতে চান, তখন তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে পথ দেখাতে পারেন। নিজের মুক্তি সাধন

নয়, দেশ এবং দেশবাসীকে মুক্তির পথ এনে দিতে চেয়েছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি শুধু আজ নয় আগামী কয়েক শতাব্দী ধরেও সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র

১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩৮৬।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পূর্ব ও পশ্চিম", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪২২।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পূর্ব ও পশ্চিম", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪২৩।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পূর্ব ও পশ্চিম", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪২৩।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পূর্ব ও পশ্চিম", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪২৪।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পূর্ব ও পশ্চিম", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৪২৭-২৮।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সদুপায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৮৩।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সদুপায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৮৫-৮৬।

৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৬।

১০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৬।

১১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭।

১২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৭।

১৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৩।

১৪। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ,* কবির চান্দ (অনূদিত), ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩০।

১৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫১।

১৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৩।

১৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪।

১৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৪।

১৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।

২০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৮।

২১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭০।

২২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৫।

২৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৬।

২৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৬।

২৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৭।

২৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০২।

২৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০২।

২৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৫।

২৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৫-০৬।

৩০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১১০।

৩১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১১৩।

৩২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১১৩।

৩৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১১৪।

৩৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৩১।

৩৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৩৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১২৪।

৩৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৫১।

৩৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৫২।

৩৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৫৮।

৪০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৫৮-৫৯।

৪১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৬০।

৪২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৮৮।

৪৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২০০।

৪৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২১৫।

৪৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২১৭।

৪৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২২০।

৪৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২২৫।

৪৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৪২।

৪৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৪৬।

৫০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৪৬।

৫১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৪৭।

৫২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫৩-৫৪।

৫৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫৫।

৫৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫৫।

৫৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫৬।

৫৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫৭।

৫৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৭৮।

৫৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৯৩।

৫৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩১৩।

৬০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৩৭।

৬১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৩৮।

৬২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৭০।

৬৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪১৬।

৬৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪২৪।

৬৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৪৫।

৬৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৪৫।

৬৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ১।

৬৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪।

৬৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৬।

৭০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ২০।

৭১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩২।

৭২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৬।

৭৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬।

৭৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৯।

৭৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৯।

৭৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৯।

৭৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫০।

৭৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫০।

৭৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫৪।

৮০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫৮।

৮১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫৯।

৮২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিক্ষাবিধি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৬৪।

৮৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিক্ষাবিধি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

৮৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্ত্রীশিক্ষা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৭১।

৮৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্ত্রীশিক্ষা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৭২।

৮৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কর্মযজ্ঞ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৮২।

৮৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কর্মযজ্ঞ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৮৩।

৮৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কর্মযজ্ঞ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৮৪।

৮৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যাসমবায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৫।

৯০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “বিদ্যাসমবায়”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৮৭।

৯১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “বিদ্যাসমবায়”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৭।

৯২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “হিন্দুমুসলমান”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৭২।

৯৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “হিন্দুমুসলমান”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৭৩।

৯৪। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।

৯৫। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৩।

৯৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪১৭-১৮।

৯৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪১৮-১৯।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদের নতুন দিক: বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন (১৯১৯-১৯২৯)

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রয়োগক্ষেত্র হল শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন। এই দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিনি তাঁর দর্শনের প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের ভিতকে যেন মজবুত করতে চেয়েছেন। একদিকে যেমন তিনি শিক্ষার প্রাচীন ভারতীয় ধারাটিকে নতুন মোড়ক দিয়ে তাতে প্রাণ ফেরাতে চেয়েছেন অন্যদিকে ভারতবর্ষের প্রাণ ভ্রমরা স্বরূপ গ্রামগুলিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ক্ষেত্রটি করে তুলেছেন শ্রীনিকেতনে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম একদিকে যেমন 'বিশ্বভারতী' রূপে বিশ্বের কাছে ভারতীয় শিক্ষাধারার দরজা খুলে দিয়েছিল অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনৈতিককে মজবুত করার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে এক নতুন পথ দেখাচ্ছিল 'শ্রীনিকেতন'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনোদিনই শুধুমাত্র একটি চিন্তা বা কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি। সময়ের প্রয়োজনে তিনি যেমন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন, কলম ধরেছেন বা পল্লি-উন্নয়নের কাজ করেছেন তেমনি শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান সর্বাধিক। বিশেষ করে শিক্ষা সংস্কার ও সমস্যাকে তিনি তাঁর জীবনের রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিলে এবং প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁর 'নাইটহুড' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন সেই তিনি যেন হঠাৎ করে শান্ত হয়ে যান। তাঁর নিস্তব্ধতার কারণ কী ছিল তা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দেশের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ও মানবিকতা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিয়ে যেন নীরবে এ কথাই বলে যায়, "বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার তা হয়ে গিয়েছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতি তাঁর জন্যে নয়। তিনি শুধুমাত্র দেশ-কাল-পরিস্থিতির প্রয়োজনে কখনো নিজের দেশের জন্য আবার কখনো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকটের দিনে তিনি তাঁর চিন্তা ভাবনাকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন মাত্র। তিনি

নিজেকে কখনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা কোনো পদে আসীন করতে চাননি। তিনি শুধুমাত্র একজন দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী মানুষ হিসাবে দেশের বিপদের দিনে তার সমস্যা ও সমাধান নিয়ে চিন্তা করেছেন।

এমনকি দেশকে ব্রিটিশ শাসন ও অত্যাচারের হাত থেকে স্বাধীন করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস ও বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনগুলির মতো ও আদর্শের সঙ্গে তিনি কোনোদিন কিছুতেই একমত হতে পারেননি। এক্ষেত্রে তিনি যেন সারা জীবনই নিঃসঙ্গ এক প্রাণ।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের আচার-আচরণ দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচণ্ড আহত ও মর্মাহত হন এবং এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর থেকে তাঁর সমস্ত আশা, ভরসা ও শ্রদ্ধা একেবারেই উঠে যায়। তাই তিনি আবার তাঁর কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা পর্যালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ করে স্থির করেন যে, বাস্তব গঠনমূলক কাজের মধ্যেই তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যোমকে নতুনভাবে কাজে লাগাবেন। আর এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে 'বিশ্বভারতী'র ধারণা তৈরি হয়। তিনি সারা বিশ্বকে একটি নীড়ের মধ্যে আনতে চাইলেন।

১৯২০ সালের এই সময় থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য আন্দোলন শুরু হয় এবং ভারতবর্ষের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি ও আদর্শ কী হবে সেই নিয়ে শুরু হয় যুক্তি-তর্ক ও আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে একটি বিষয় লক্ষ করেন, যে ভারতবাসী এতদিন ইংরেজি শিক্ষাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ বলে মনে করতেন সেই দেশবাসীই আজ ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুরোনো শিক্ষাবিধির উপর অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

ফলে এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের শিক্ষা সমস্যা বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন। যথা অসন্তোষের কারণ, বিদ্যার যাচাই, বিদ্যা সমবায়।

'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'-র (১৩২৬) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'অসন্তোষের কারণ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন-

> "আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। ... যতকাল

ছাত্র সংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সেদিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানের পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিতো না।"[২]

অসন্তোষের আরেকটি কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষ অনেকদিন ধরেই ইংরেজি পড়ছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভারতবাসী এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিক ও সৃজনশীলতার নিদর্শন দেখাতে পারেনি। ভারতবাসীর এই না-পারার কারণকে তিনি উপলব্ধি করে বলেছেন-

"আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম"। ... বর্তমান শিক্ষা প্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারিনা। ... অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।"[৩]

ভারতবাসী দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ফলে তাদের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ও রসাস্বাদনের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। তাদের সবকিছুর জন্যেই বিলেতের শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতো। যা কখনোই সুখদায়ক হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'-র (১৩২৬) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিদ্যার যাচাই' প্রবন্ধে এর কারণগুলি উল্লেখ করেছেন।

"ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘকাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোন বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার

করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারিদিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে, তার কারণ, যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন-

"আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই।"[৫]

উনবিংশ শতকের শেষদিকে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি ও দর্শন নিয়ে ভারতবাসীর মধ্যে এক প্রকার জাতীয় অহংকার দেখা দেয়। এই জাতীয় অহংকার দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'-র (১৩২৬) আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার তীব্র সমালোচনা করে রচনা করেন 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন-

"শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব পিছনে; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বললেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতদের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর সকল বিদ্যা মানবী আমাদের বিদ্যা দৈবী।... ইংরেজিতে যাহাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই... অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোন-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা সহস্তে করিয়া দিয়েছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না।"[৬]

‘বিদ্যাসমবায়’ প্রবন্ধের শেষ দিকে এসে তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার আহ্বান জানিয়েছেন।

> “একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড় জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড় করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। এই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে। ... অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যা সমবায়ের একটি বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।”[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, কংগ্রেসের জাতীয় ঐক্য বা মিলনের আহ্বানের মতো রাজনৈতিক ঐক্যও শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাই তিনি আরো বলেন,

> “এই কারণবশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিনা। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য,আত্মার ঐক্য। ভারতের সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড় বলিয়া জানতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে।”[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে শুধুমাত্র এইরকম সমালোচনা করেই চুপচাপ বসে থাকেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর এই ধরনের প্রবন্ধগুলি থেকে বিশ্বভারতীর শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তি কী হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই সময় সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সাংগঠনিক কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের যারা ক্লাস নিতেন তাঁরা হলেন এন্ড্রুজ সাহেব, বিধুশেখর শাস্ত্রী, কপিলেশ্বর মিশ্র, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ অতি দ্রুত শিক্ষার্থীদের মন জয় করে ফেলেছিলেন এবং তাঁর অবস্থান ছিল শিক্ষার্থীদের অন্তরের অন্তস্থলে। তাঁর অতুলনীয় বাচনভঙ্গি ও পঠন-পাঠন রীতি খুব কঠিন, দুরূহ, দুর্বোধ্য ও নিরস বিষয়ও হয়ে উঠতো সহজ, সরল ও প্রাণবন্ত।

প্রসঙ্গত, ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিশ্বভারতীতে সংগীত, নৃত্য, শিল্প প্রভৃতি ললিত ও চারুকলার কয়েকটি বিভাগ খোলা হয়।

মানুষের জ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি, সৌন্দর্যবোধ, রসবোধ প্রভৃতির বিকাশকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের সামগ্রিক বিকাশ বলে মনে করতেন। এটাই ছিল বিশ্বভারতীর শিক্ষা দর্শনের মূল কথা এবং এগুলো তিনি এই সময়ের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ্য করেছেন-

> "মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিস জাতিবিশেষে যাহার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকারভেদ নাই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগাকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। ...কিন্তু হৃদয় বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই আর থাকাই শ্রেয়। ...এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোন স্থান নাই। ...বস্তুতঃ আনন্দপ্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দপ্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনীশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। ...যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে-জাতি কাজ করিতেও ভোলে। ...আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোক ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।"[৯]

তাই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও বলেন-

> "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষার তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে, এই আমাদের সংকল্প হোক।"[১০]

১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রমুখ শিল্পীদের হাত ধরে ‘কলাভবন’ এবং অজিত কুমার চক্রবর্তী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভীমরাও শাস্ত্রী, সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী ও নকুলেশ্বর গোস্বামীর সহায়তায় ‘সঙ্গীত ভবনের’ শুভারম্ভ হয়।

১৯১৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্কুলের পঠন পাঠনের বিষয় নিয়ে রোদেস্টাইনকে একটি চিঠি লেখেন।

> “I am sure you would enjoy watching me giving lessons to a class of the average age of fourteen, explaining to them in Bengali Shelly's Hymn to Intellectual Beauty and his Ode to the West Wild. I can assure you that now they understand those two poems in all their depth of truth and wealth of imagination.”[১১]

পাশাপাশি তিনি তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিটিও বিশ্লেষণ করেছেন।

> “It is my experience that, if properly treated, the lessons that are difficult are more stimulating and attention compelling, and thus in a manner easier in the long run, than obviously easy lessons. The claim upon the students' mental concentration itself and their glow of pride in overcoming difficulties are of greater help for the growth of mind than anything that may be in the lessons themselves.”[১২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার সেল্ফ লার্নিং-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতির কোল থেকে শিখতে বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩) বেনারসে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার নির্বাচন করা হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মদনাপল্লিতে অবস্থিত Wood National College -এ জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। এই বার্তায় তিনি বলেন-

> “Every morning the messenger of light comes to the flower buds with the message of hope for their blooming. Every morning the same light also comes to us raising our curtain of sleep. The only word which it daily repeats to us is: "See." But what is that seeing which is as the flowering of our sight? The scene which the light brings before

our eyes is inexpressibly great. But our seeing has not been as great as the scene presented to us, we have not fully seen. We have seen mere happenings, but not the deeper truth, which is measureless joy. And yet the morning light daily points its finger to the world. It bends down upon a grass blade with a smile that fills the sky and says to us, "See."[১৩]

এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমবায় সমিতি গড়ে তোলার কথাও চিন্তা করছেন এবং একদিন ছাত্র ও শিক্ষক সবাইকে ডেকে সমবায় সমিতি সম্পর্কে আলোচনাও করেন। সমবায় সমিতি নিয়ে তিনি এতটাই উৎসাহিত ছিলেন যে, ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে এবিষয়ে একটি চিঠি পাঠান। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন-

"আমরা বিদ্যালয়ে একটি Co-operative Store খুলিবার চেষ্টায় আছি। আমাদের এখানে বৎসরে ৩০/৪০ হাজার টাকার জিনিস কেনা হয় সুতরাং যদি কোন ব্যবস্থা করিতে পারি তবে অনেক অপব্যয় বাঁচিবে।"[১৪]

অন্যদিকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানাবিশকে অন্য একটি পত্রে লেখেন-

"আমাদের latest খবর হচ্ছে এই যে আমরা এখানে Co-operative Store খুলে ছেলেদের মধ্যে এই আইডিয়াটা ছড়াবার চেষ্টায় আছি।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯১৮ সালের ২০ ডিসেম্বর 'শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড' নিবন্ধীভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী কাজ কর্মগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হল এই সমবায় ভাণ্ডার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শান্তিনিকেতনে একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার চালু করছেন ঠিক সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে বাংলাকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্নাতকোত্তর স্তরে স্বদেশি ভাষায় পড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এই পদক্ষেপের ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক Dr. I. Jehangir Tarapourwala (১৮৮৪-১৯৫৬) ২২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগের বিষয়ে মতামত জানতে চান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দিত হলেও খুব একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে হয়েছে বাংলা ভাষা তখনও উচ্চশিক্ষা লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠার উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তিনি আরও বলেছিলেন যে, তৎকালীন সাহিত্যিক ভাষা তখনও তরল অবস্থায় ছিল, নতুন চিন্তা ও অনুভবকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছিল মাত্র।

> "And, therefore, our language, the principal instrument for shaping and storing our ideals, should be allowed to remain much more plastic than it need be in the future where standards have already been formed which can afford a surer basis for our progress"[১৬]

এরপরে তিনি আরো লেখেন যে, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নোত্তর ও মনের ভাব প্রকাশ সবই করে থাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে। অর্থাৎ লেখাপড়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় বইপত্র মাতৃভাষাতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের মাতৃভাষার পরিচয় ঘটে থাকে নিরন্তর। তাই তাদের বিশেষ শ্রেণির পণ্ডিতের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হয় না। কাজেই তাদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন হয় মাতৃভাষার ইতিহাস শব্দ ভাণ্ডারের জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু ভারতে স্বদেশি ভাষাগুলি এখনো পর্যন্ত সেই বিস্তার লাভ করে উঠতে পারেনি। তাঁর মতে, বাংলা ভাষায় পড়ার ব্যবস্থা শুধুমাত্র একটি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। লোকসাহিত্য ও উপভাষার চর্চা শ্রেণিকক্ষের বাইরে হওয়াও খুব দরকার। এর ফলে আর কোনো কৃত্রিম আদর্শ ছাত্রদের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো একটি পাঠ্যপুস্তককে নির্দিষ্ট

করাতেও আপত্তি করেছেন। অবশ্য এর কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করে উচ্চ শ্রেণির ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের অভাব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ৯ অক্টোবর দুর্গা পুজোর ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবারে কলকাতায় আসেন। এই সময়ের রবীন্দ্রনাথের কার্যকলাপ নিয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ডায়েরিতে ৮ অক্টোবর লিখেছেন-

> "We arrive at Calcutta this afternoon from Bolpur, where we spent the whole of the school term, father busy teaching boys & writing text books in English. Just before coming down while talking with me & Mr. Andrews father got quite excited over the idea of making the Bolpur institution a truly representative Indian educational colony, where boys from all the provinces of India would come together to get an education & a culture that is national & at the same time modern. The different colonies of boys would keep to their own peculiar customs & manners where they do not conflict with our national ideals, & they would thus get a training from their childhood to respect each other in spite of outward differences. In India, unity cannot mean unification; we must get used to this from the beginning. Bolpur institution should not be sectarian, or provincial."[১৭]

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ডায়েরি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ এই সময় কোনো আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের কথা ভাবছেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি দেশিয় আশ্রম গড়ে তুলতে চাইছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এসে তাদের নিজেদের প্রথা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে এই আশ্রমে থেকে তাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে পারবে। তাঁর এই ভাবনার আভাস আগেও পাওয়া গেছে। ১৯১৬ সালে ১১ অক্টোবর একটি চিঠিতে আমেরিকা থেকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনের ওই ছোট্ট বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, স্থাপন করতে হবে সর্বজাতির মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্ররূপে, সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করে ভবিষ্যতে বিশ্ববাসীর মহামিলন ক্ষেত্র হবে এই বোলপুর। এটাই ছিল তাঁর অন্তরের ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাভাবনা ও অদূর ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হতে খুব বেশিদিন সময় লাগেনি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৯ অক্টোবরে ডায়েরির আরেকটি লেখা থেকে।

> "Many Gujrati & Marwari gentleman- many of those who have sent their boys to Santiniketan- came to our house to confer with father. Father explained them his ideas regarding the future of the school, which appealed to them & they grew quite enthusiastic. They promised to help as best as they could. Rs. 500/- was handed over by Mr. Keshabjee for the technical department shortly to be opened."[১৮]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই করছিলেন এবং ছোটোখাটো আকারে তার কিছুটা শুরু করেছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি কিছুতেই তাঁর মনের মতো করে এই টেকনিক্যাল বিভাগ থেকে সাজাতে পারছিলেন না। ভাবতে অবাক লাগে যে, একজন নোবেল জয়ী কবি-স্কুল পরিচালনার জন্য, স্কুলে নতুন নতুন বিভাগ খোলার জন্য, বিজ্ঞান সাধনার জন্য আর্থিক সাহায্যের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন এবং মানুষ রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। আশ্রম বিদ্যালয়ে টেকনিক্যাল বিভাগটি খোলার জন্য তৎকালীন সময়ে (১৯১৮ সালে) ৫০০০/ টাকা দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন একজন পার্শি বণিক- বোমানজি। তবে বোমানজি তাঁর এই দানের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথকে গোপন রাখার জন্যে অনুরোধ করেন।

এই অর্থনৈতিক সাহায্যের পর রবীন্দ্রনাথ ১৬ সেপ্টেম্বর (১৯১৮) বোমানজিকে একটি পত্র মারফৎ তাঁর কৃতজ্ঞতা জানান। রবীন্দ্রনাথ লেখেন-

> "Rathi informs me of your very generous offer to help my Institution in caring on its technical department. Inspite of all my difficulties I have ventured to start it, struggling on with it against obstacles. Your timely offer of aid comes to me as a great relief."[১৯]

বোমানজি রবীন্দ্রনাথকে কথা দিয়েছিলেন তিনি প্রতিবছর ৫০০০/ টাকা টেকনিক্যাল কাজে ব্যবহার করার জন্য পাঠাবেন। এই দানের টাকা যে বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র টেনকিক্যাল কাজেই খরচ করা হয় তার একটি যথার্থ প্রমাণ হল, পরের মাসেই অর্থাৎ অক্টোবরের ১৩ তারিখ রথীন্দ্রনাথ ১৫০ ডলার দিয়ে ১০ ফুট ব্যাসের দুটি Red Cross Wildmill কেনার জন্যে জর্জ ব্রেটের কাছে অর্ডার পাঠান। এই উইন্ডমিলগুলি বিদ্যালয়ের ইঁদারা থেকে জল তোলার জন্যে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক যে উদ্দেশ্যে এই উইন্ডমিলগুলো এনেছিলেন তা সার্থক হয়নি। কারণ এই যন্ত্রদুটি নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোনো কৌতূহলই সৃষ্টি হয়নি। তাই তিনি 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন-

> "একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো করে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।"[২০]

অনেকে ধারণা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভুল ধারণা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেন। তিনি সেই সময়ে সুদূর কুষ্টিয়া (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে ঠাকুর কোম্পানির একটি পুরনো ডায়নামো-সহ ইঞ্জিন শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। সেটি বসানো হয় পুরোনো ছাপাখানার পশ্চিম দিকের একটি ঘরে এবং বিদ্যুতের তার টানার জন্য আশ্রমের মধ্যে অনেক লম্বা লম্বা কাঠের থাম বসানো হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম বিদ্যালয় নিয়ে যে কতখানি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন ব্যয়বহুল কার্যকলাপ দেখলেই বোঝা যায়। তিনি সেই সময় ৫০০ টাকা খরচ করে ছাত্রাবাসের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেন। কারণ ছাত্রদের যেন রাতের বেলায় পড়াশোনায় কোনো অসুবিধা না হয়। ৬ শ্রাবণের (২২ জুলাই, ১৯১৮) ক্যাশ বই থেকে জানা যায়, "বোলপুরের বাড়ীতে Electric আলো পাখা ফিট করার জন্য ৫০০/ টাকা"[২১] খরচ হয়েছে। যদিও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে ছাত্রাবাসে বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল পরের বছর।

যাতায়াতের সুবিধার জন্যে শান্তিনিকেতনে একটি মোটরবাস কেনা হলে আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের এক অংশের মধ্যে একটু দ্বিধা দেখা দেয়। বাস কেনাকে তাঁদের কাছে আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শের পরিপন্থী ও আড়ম্বর বলে মনে হয়। শিক্ষক ও ছাত্রদের এই ধরনের মনোভাবের কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ দ্বারিকের দোতলায় সবাইকে ডেকে একটি সভার আয়োজন করেন।

এই সভায় তিনি সবাইকে বোঝালেন যে বর্তমান আধুনিক যুগে বসবাস করতে গেলে প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিতেই হবে। শুধু প্রাচীন ভারতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। প্রাচীন ভারতের যা কিছু ভালো সেগুলো গ্রহণ করতে হবে কিন্তু সবই বর্তমান আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। অর্থাৎ "পুরাতন ভালোকে আমরা গ্রহণ করব নূতনের অর্থ দিয়ে।"[২২]

এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞানের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন যে, বিজ্ঞান যেন মানুষের মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে ফেলে। বিজ্ঞান যেন মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে না ওঠে। তাই তো তিনি এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে তাঁর সাবধানবাণী উল্লেখ করেছেন।

বীরভূমের কৃষি-সমিতি সমবায় 'ভূমি-লক্ষ্মী' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করত। প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন সিউড়ির বাণী প্রেসের কর্ণধার মুরলী মোহন দত্ত। এই পত্রিকা থেকে জানা যায় বীরভূম কৃষি-সমিতিটি স্বদেশি আন্দোলনের সময় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সমিতির কবে ও কীভাবে যোগাযোগ হয় তা ঠিক জানা না গেলেও সমবায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর আগ্রহ দেখে এই পত্রিকার সম্পাদকেরা তাঁর কাছে লেখা প্রার্থনা করেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঐ পত্রিকায় চাষিদের সর্বপ্রকার সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। তিনি লেখেন-

> "আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয় - সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই যে 'ভূমিলক্ষ্মী' কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অনুভব করিতেছে। বস্তুত

লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না।”[২৩]

১৯১৮ সালের ৮ পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ১৯তম বার্ষিক সভাটি ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই। এদিনে সভাপতির ভাষণের মুখ্য বিষয় ছিল আদর্শ শিক্ষার স্বরূপ। এই সভা শেষ হওয়ার পরই শিশু বিভাগের ঘরগুলির পিছনে মাঠেই বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হয়- ৮ পৌষ ১৩২৫ (২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮)। এই ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছিল।

বিশ্বভারতীর শিলান্যাস অনুষ্ঠানের বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন-

> “At the Paus Utsab this year many people from the other provinces of India had come. On the 8th of Paus the foundation stone of the বিশ্ববিদ্যালয় was laid before this assembly after father had explained in a short lecture the aims & purposes of this institution. This lecture has been printed in a pamphlet form for distribution. About ten thousand rupees of donation was promised on the spot.”[২৪]

যদিও এই পুস্তিকাটির কোনো সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’-র বৈশাখ ১৩২৬- সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিশ্বভারতী’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার বলেন যে, শিক্ষা হবে সত্যের জন্য। ভারতীয়দের মানসিক ও আত্মিক বিকাশের জন্যে শিক্ষা দরকার। কিন্তু ভারতবাসী কেরানি হওয়ার জন্য শিক্ষিত হতে চাইছে। যে শিক্ষা মনের উন্নতি সাধন করতে পারে না সেই শিক্ষা তো কলের মাধ্যমেও হতে পারে। আর এই কলের শিক্ষার মাধ্যমে কখনো মানুষ গড়া সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ হল বিদ্যার উৎপাদন করা আর গৌণ কাজ হল বিদ্যা দান করা। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় তাকেই বলা চলে যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে সেই সমস্ত মনীষীদের আহ্বান করার কথা বলেছেন যাঁরা নিজের শক্তি ও সাধনার দ্বারা

নতুন নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কার করবেন। তবেই দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সত্যিকারের লক্ষ্য পূরণ হবে, কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে নকল করে নয়।

'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে তিনি বলেন-

> "... সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ আছে। ... আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।
>
> এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"[২৫]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শিক্ষার এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন তা সকলেরই জানা। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, তিনি এবার শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনাটিকেও বাস্তবায়িত করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। বিশ্বভারতী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পরিকল্পনা কী ছিল তা জানা যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি চিঠি থেকে। রথীন্দ্রনাথ ১৭ এপ্রিল (১৯১৯) শিলং থেকে শ্রীমতি সীমূরকে এই পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ একটি চিঠিতে লিখে পাঠান।

> "Last year was a busy one for us at the school. Ideas for its expansion in different directions have developed very rapidly. It was merely a school upto this time- it is going to be a much bigger thing in the future. Bigger not in buildings, gymnasiums and playgrounds- but bigger as a centre of higher education and culture. The school will be only a part of a more comprehensive scheme of education covering all the activities of

our life, in fact a true University- not exactly in European sense- but more like what we had in ancient Nalanda, an educational colony which will be in direct touch with all the requirements of the modern man. Here we are going to have colonies of teachers and students from every province of India and though each will retain their own individuality and learn to respect each other's individual differences, they will all be brought up in an atmosphere where the ideal of life would be held far above any feeling of the sect community or narrow nationality. Here the intellectual life of the community will run parallel with the social and the material."[২৬]

এরপর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটিও বিবৃতি আকারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন-

"The economic activities will be just as much a means of education as the lectures in the classroom. Music and art will have an important place in the programme. The method of education will be quite different from that followed in our present-day universities, specially in India. In every important branch of learning there will be one or two teachers who by the merit of their own research or work attract students to live with them and while learning help in carrying out the work they are engaged in. We have already got chairs in Buddhist and Jaina Philosophy, in Sanskrit, in the modern languages of India. Nandalal Bose is coming from the next session to start the nucleus of a national school of art. A technical department has been opened with mechanical and electrical workshops, a printing house and a weaving school. Land is being acquired to start a farm. A co-operative store has been organised, and soon a co-operative Rice mill and oil mill will follow."[২৭]

রবীন্দ্রনাথ এই কর্মসূচিতে যেন কিছুটা ধীরে ধীরে চলার পক্ষপাতি ছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর এই নতুন উদ্যোগে যদি কোথাও কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে তিনি তা সহজেই সংশোধন করে নিতে পারবেন।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান। কোথাও গিয়ে হয়তো তাঁর মনে শান্তিনিকেতনের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করার ইচ্ছা ছিল। কারণ সেই সময়ের ক্যাশবই সেই রকমই সাক্ষ্য দেয় এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি থেকেও সে কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিঠিতে লিখেছেন-

> "বম্বাই হয়ে ঘুরে বক্তৃতা দিতে দিতে যাব ঠিক করেচি। মাঝে মাঝে টাকা পাঠাচ্ছি নিশ্চয়ই পেয়েছিস।"[২৮]

রবীন্দ্রনাথ এই সময় শান্তিনিকেতনের জন্য জমি কিনে তার আয়তন ও শ্রীবৃদ্ধি করতে চাইছেন। কারণ দক্ষিণ ভারতে তিনি শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যে সাড়া পেয়েছেন, তাতে শান্তিনিকেতনকে আর 'লক্ষ্মীছাড়া' অবস্থায় রাখতে চাইছেন না।

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারতে গিয়ে শান্তিনিকেতনে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যে উৎসাহ ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন তাতে তিনি অভিভূত। যদিও তাঁকে অনেক ঘুরতে হচ্ছে এবং পরিশ্রম করতে হচ্ছে তা সত্ত্বেও তিনি খুবই আনন্দিত, তাঁর পরিশ্রম সার্থক। শান্তিনিকেতন তার সত্যিকারের রূপ না পেলে তা যে কত বড়ো লজ্জার তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্পনাও করতে পারেন না। তাই তিনি তাঁর চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন-

> "বাইরের লোক ওকে যেরকম করে দেখ্চে আমাদের অধ্যাপকেরা এখনো সেরকম করে দেখ্তে পাচ্চেন না। সেই জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন আছি।"[২৯]

এই সময়ে তিনি বিভিন্ন হলে বক্তৃতা থেকে যে অর্থ সাহায্য পান তার পরিমাণ নেহাতই কম নয়। কোথাও ৫০০ টাকা, কোথাও ১০০৮ টাকা তো কোথাও ১৫৭৫ টাকা, যা শান্তিনিকেতনের সামগ্রিক উন্নতির কাজে ব্যয় করা হয়।

অন্যদিকে এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও তার ঢেউ তখনও বর্তমান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়রা ইংরেজদের সাহায্য করেছিল স্বরাজের আশায়। কিন্তু যুদ্ধের পর ভারতবাসী স্বরাজের পরিবর্তে পেল 'রাওলাট আইন'। ফলে দেশবাসীর মোহভঙ্গ হয় ও সারাদেশ আবার এই বিষয়টি নিয়ে উত্তাল হয়ে

ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই আইনকে বেআইন আখ্যা দিলেও তাঁর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে তখন অনেকেই দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। এই সময় আরও বেশকিছু কারণের জন্য তিনি তাঁর মাদ্রাজ যাওয়ার পরিকল্পনা পরিবর্তন করেন ও ব্যাঙ্গালোরে যান। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল মাদ্রাজের মানুষ হয়তো এই মুহূর্তে তাঁর বক্তৃতা শুনবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪ মার্চ 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকাকে একটি দীর্ঘ পত্র পাঠান প্রকাশের জন্য। এই পত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি এই পত্রে লেখেন-

> "I take this opportunity of making it clear to all that I do not belong to any political party whatever, and that what I have to say to my countrymen is not of the present moment or of the prevailing political unrest. I have never felt any attraction for devising means to build the machinery for extracting favours from unwilling hands, thus perpetuating the cult of moral servitude and making our people live in the most unhealthy mental atmosphere of continual hope and despair. It has ever been my endeavour to find out how to develop the power in ourselves by which we can truly earn the gratitude of all mankind and win our place as those who give out of their abundance and do not solely rely upon the doles of half-hearted charity."[৩০]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রটিতে তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক বক্তব্য এতটাই স্পষ্ট ও সংগতিপূর্ণ যে 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক পত্রটির টীকায় লেখেন-

> "We are glad to say that no party spirit has been shown in connection with the illustrious guest of Madras. All parties have, we learn, been offered tickets for his lectures, all College Principals, Editors, Clubs, etc., and have been accepted in every case, but one."[৩১]

অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দক্ষিণ ভারতের ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ডাক্তারের নির্দেশে তিনি ১৫ মার্চ শনিবার (১ চৈত্র) কলকাতায় ফিরে আসেন। তবে কলকাতায় ফিরে এসেও তিনি খুব

একটা বিশ্রাম নেননি। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের জন্য ২১ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় 'এম্পায়ার থিয়েটার' হলে একটি বিশাল জনসভার আয়োজন করেন। এই সভায় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক গেডেস, অধ্যক্ষ জনস্টন, অ্যান্ডরুজ সাহেব প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সভাতেও টিকিটের ব্যবস্থা ছিল এবং এই অর্থ বিশ্বভারতীর উন্নতির জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অসুস্থতার পাশাপাশি বিশ্বভারতীতে কে কোন বিষয় পড়াবেন তারও একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পড়াবেন শ্রীধর্মাধর রাজগুরু মহাস্থবির, পালি ভাষাটি পড়াবেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ইংরেজি পড়াবেন অ্যান্ড্রুজ সাহেব এবং চিত্রকলা বিষয়টি হাতে-কলমে শেখাবেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর।

ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনোদিনই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। 'অসন্তোষের কারণ' প্রবন্ধে এর মূল কারণগুলি জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধে বারবার করে বলেছেন যে, ইংরেজরা ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে তা ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য নয়। তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র ইংরেজি জানা ভারতীয় কর্মচারী যোগান দেওয়ার জন্য এবং কেরানী হওয়ার লোভে ভারতবাসী শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় স্বাক্ষর হয়ে উঠছে। এই শিক্ষাকে মানুষ তৈরীর শিক্ষা বলা যায় না। যে শিক্ষা শুধুমাত্র কেরানি তৈরি করে, চাহিদার চেয়ে জোগান বেশি হওয়া মাত্রই বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এমনকি ছাত্ররা অন্য কোনো জীবিকায়ও পারদর্শী হতে পারে না সেই শিক্ষাকে আর যাই হোক সুশিক্ষা বলা যায় না। এগুলোই ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসন্তোষের মূল কারণ। তাই তিনি এই প্রবন্ধে লিখেছেন-

> "আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহাই পরম দুঃখ গোচারে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।"[৩২]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মানুষ প্রতিদিন যে অক্সিজেন, জল ও খাদ্য গ্রহণ করে তা তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে রক্ত, মাংস, স্বাস্থ্য ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষাও এমনই হওয়া উচিত। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতি, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে জ্ঞান ও শিক্ষা গ্রহণ করছেন, তা মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত হওয়া উচিত। এমনকি সেই জ্ঞান ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে তার চারপাশকে সুভাষিত করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দেরকে কিছুতেই সৃজনশীল করে তুলতে পারেনি। এসব কিছু উপলব্ধি করার পরও ভারতীয়রা যখন কোনো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন তারা ঘুরে ফিরে সেই অভ্যাসের বশে ইংরেজদের অচল শিক্ষা পদ্ধতিকেই গ্রহণ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের এই উপনিবেশবাদী প্রভাব থেকে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি 'অসন্তোষ এর কারণ' প্রবন্ধে বলেন-

> "এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিক্ষাকে 'সত্য ও প্রাণের জিনিস'[৩৪] করে তুলতে চেয়েছিলেন।

তবে ভারতীয়দের সাপেক্ষে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ করার মূল চাবিকাঠি কিন্তু ইংরেজি ভাষা। তাই তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে কখনই উপেক্ষা করেননি। তিনি ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে ভারতীয়দের সাপেক্ষে গ্রহণ করতে পারেননি। 'ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ' প্রবন্ধটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত হলেও তার প্রকৃত কাজ শুরু হয় প্রায় ছয় মাস পর ১৮ আষাঢ় (৩ জুন, ১৯১৯) থেকে। এদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি

নির্দিষ্ট পথ ও লক্ষ্য আছে কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার তৎকালীন সময়ে তেমন কোনো মহৎ লক্ষ্য ছিল না। ভারতীয়দের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল জীবিকা অর্জন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে স্থাপন করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের সব থেকে বড় আহ্বান ছিল বিশ্ব প্রকৃতির আহ্বান। আশ্রম শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মন থেকে দাসত্ব মোচন করে প্রকৃত দেশপ্রেম ও সমাজসেবী গড়ে তোলার আহ্বান। এভাবেই ধীরে ধীরে 'বিশ্বভারতী' গড়ে উঠছিল। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো লক্ষ লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বীজের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে তবে সেই বীজ একদিন অঙ্কুরিত হবেই। কারণ চেষ্টা ও সাধনার মধ্যে যদি ফাঁকি না থাকে তাহলে উপকরণের অভাবে কখনো কোনো কাজ আটকায় না।

এদিন ভাষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর শিক্ষনীয় বিষয়গুলি অধ্যাপকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন-

> "বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। ... একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভান্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে হারাবে, এবং বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।"[৩৫]

এরপর থেকেই বিশ্বভারতীতে পুরোপুরিভাবে বিদ্যাচর্চা শুরু হয়ে যায়। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, সিংহলি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, ছবি, গান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশ্বভারতীর পঠন পাঠন শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র বৌদ্ধিক ও মানসিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাই করেননি। পাশাপাশি ছাত্ররা যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হতে পারে তার ব্যবস্থাও করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পরাধীন ভারতের মানুষ দুবেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে পারত না। অন্যদিকে চলতো ইংরেজদের অত্যাচার। এমত পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপণ চেষ্টা করতেন ছাত্রদের পর্যাপ্ত

খাবারের ব্যবস্থা করার। কারণ শারীরিকভাবে দুর্বল কোনো ব্যক্তির পক্ষে কখনোই দৃঢ় মানসিকতা ও সৃজনশীল হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর দৃঢ় মানসিকতা ছাড়া দেশ সেবাও সম্ভব নয়। আর সৃজনশীলতা ছাড়া শিক্ষাও কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের বিশ্বভারতীর প্রধান লক্ষ্যই ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ। আর খাদ্যের অভাবে যদি সেই সৃজনশীলতা ও সমাজ সেবার ব্রতই সফল না হয় তাহলে তো বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কোনো অর্থ থাকে না।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ফলে একটি প্রতিষ্ঠানের ও ছাত্রদের যাবতীয় খরচ পুরোটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জোগাড় করতে হতো। তার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনো সারাদেশে কখনো বা বিদেশে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাই সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবনের মতো সম্পূর্ণ আশ্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যেখানে শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্ক হবে অনেকটা গুরু-শিষ্যের মতো। যেখানে ছাত্ররা আশ্রমের সমস্ত কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে, এমনকি ভিক্ষাবৃত্তিতেও। সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতি এই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে বোঝা যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সত্যিই সফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো এটাই চেয়েছিলেন যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররা এভাবেই দেশ ও সমাজের সেবা করবে ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে। সেই সময়ে আশ্রম বিদ্যালয়ের খবর যারা একটু রাখতেন তারা সকলেই জানতেন যে, এই বিদ্যালয়ের জন্য বাইরে থেকে তেমন কোনো সাহায্য পেত না, বিশেষ করে বাংলা থেকে তো নয়ই। যেটুকু যা সাহায্য পেয়েছেন তা অন্যান্য রাজ্য থেকে। ফলে আশ্রমের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন ছিল না বললেই চলে।

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই অনুমতির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪ জুলাই ১৯১৯ (২৯ আষাঢ়) তাঁকে লেখেন-

> "প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে শিষ্য গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যেখানে সত্য সেখানে এই নিয়মটি সুন্দর। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তোমরা সেই গুরুরূপেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছ অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে ইস্কুল নহে- ইহার সহিত তোমাদের কল্যাণসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এইজন্য ইহার সহিত তোমাদের দান প্রতিদানের সম্বন্ধ সত্য।"[৩৬]

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো বলেছেন,

> "এইজন্য তোমার চিঠিতে যখন জানিলাম বিদ্যালয়ের বিশেষ কোনো অভাব মোচনের জন্য তুমি নিয়মিত ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তখন আমি মনে বড়ই আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করিলাম। কারণ তোমার এই দৃষ্টান্ত অন্যকে বল দিবে এবং তাহাদের পথও সহজ করিয়া তুলিবে।"[৩৭]

এছাড়া ওই বছরই (১৯১৯) বিশ্বভারতীর আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি খোলা চিঠি 'শান্তিনিকেতন' -এর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই চিঠি থেকে বোঝা যায় বিশ্বভারতীর জন্য তখনও কত কী দরকার। যেমন, ছাত্রদের জন্য একটি ছোটো আকারের হাসপাতাল খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। কারণ এই সময় সারা পৃথিবী জুড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারি আকার ধারণ করেছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য একটি গ্রন্থাগার, সভাগৃহ, একটি অতিথিশালা, রান্নাঘর, যে গরুগুলি থেকে ছাত্রদের দুধের জোগান আসে সেই গরুগুলির জন্যে গোশালা, গরুগুলি সঠিকভাবে পালন করার জন্য কৃষিজমি প্রকৃতি।

তাই এর পরপরই বিশ্বভারতীর সামগ্রিক উন্নতির জন্য শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন শুরু হয়। কৃষিকাজ ও উদ্যান বিভাগের সূচনা হয়। সন্তোষ কুমার মিত্রকে সুরুলের কুঠিবাড়িতে কৃষিকাজ দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং গোশালাকে শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করা হয়। এছাড়া, আশ্রমের পূর্ব দিকে রেললাইনের ধারে কিছুটা জমি কিনে সেখানে এক হাজার লেবুর গাছ লাগানো হয়।

এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর কাজ নিয়ে মেতে ছিলেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯১৯ সালেই আগস্ট মাসেই শুরু হয় কলা ভবন। কলা ভবনে নন্দলাল বসুর সাথে এবছর যুক্ত হন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। শিল্পী নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করের টানে মাদ্রাজ থেকে দুজন ছাত্র বিশ্বভারতীতে শিল্পকলা শিখতে আসে। এদের নিয়েই দ্বারিক বাড়িতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় কলাভবন।

একই সময়ে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র শেখানোর জন্য বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে নকুলেশ্বর গোস্বামীকে শান্তিনিকেতনে আনা হয়। তাঁকে দিয়েই এই কলাভবনের সঙ্গেই শুরু হয় সংগীত শিক্ষার কাজ। এটাই ছিল সংগীত ভবনের সূচনা পর্ব। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'শান্তিনিকেতন'- এর আষাঢ় সংখ্যায় 'আশ্রমে সঙ্গীত শিক্ষা' শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়। এই বিজ্ঞাপনে সংগীত শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের আশ্রমে আহ্বান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন তা জানা যায় তাঁর 'বিদ্যাসমবায়' (১৯১৯) প্রবন্ধ থেকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেম যে, তৎকালীন সময়ে ভারতীয়দের মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ করার জন্য ইংরেজি বা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে দেশের অতীত ঐতিহ্যকে ভুললে চলবে না। তাই তিনি তাঁর 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধে লিখেছেন-

> "আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। ... অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।"[৩৮]

আর ভারতীয় বিদ্যাকে সমগ্র মানবজাতির সামনে তুলে ধরতে হলে তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিও সম্পূর্ণভাবে জানতে হবে।

বিদ্যা যদি একটি নদী হয় তাহলে তা এদেশে প্রবাহিত হয়েছে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন এই চারটি শাখার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে ইসলাম ও পার্সি। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধে আরো বলেছেন-

"অতএব আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে ইউরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।"[৩৯]

বস্তুত এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে একবার প্রাথমিক স্তর থেকেই জ্ঞানচর্চার সেই কাজ শুরু করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে প্রসারিত হয়।

এসব দর্শন শিক্ষার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের জীবনের দৈনন্দিন কাজেও নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই শিক্ষার আভাস পেয়েছিলেন আমেরিকার একটি মাসিক পত্র থেকে। এই দৈনন্দিন জীবনের ও জীবিকার জন্য হাতে কলমে যে কাজগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের শেখাতে চেয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর 'উদ্যোগশিক্ষা' প্রবন্ধটিতে। আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিনি পুথিগত শিক্ষার পাশাপাশি বাগান তৈরি সহ আরো অন্যান্য কাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এবং এগুলোকেই তিনি 'কেজো শিক্ষা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই 'কেজো শিক্ষা' শিক্ষক ও ছাত্রদের উৎসাহের অভাবে ফলপ্রসু হয়নি। একথা তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। আশ্রমে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য গরু পোষা হচ্ছে প্রায় দশ বছর ধরে। কিন্তু কোনো ছাত্র দুধ দোওয়া শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ফুটবল খেলার প্রতি তাদের যে আগ্রহ তার সিকি ভাগও যদি সবজি বাগানের ক্ষেত্রে দেখা যেত তাহলে রবীন্দ্রনাথ হয়তো মনেপ্রাণে খুশি হতেন। এমনকি রান্নাঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রান্নার সুবিধার জন্য তিনি আধুনিক চুল্লির ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু পাচকরা অভ্যাসের জড়তার জন্য তার সেই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেনি। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর 'উদ্যোগশিক্ষা' প্রবন্ধে লেখেন-

"যাহা-কিছু চলিয়া আসিতেছে তাহা নিঃসন্দেহেই ভালো বলিয়াই চলিয়া আসিতেছে এই জড় বিশ্বাস আমাদের শিক্ষিত লোকেদের মন হইতেও কিছুতেই তাড়ানো যায় না। সকল সভ্যদেশেই আরো-ভালোর রাস্তায় লোক চলিতেছে, আমাদের দেশে সে রাস্তা বন্ধ। তাহার ফল হইতেছে এই যে, এ দেশের যাহা কিছু পরিপর্ত্তন প্রায় সমস্তই বাহিরের তাড়নায় হইতেছে; তাহাতে আমাদের অন্তরের সম্মতি নাই। যা আমাদের অন্তরতম দাসত্বেরই লক্ষণ।"[৪০]

এই প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। কোনো কাজ করার জন্য প্রথমেই দরকার হয় মানসিক দৃঢ়তা। না হলে কাজ করার আগেই মনে হয় এই কাজের জন্যে অনেক অর্থ দরকার। অর্থ ছাড়া এত বড় সংকল্প সম্পূর্ণ হবে কীভাবে? তারপর যখন অর্থ আসে তখন দেখা যায় সেই অর্থকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভবপর হচ্ছে না। এর জন্য আসলে দায়ী মনের নিরুদ্যমতা। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

> "সেই নিরুদ্যম মন টাকা পাইলেও, হয় কিছুই করে না, নয় তাহার প্রচুর অপব্যয় করিয়া অল্প ফল পাই।"[৪১]

আসলে প্রচুর অর্থ বা মূলধন থাকলেই যে সব সংকল্প সম্পন্ন হবে তা নয়। যিনি সত্যিকারের কর্মযোগী একমাত্র তিনিই প্রয়োজনীয় অর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। কাজ করার প্রথমেই অর্থ নিয়ে চিন্তা না করে হাতে যেটুকু অর্থ আছে সেটুকু নিয়েই কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মাঠে নামতে হবে। আজ পর্যন্ত অর্থের অভাবে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থেমে থাকেনি, দেরি হতে পারে তার বেশি নয়। প্রকৃতপক্ষে মানসিক আত্মনির্ভরতাই সমস্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে- অর্থ নয়। এটাই যে সত্যিকারের বড় শিক্ষা সেই কথাটাই তিনি এই প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন।

আশ্রম বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কতখানি সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ 'মনোবিকাশের ছন্দ' প্রবন্ধটি। তিনি ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের মনস্তত্ত্বকে খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছিলেন। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে মনোবিকাশেরও যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে তা তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। ছাত্রদের সুস্থতা সম্পর্কেও তিনি নিয়মিত খেয়াল রাখতেন। তাই কোনো সময় ছাত্রদের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধা পেলে তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। এমনকি শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি ঋতু পরিবর্তনের প্রভাবকেও অস্বীকার করেননি। আবার তিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন যে, সাহিত্যচর্চার সঙ্গে ঋতু বৈচিত্র্যের যেমন একটি সুসম্পর্ক আছে, ছাত্রদের শেখার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ।

> "কাব্য গান প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে বসন্ত দৃশ্য ও বর্ষা ঋতু আমার পক্ষে অনুকূল। ... শীতের সময় অন্য কাজে উৎসাহ হয়, গদ্য প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা দেওয়া তখন আমার পক্ষে সহজ হয় কিন্তু রস সাহিত্য রচনার উৎসাহ সে সময় দুর্ব্বল থাকে। বোধহয় এই কারণেই আমেরিকায় ইংল্যান্ডে আমি বক্তৃতা প্রভৃতি লিখিয়াছি কিন্তু কখনো কাব্য লিখি নাই, লিখিবার ইচ্ছা মনেও উদিত হয় নাই।"[৪২]

এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন সাহিত্য শিক্ষা, গণিত শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতির হয়তো ঋতুভেদ আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "মন যেমন খানিকটা চেষ্টার তাড়নায় চলে তেমনি খানিকটা গতির বেগেও চলে। সেই গতির বেগকে একদিকে থামাইয়া দিয়া আবার আরেক দিকে চালনা করিবার সময় মনের একটি সহজ শক্তির অপব্যয় ঘটে।"[৪৩]

তাই তিনি এই উভয়ের মধ্যেই একটি সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সঙ্গে গণিতকেও তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত অর্থাৎ ফলিত অঙ্ক, তাত্ত্বিক শিক্ষা ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে সজীব করে তুলতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানেই নতুন কিছু দেখতেন এবং তা যদি আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শেখার জন্য উপযোগী হতো তাহলে তিনি তা তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করতেন। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল, ১৯১৯ সালের ২ নভেম্বর তিনি রেলপথে অসমের গোয়াহাটি হয়ে সিলেটে যাচ্ছিলেন। এই সময় এখানে মহিলাদের একটি সভায় তাঁকে আহ্বান করা হয় এবং তিনি এখানে ভাষণও দেন। এই সভাতেই অসমীয়া মহিলারা তাঁদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নিজেদের হাতে বোনা এন্ডি ও মুগার কাপড় উপহার দেন। এই কাপড় দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুবই ভালো লাগে এবং তিনি বিশেষভাবে আকর্ষিত হন। এদিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে তখন কারিগরি বিদ্যার আয়োজন চলছে এবং বস্ত্রবয়ন সেই শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন এই কাপড় শান্তিনিকেতনে তৈরি

করবেন। যা ভাবা সেই কাজ। শান্তিনিকেতনে ফেরার পর 'শান্তিনিকেতন'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়- "এখানকার মেয়েদের রেশমের কাপড় বোনা শিখাইবার জন্য গুরুদেব তাঁতের কাজ-জানা একজন স্ত্রীলোককে আসাম হইতে আনিয়াছেন।"[৪৪] এবং পৌষ সংখ্যার খবর থেকে জানা যায়- "তাঁত-শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে মহিলাদের তাঁত শিক্ষার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে কেনো ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার একটা ছোটো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ১৯১৯ সালের ৭ নভেম্বরের একটি বক্তৃতা থেকে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলায় ভ্রমণে যান। সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহের 'শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কার্যাবলীর বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে শ্রীহট্ট কলেজে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০০ মানুষ উপস্থিত হয়েছিল এবং তার অর্ধেক ছাত্র। ১৯১৯ সালে পূর্ববঙ্গের সিলেটের মতো জায়গায় ৪০০০ মানুষের উপস্থিতি সত্যিই বিস্ময়কর। উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম 'শান্তিনিকেতনে'র পৌষ সংখ্যায় 'আকাঙ্ক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি বলেন, তিনি গুরু রূপে কোনো উচ্চ সিংহাসন চান না, তিনি ছাত্রদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে থাকতে চান। আর সেজন্যেই তিনি কলকাতার বাইরে একটা নির্জন জায়গা নির্বাচন করে ছাত্রদের ডেকেছেন। শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের উপকারের জন্য নয়- রবীন্দ্রনাথের নিজেরও ভালো লাগার জন্য। কারণ এই সমস্ত ছাত্রদের মাঝে বসে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন-

> "বৃদ্ধের সতর্ক বিজ্ঞতা বড়ো সত্য নয়, নবীনের দুঃসাহসিক অনভিজ্ঞতা তার চেয়ে বড় সত্য। কেননা এই অনভিজ্ঞতার ঔৎসুক্যের কাছেই সত্য বারে বারে আপন নূতন শক্তিতে নূতন মূর্তিতে প্রকাশ পান; এই অনভিজ্ঞতার অক্ষুণ্ণ বলেই পুরাতনের পর্বত প্রমাণ বাধা ভাঙ্গে এবং অসাধ্য সাধন হতে থাকে।"[৪৬]

এই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন, মহৎ আকাঙ্ক্ষার পাথেয় নিয়ে যুবক ও তরুণরা পৃথিবীতে এসেছে। তাই দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য তাদের বেশি শিক্ষার দরকার নেই-

"কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্য যে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার দরকার তাকেই শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্যে মানুষের শিক্ষা।"[৪৭]

জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে ভালোভাবে জেনে তাকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা প্রভৃতি হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

"সেই শিক্ষাকে আমরা যদি পুঁথির বুলি শিক্ষা, কতকগুলি বিষয় শিক্ষা বলে ক্ষুদ্র করে দেখি তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করলুম। মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরমশিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব হচ্চে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য্য, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, মহৎ সংকল্পের দুর্জ্জয়তা।"[৪৮]

তখন এদেশের মানুষের মন অভ্যাস ও সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছিল। প্রশ্ন করা, বিচার করা, নতুন করে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাকে ব্যবহারে প্রয়োগ করা তৎকালীন ভারতীয়দের মধ্যে শুধু ছিলই না তা নয়, বরং সেটা ছিল নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। তাই হয়তো ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, কেরানিগিরি প্রভৃতি ছিল তখনকার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি এই প্রবন্ধে আরো বলেছেন-

"অন্য দারিদ্র্যের লজ্জা নেই কিন্তু আকাঙ্খার দারিদ্র্যের মত লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই। কেননা, অন্য দারিদ্র বাহিরের, এই আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্য আত্মার।"[৪৯]

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বললেন:

"তোমাদের আমি দূর থেকে উপদেশ দিতে আসি নি। স্বদেশের এতদিনকার যে পুঞ্জীভূত লজ্জা, যে লজ্জাকে আমরা অহঙ্কারের গিল্টি করে গৌরব বলে চালাতে চেষ্টা করচি সেইটের ছদ্মপরিচয় ঘুচিয়ে তোমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে দেখাতে চাই। ... তোমরা যদি উপরের দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত হও তা হলে সকল বড় দেশ যে ব্রত নিয়ে বড় হয়েচে আমরাও সেই ব্রত নেব। কোন্ ব্রত? দানব্রত।

যখন না দিতে পারি তখন কেবল হয় ত ভিক্ষা পাই, যখন দিতে পারি তখন আপনাকে পাই। যখন দিতে পারব তখন সমস্ত পৃথিবী আগ বাড়িয়ে এসে বলবে, "এস, এস, বোস।" তখন জোড়হাত করে একথা কাউকে বলতে হবে না, "আমাকে মেরো না, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ।" তখন সমস্ত মানুষ আপন গরজেই আঘাত হতে আমাদের বাঁচাবে। তখন নিজের দাবীর জোরে সকল অধিকার গ্রহণ করব, পরের কৃপার জোরে নয়।"[৫০]

ঘটনাক্রমে বলা যায় মণিপুরি নৃত্যের কথা। শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে তার শুভারম্ভ হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই শ্রীহট্টতে ভ্রমণকালে। এই ৭ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় মণিপুরি ছেলেমেয়েরা তাঁকে মণিপুরি জাতীয় নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ করে। এই মুগ্ধতাই ছিল সূত্রপাত। এর পরপরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরা থেকে আশ্রমের জন্যে একজন মণিপুরি নৃত্যশিক্ষককে নিয়ে আসেন। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা থেকে বিশদে জানা যায়। ওই বছর বোম্বাইয়ে Excelsior Theatre এ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভিনয় উপলক্ষ্যে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতে সংগীত ভবনের পরিচয় দিতে গিয়ে যা লেখা হয়েছিল এই প্রসঙ্গে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

"Saved by a chain of difficult range of hills from the puritanical atmosphere of the Bengali Society, dancing existed in its pure pristine glory in the native state of Manipur to the east of Bengal Rabindranath in his visit to Sylhet in 1917 [1919] had the occasion to see an exhibition of Manipuri dancing. He was charmed with the lyrical quality of these dances and a complete absence of any gross sensuousness in these rhythmic forms. He knew his chance had come and he brought along with him two Manipuri dancing teachers for his school."[৫১]

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যর কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শান্তিনিকেতনে হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ৫ হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন এবং আরো পাঁচ হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নাম গোপন রাখতে বলেন।

সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেনের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে-

"আগামী বৎসরে হাসপাতালের আরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত ৫০০০/ টাকা বাহির হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা দাদাকে সর্ব্বান্তঃকারণে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"[৫২]

প্রতিবেদনের শেষের দিকে তিনি সরাসরি নাম প্রকাশ করেই বলেছেন যে-

"বাংলা দেশে একমাত্র ত্রিপুরার রাজদরবার নিকট হইতে বিদ্যালয় দান সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে, সেই জন্য উক্ত রাজবংশের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর দেবমাণিক্য বিদ্যালয়ের পরম সুহৃদ ছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যও বিদ্যালয়ের প্রতি যেরূপ প্রভূত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা উপকৃত ও আশান্বিত হইয়াছি।"[৫৩]

শুধু আর্থিক সাহায্যই নয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ত্রিপুরাবাসী একজন মণিপুরি নৃত্যশিল্পীকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। এই নৃত্য ও কারু শিল্পী হলেন কুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহ।

কুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কলা ভবনের ছাত্ররা খুবই আনন্দিত ও খুশি হয়েছিল। ছেলেরা মহা উৎসাহে তাঁর কাছ থেকে নাচ শিখতে শুরু করে। ছেলেদের দেখাদেখি মেয়েরাও মণিপুরি নাচ ও শিল্পকার্য্য শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধিমন্ত সিংহের সঙ্গে আলোচনা করে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরকে একটি চিঠি পাঠান। যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে শান্তিনিকেতনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তাহলে খুব উপকার হয়।

ইতিমধ্যে দুর্গাপুজোর ছুটি শেষে ২৩ কার্তিক (৯ নভেম্বর) বিদ্যালয়ের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে ফেরেন ১৩ নভেম্বর। এসেই এন্ড্রুজ সাহেবকে লেখেন-

"Boys have come back from their holidays and our works have commenced. I am getting ready to occupy my new house also my seat as the teacher of English."[৫৪]

এখানে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন বাড়ির কথা বলেছেন সেটি হল উত্তরায়ণ। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে, পুজোর ছুটিতে তিনি এই বাড়িটিতে একটু নির্জনে থাকবেন, বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে অতিথিদের ভিড়ের জন্যে তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি। তাই তিনি কিছুটা বাধ্য হয়েই শিলং ভ্রমণে যাত্রা করেন এবং ফিরে এসে 'উত্তরায়ণ' -এ গৃহপ্রবেশ করেন।

এইসময় বিশ্বভারতীতে ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় শান্তিনিকেতনে ঘরের চাহিদা বাড়তে থাকে। আগে শিক্ষকরা ছাত্রদের সাথে ছাত্রাবাসে থাকতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে অনেকেই সপরিবারে শান্তিনিকেতনে থাকা শুরু করায় 'নতুনবাড়ি' নামে আরেকটি বাড়ি তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে 'শান্তিনিকেতন সমবায়-ভাণ্ডার লিমিটেড' একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কারণ গৃহনির্মাণের কাজও সমবায়-পদ্ধতিতে শুরু করার সংকল্প নেওয়া হয়।

এতো কাজের মাঝেও কিন্তু তাঁর ছাত্র পড়ানোর কাজ থেমে থাকেনি। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'-র পৌষ সংখ্যায় প্রমথনাথ বিশীর লেখা থেকে জানা যায়-

> "পূজনীয় গুরুদেবের সান্ধ্য-পাঠসভা নিয়মিতভাবে চলিতেছে। ছুটির পর তিনি Whitman এর 'Leaves of Grass' শেষ করিয়া উক্ত কবি সম্বন্ধে Edmond Holmes এর সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন। তার পরে তাঁহার 'Personality' নামক বই হইতে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিয়া George Meredith এর একখানি উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন।"[৫৫]

এছাড়াও তিনি Edward Carpenter (১৮৪৪-১৯২৯) এর 'Towards Democracy' কাব্যগ্রন্থ, ব্রাউনিঙের কবিতা, জাপানি কবিতার অনুবাদ, ও জার্মান কবি লেসসিং (১৭২৯-৮১) এর 'Nathan der Waise' (1779) নাটকটির অনুবাদ প্রভৃতি ছাত্রদের ভালো করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন।

এমনকি দুপুরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর দুজন প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র প্রমথনাথ বিশী ও চলমায়-কে ইংরেজি পড়াতেন। প্রমথনাথ বিশী এই বিষয়ে আরো লিখেছেন যে, দুপুরের ভাবালুতা দূর করার জন্যে উত্তরায়ণের বারান্দায় বসে 'সায়ান্স ফ্রম অ্যান ঈজি চেয়ার' -এর মতো একটি উচ্চ পর্যায়ের বই থেকে

রসায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। রসায়ন শাস্ত্রের পর তিনি কিছুদিন তাঁদের আবহবিদ্যা নিয়েও পড়িয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর উন্নতি ও কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তিনি কিন্তু শিশুবিভাগের কথা ভোলেননি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১১ ডিসেম্বর ছোটো জামাই (মীরা দেবীর স্বামী) নগেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি থেকে। তিনি লেখেন-

> "মীরা আর প্রভাতের স্ত্রী [সুধাময়ী দেবী] শিশু বিভাগের একদল ছেলের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে। মীরা রোজ বিকেলে পালাক্রমে দু'জন করে ছেলেকে নিজের ঘরে খাওয়ায়, আর ওদের সকলের ছেঁড়া কাপড় শেলাইয়ের ভার নিয়েচে। মেয়েদের এই যত্ন ছোটো ছেলেদের পক্ষে একান্তই দরকার। বিশেষত দেখতে পাই এখানে অধিকাংশ শিশু বিভাগের ছেলে মাতৃহীন– তাদের চোখে স্নেহের জন্যে ক্ষুধা বড় করুণভাবে যেন লেগেই আছে– মেয়েরা কেউ ওদের অল্প একটু যত্ন করলেই একেবারে তাদের পোষমানা হয়ে যায়। এর থেকে আমি রোজ বুঝতে পারি ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে মেয়েদের যে একটা খুব প্রধান স্থান আছে, সেটা যদি না দেওয়া যায় তাহলে শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা শেষ পর্যন্তই কোনো না কোনো আকারে অন্তরের মধ্যে থেকে যায়। মেয়েদের পরে অশ্রদ্ধা এবং কঠোর নিষ্ঠুরতার একটা কারণ, আমাদের মনের বুদ্ধিগত বিকাশের কার্যে তাদের সাহায্য আমরা অল্পই পেয়েছি। কেবল আমাদের খাওয়ানো পরানো কেবলমাত্র আমাদের দেহের প্রয়োজন সাধনে তাদের সেবা পাই বলেই এক জায়গায় তাদের মূল্য আমাদের কাছে ভিতরে ভিতরে খুব কমে যায়।"[৫৬]

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু করেন। কিন্তু আশ্রমে নানারকম সমস্যার পাশাপাশি মেয়েদের থাকার উপযুক্ত জায়গায় অভাবে সাময়িকভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে বেশিদিন দমিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি শান্তিনিকেতনে 'নারীভবন' স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন এবং তাকে বাস্তবায়িত করে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে আবার মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সময় আশ্রমিক মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

‘শান্তিনিকেতন’-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ‘কলাবিদ্যা’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ছাত্রদের মানসিক বিকাশের জন্য তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাকাল থেকেই সংগীত ও চিত্রকলাকে গুরুত্ব সহকারে রেখেছেন। শৈশবে ছবি আঁকা ও সংগীতের প্রতি শিক্ষার্থীদের বেশ আগ্রহ ছিল। তারা উৎসাহের সাথেই এগুলো শিখত। কিন্তু উচু ক্লাসে ওঠার সাথে সাথে তাদের এই আগ্রহ ক্রমশ কমতে শুরু করলো, প্রকট হয়ে উঠল তাদের উদাসীনতা। তার কারণ হিসাবে তিনি তৎকালীন দেশের মানুষের মানসিকতাকে দায়ী করেছেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও মনে করতেন যে, ইংরেজি শিখলে ইংরেজদের অধীনে অন্তত একটা কেরানীর চাকরি পাওয়া যাবে, কলাবিদ্যা-চর্চা নাকি জাতিকে দুর্বল করে দেয় প্রভৃতি মানসিকতা থেকেই কলাবিদ্যার প্রতি ছাত্রদের একটা অবহেলা দেখা দেয়। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন-

> “আনন্দপ্রকাশ জীবনী শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দ প্রকাশের পদগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনী শক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। ... যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে কাজ করিতেও ভোলে। ... আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে অপবিদ্যা ও বিঘ্নকর বলিয়া জানে। ইহা কেবলমাত্র আমাদের মজ্জাগত দীনতার লক্ষণ। ইহাতে আমাদের প্রকৃত কর্ম্মশক্তিকেই দুর্ব্বল করিতেছে।”[৫৭]

তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধে জোরের সাথেই বলেছেন-

> “বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হোক।”[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ধর্মশিক্ষা’ প্রবন্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মকে কীভাবে স্থান দেওয়া যায় সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি ন্যাশনাল বিদ্যালয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

> "আজকের দিনে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নানাবিধ যে সকল জাতি বাস করিতেছে তাহাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ সত্তাকেই ভারতীয় নেশন বলা যাইতে পারে। অতএব ন্যাশনাল বিদ্যালয় তাহাকেই বলা যায় যেখানে শিক্ষার যোগে জ্ঞানের মিলন সাধনের দ্বারা এই নানা জাতি নানা সম্প্রদায় আপন মানসিক ঐক্য উপলব্ধি করে।"[৫৯]

তিনি আরো বলেন যে, একটি রাষ্ট্রের অধীনে থাকা সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ঐক্য তা পারস্পরিক স্বার্থজনিত ও নিতান্তই বাইরের ঐক্য। এই ঐক্য কখনোই স্থায়ী ও স্বার্থহীন হতে পারে না। তাই-

> "ন্যাশনাল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া চাই মনের ভিতরের দিকে জ্ঞানের মিলন।... ভারতে যত সম্প্রদায় ও জাতি আছে সকলেই সকলকে ভালো করিয়া জানিতে পারে ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে এমন বিদ্যার আয়োজন করা দরকার।"[৬০]

কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সকলকে নিয়ে একত্রিত হওয়াও খুব একটা সহজ কাজ নয়। কারণ ধর্মমত ও বিশ্বাস নিয়েই সকলের মধ্যে আসল বিভেদ। কোনো ধর্মে জীবহত্যা স্বীকৃত তো কোনো ধর্মে জীব হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে এইসব ধর্মমতকে একত্রিত করা খুবই দুষ্কর। তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-

> "উপনিষৎ হইতে এমন বিশুদ্ধ ঈশ্বরবাদ পাওয়া যায় যাহা কোনো সঙ্কীর্ণ দেশ কাল বা জাতির বিশেষ সংস্কারের দ্বারা আবৃত নহে। যে-কোনো ধর্মসম্প্রদায় ঈশ্বরকে স্বীকার করে, উপনিষদে সে আপন ধর্ম্মের প্রশস্ত নির্ম্মল মূলতত্ত্বটি দেখিতে পাইবে। ...বাহিরের যে দিকে আকারে প্রকারে আচারে বিচারে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ সে দিকে আমরা নানা ধর্ম্মকে একত্র করিয়া সংঘাত বাধাইব না কিন্তু ভিতরের দিকে যেখানে তাহাদের সকলেরই একটি ঐক্যের স্থান আছে সেইখানেই আমাদের ন্যাশনাল জ্ঞানের মন্দিরে আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায় আসিয়া অবিরোধে মিলিত হইতে পারিবেন।"[৬১]

তবে তাঁর এই প্রবন্ধের মতামত নিতে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিকদের মধ্যেই বোধহয় কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করে রথীন্দ্রনাথকে একটি তারিখহীন চিঠিতে লেখেন-

> "বিশ্বভারতীর বিদ্যায়তনের শিক্ষা প্রভৃতির যে আদর্শ খাড়া করা হয়েচে সে সম্বন্ধে অনেক তর্কের বিষয় আছে। আর একবার সকলে বসে না আলোচনা করলে চলবেনা। যে কথা বলে আমি ভারতবর্ষের লোককে বিশেষ ভাবে আপীল করেছি সে হচ্চে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় বিদ্যার সমবায়। এখানে বৈদিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পারসী প্রভৃতি সকল বিদ্যার একটা সমন্বয়ক্ষেত্র হবে। তোদের আদর্শের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই।"[৬২]

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের সংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার একটা পরিসংখ্যান দেখা যাক। ১৯১৮ সালের শান্তিনিকেতনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তখন বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫৬। এর মধ্যে গুজরাটের ১৫ জন, মহীশূর, মান্দ্রাজ প্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, নেপাল ও বোম্বাই প্রদেশের ১ জন করে এবং সিংহলের ৩ জন। ওই বছর গ্রীষ্মের ছুটির পর আরো ১০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। ফলে মোট গুজরাটি ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ জন। অন্যান্য প্রদেশ থেকেও ছাত্র আসছিল। যেমন আষাঢ় মাসে মান্দ্রাজ কাঞ্চীভোরম থেকে ১ জন ছাত্র বিশ্বভারতীতে শিল্পকলা নিয়ে পড়তে আসে, পরের মাসেই মাদ্রাজ থেকে আরো ২ জন ছাত্র শিল্পকলা নিয়ে পড়তে আসে। ওই বছরের শান্তিনিকেতনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দুটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়।

> "শ্রীযুক্ত অনাগরিক ধর্মপাল প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন যে ১০ টি ভিক্ষু আশ্রমে থাকিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র বাংলা ভাষা ও অন্যান্য বিষয় অধ্যায়ন করিবেন, তাঁহাদের বাস ও আহারের ব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই করিবেন" এবং "জৈন সম্প্রদায় হইতে ৫ টি জৈন ও একটি অধ্যাপক পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। মান্দ্রাজ ত্রিবংকুর প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বিশ্বভারতীতে পড়িবার জন্য কয়েকটি ছাত্রের আবেদনপত্র আসিয়াছে।"[৬৩]

অর্থাৎ বিশ্বভারতী যে একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠছিল এই খবরগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

১৯১৮ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন এন্ড্রুজ সাহেবের একটি চিঠি থেকে জানতে পারেন যে, সেইসময়ে শান্তিনিকেতনে গুজরাটি ও মাড়োয়াড়ি মিলিয়ে মোট ৭০ জন ছাত্র পড়ছেন তখন তিনি বিস্মিত হয়ে গেছিলেম। এই খবরের প্রেক্ষিতে তিনি ১৮ আগস্ট, ১৯১৮ এন্ড্রুজ সাহেবকে লেখেন-

> "You have given me an agreeable surprise. I never knew that the Gujrati Marwaris' Colony was so strong at Shantiniketan. If all these boys remain there their full time, what a link they must form between Gujrat and Bengal and I have no doubt that if the Poet continues as he has begun, he will hold all the Gujratis that are there to the end of their time and many must follow."[৬৪]

এই সময়ে আশ্রমে ২২ জন অধ্যাপক ছিলেন। তাছাড়া ব্যায়াম ও ড্রিল শেখানোর জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন প্রাক্তন সৈনিককে নিযুক্ত করা হয়। আশ্রমে গুজরাটি ছাত্রদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯১৮ র শেষ দিকে বোম্বাইবাসী একজন শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে নিয়োগ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে শুধু বিশ্বভারতীর উন্নতির কথাই ভাবেননি। তিনি পাশ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যেমন, ভুবনডাঙা গ্রামের বিদ্যালয় ও সাঁওতাল বিদ্যালয় দুটিতে বিশ্বভারতীর স্বেচ্ছাব্রতী অধ্যাপক ও ছাত্ররা পড়াতেন। এরপর এই বিদ্যালয় দুটিতে একজন করে বেতনভুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রসাদ (মুলু) ভুবনডাঙ্গার দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে কিছুদিনের জন্য এই বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও কয়েক মাসের মধ্যেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই স্কুলটিকে চালু রাখার জন্য ১০০০ টাকা দান করেন। এই টাকা দিয়ে স্কুল বাড়িটি পাকা করা হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আশ্রমে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শান্তিনিকেতনে নানা রকম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ৩২ জন ছাত্র একসঙ্গে থাকার মতো ছাত্রাবাসের পাশাপাশি ২৫ জন একসঙ্গে স্নান করতে পারবে এমন বড়ো স্নানাগারও তৈরি করা হয়েছে। আশ্রমের রাস্তাগুলিরও সংস্কার কার্য শুরু হয় সেইসঙ্গে। এই কাজে বিশেষভাবে হাত লাগায় আশ্রমের ছাত্ররা। তারা বিকালে খেলার সময় এই রাস্তা তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করে কিছু অর্থ উপার্জনও করে। সৃষ্টিশীল কাজে অংশ গ্রহণ করে আনন্দ লাভ করা এবং কোনো কাজই যে ছোটো নয় এই বোধ এভাবেই তাদের মধ্যে তৈরি করা হয়- এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে আশ্রম থেকে সুরুল পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়। এই রাস্তা তৈরির কাজে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ২০০ টাকা খরচ হয়েছিল যার অর্ধেক টাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ পৌষ সকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্দিরের আলোচনায় বিশ্বের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির কথা উঠে আসে। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' -র -১৩২৬ -এর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন-

> "আজকের দিনে যুরোপ ধন মান প্রতাপ ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই যুরোপের আসন আজ মৃত্যুর আঘাতে যেমন করে টলে উঠেচে ইতিহাসে এমন প্রায় দেখা যায় না। বাহিরের সেই টলার সঙ্গে তার অন্তর যে টলে ওঠেনি তা নয়- জীবনসমস্যা আর একবার চিন্তা করে দেখতে সে প্রবৃত্ত হয়েচে। কিন্তু নতুন জীবনের দীক্ষা নেওয়া ছাড়া তার কি আর কোনো পথ আছে?"[৬৫]

> "যুরোপে একদিন ফ্যুডালতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। সেই তন্ত্রে সেখানকার নিম্নস্তরের জনসাধারণ উচ্চস্তরের শাসনকর্তাদের স্বার্থভার বহন করে এসেচে- একদলের দাসত্বের উপর আর একদলের প্রভুত্ব নির্ভর করেচে। তারপরে আজ সেখানে ডিমক্রেসির প্রাদুর্ভাব। এই ডিমক্রেসির প্রভাবে সেখানকার সমাজে অন্য ভেদরেখা হীন ক্ষীণ হয়ে এসে ধনী নির্ধনের ভেদরেখা বিপুল হয়ে উঠেচে। এখন সেখানে অনেকদিন থেকেই ধনিকের স্বার্থ কর্মিকেরা বহন করে এসেচে। এই ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করেচে।"[৬৬]

ইউরোপে ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থ দিন দিন যত বিপুল হয়ে উঠেছে, তাদের চরিত্র ততই আত্মকেন্দ্রিক ও রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠেছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের শিখরে পৌঁছে গেছে, আর ধনী-দরিদ্রের সংঘাতও তত ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। ইউরোপের এই কদর্য রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিজ্ঞানের সহায়তায় একদিন তারা পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে। তাই ইউরোপের মানুষই সেই সময় তাদের চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বসেছিল। কিন্তু তাদের এই চিন্তাভাবনার মধ্যেও ছিল স্ববিরোধিতা। কারণ তারা একদিকে শান্তির কথা বলছে অন্যদিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আগ্নেয় অস্ত্র মজুত করছে। সেদিনের সেই মন্দিরের বক্তব্যে তিনি ইউরোপের মানুষ সম্পর্কে বলেছেন যে-

> "এ কথা বুঝেও বুঝচে না যে স্বার্থ কখনো বিরোধ মেটাতে পারেনা। ... সেখানকার সমাজে বণিকের বেশে যে স্বার্থ গদীতে বসে আছে রাজার বেশে যে স্বার্থ সিংহাসনে- তারা নিজের বাহ্য বেশ অল্পস্বল্প বদলাতে রাজি আছে কিন্তু কি উপায়ে তাদের গদী তাদের সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী হয় এ চিন্তা কিছুতে তাদের মন থেকে ঘুচতে চায় না।... কিন্তু হয় নবজীবনের দীক্ষা নিতে হবে, নয় বারে বারে মৃত্যুর পর মৃত্যু এসে সমস্ত লোপ করে দেবে, এর মাঝখানে কোন রফা নিষ্পত্তির কথা চলবে না।"[৬৭]

এটাই ছিল তৎকালীন ইউরোপের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের মূল সমস্যা। এই সমস্যা ও সংকট থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনার শেষে তাও উল্লেখ করেছেন।

> "দুঃখ পীড়িত জগতের মাঝখানে বসে আজ আমাদের পক্ষে এই কথা গভীরভাবে ভাববার দিন। মানুষকে তার অহমিকা থেকে নাড়িয়ে দিয়ে তাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার যে দীক্ষামন্ত্র সেই মন্ত্র আমাদের প্রত্যেকের হোক।"[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই ভাষণের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে এক সত্যিকারের একাত্মবোধ গড়ে তোলার কথা বলেছেন। এই একাত্মবোধের উপলব্ধি ছাড়া পৃথিবীজুড়ে যে যুদ্ধ, সংঘাত ও হত্যালীলা চলছিল তা থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তির কোনো পথ নেই। একাত্মবোধ বলতে তিনি মানুষের

চেতনা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বোঝাতে চেয়েছেন। সেদিনের সেই মন্দিরের ভাষণ ছিল মূলত বিশ্বের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে একটি রাজনৈতিক আলোচনায়। এই আলোচনাটিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আলোচনা বললে তাকে যথার্থ হয় না। আসলে বিশ্বের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের মনে যে, বিশ্বশান্তি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম ও মানবতা জয়গান ধ্বনিত হচ্ছিল এই ভাষণ তারই প্রকাশ মাত্র। তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁন্সের সুরে সুর মিলিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারলেন না (শান্তিনিকেতন পত্রিকা -১৩২৬ -এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত)-

> "একটা জগৎজোড়া আমূল পরিবর্তনের সময় এসেছে।... গর্বান্ধ ও পাপিষ্ঠ উপরওয়ালাদের দুর্বৃত্ততার উৎপীড়নে জনসাধারণ পিষ্ট ও ক্ষতবিক্ষত হচ্চে, কিন্তু তবু এই জনসাধারণ মাথা উঁচু করে জেগে উঠবে, বিশ্ববাসী এই জনসাধারণ এক মহা মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং Socialist-দের এই ভবিষ্যদ্বাণী তারাই সফল করবে 'সকল কর্মীর মিলনেই জগতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে'।"[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনও পর্যন্ত ইউরোপকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। তাই রাশিয়ার বিপ্লব ও যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের গণআন্দোলন ও বৈপ্লবিক গণচেতনার উপর তিনি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি।

এ তো গেল ইউরোপের কথা। এদিকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সমস্যা ছিল অন্যরকম ও আরও জটিল। বিশ্বভারতী একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদিকে তেমনি ন্যাশনাল বিদ্যালয়ও বটে। একটি ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রাখবেন কিনা, বা রাখলেও তা উচিত হবে কিনা তাই নিয়ে তাঁর মনে একটি বিশাল দ্বন্দ্ব কাজ করছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ইতিমধ্যে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে 'ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়', অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলকাতায় 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' ও আলিগড়ে 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে রাখা যাবে কিনা তাই নিয়ে কি ভাবছেন তা ধরা পড়ে তাঁর 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন-

"এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যে সকল ন্যাশনাল বিদ্যালয়ের পত্তন হইয়াছে সেগুলি বস্তুত হিন্দু বিদ্যালয়। এইজন্য সে সকল জায়গায় প্রধানত হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দুধর্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে- ইহাতে ভেদ দূর না করিয়া ভেদবুদ্ধিকেই দৃঢ় করিবার উপায় অবলম্বন করা হয়।... ন্যাশনলত্ব তাহাকেই বলে যাহা সমস্ত দেশ জোড়া সামাজিকতা।"[৭০]

কিন্তু কোনোকালেই ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা খুবই দুরূহ ও কঠিন একটি কাজ। বলা যেতে পারে প্রায় অসম্ভব। কারণ সমস্ত ধর্মই অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক, তাদের আচার অনুষ্ঠান সবই আলাদা আলাদা। কোনো ধর্মের সঙ্গেই কোনো ধর্মের মিল নেই। আর এই মিল নেই বলেই ভারতবর্ষে এতো ধর্মের ভেদাভেদ। তাই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "আমাদের দেশের ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে ধর্মের কথাটা একেবারে তোলাই যাইতে পারে না।"[৭১]

এর ঠিক পরেই তিনি আবার অন্য কথা বলেন-

"কিন্তু ভারতে কি কেবল সাম্প্রদায়িক ধর্মই আছে... ভারতের ধর্মক্ষেত্র কি সকল সম্পদায়কেই একত্রে আতিথ্যে আহ্বান করিবার স্থান নাই?... কিন্তু ভারতের সাধনা যেখানে সত্য, যেখানে সনাতন, সেখানে তাকাইয়া জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আছে।

"উপনিষদ হইতে এমন বিশুদ্ধ ঈশ্বরবাদ পাওয়া যায় যাহা কোন সংকীর্ণ দেশ কাল বা বিশেষ সংস্কারের দ্বারা আবৃত নহে। যেকোনো ধর্মসম্প্রদায় ঈশ্বরকে স্বীকার করে, উপনিষদে সে আপন ধর্মের প্রশস্ত নির্মল মূলতত্ত্বটি দেখিতে পাইবে। সেই উপনিষদে শান্তং শিবমদ্বৈতং যিনি, তাহারই নামে আমরা পৃথিবীর সমস্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মসম্প্রদায়কে একাসনে বসাইবার জন্য আহ্বান করিতে পারি।"[৭২]

তবে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। কারণ, উপনিষদ হল হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের আবেগ উচ্ছ্বাসকেই তুলে ধরা হয়েছে যা অন্য ধর্মীয়

সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে খুব সহজেই মেনে নেওয়া কঠিন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি। আর ঠিক সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সমস্ত বাধা ও গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার ডাক দিয়েছেন।

১৯২০ সাল, দেশ জুড়ে খিলাফত আন্দোলন ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করছে। গান্ধীজি এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং বিভিন্ন সভায় তার বক্তব্য পেশ করছিলেন। তিনি এই খিলাফত আন্দোলনকে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ঐক্যের অপূর্ব সুযোগ বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি তার গঠনমূলক কর্মসূচির মধ্যে স্বদেশি, খদ্দর, চরকা প্রভৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি তিনি হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করারও দাবি জানান।

১৯২০ সালের ২৯ মার্চ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সদলবলে বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর এই বোম্বাই ভ্রমণের প্রধান কাজ ছিল বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও তার উন্নতির জন্য অর্থ সংগ্রহ। তার প্রমাণ হল এই সময় তাঁকে যখন পুনা লিটারেরি সোসাইটি ও পুনা নারী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬, ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে আহ্বান করা হয় তিনি তখন ক্ষিতিমোহন সেনকে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও তার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে বোম্বাইয়ে রেখে যান। এছাড়া এই কাজের জন্যে তিনি ক্ষিতিমোহন সেনকে ২৮ এপ্রিল একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়ে যান।

> "My friend Mr. Kshitimohan Sen is the Principal of Santiniketan Institution. I have full trust in him and know that he will be able to explain the ideas of our Ashram to those who wish to know."[৭৩]

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন গুজরাট ও বোম্বাই থেকে বিশ্বভারতীর জন্য আশানুরূপ না হলেও বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলো। ১৩২৭ সালের বার্ষিক বিবরণ থেকে তার একটা তালিকা পাওয়া যায়।

আমেদাবাদের ধীমন্তরাও পণ্ডিত ২১০০ টাকা, মভলঙ্কার ১২৫০ টাকা, কেশবলাল জি ৫০০ টাকা, সুরাটের ডাক্তার রাওজি ১০০০ টাকা, জে. দাভে ৫০০ টাকা, কিকুভাই দেশাই ২৭২ টাকা, সুরাট শিশুমণ্ডলী ৫১ টাকা, বোম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর পেটিট ১৫০০ টাকা, আবদুল রসুল ১০০০ টাকা, সৈয়দ হোসেন ইমাম ৫০০ টাকা দান করেন। এছাড়াও এন্ড্রুজ সিন্ধু, বোম্বাই, আমেদাবাদ, নদীয়াদ প্রভৃতি শহর থেকে খুচরো দানের ৬৪১০ টাকা সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতন আশ্রমের হাতে তুলে দেন।[৭৪]

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাইয়ে যান। এখানে তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের ডাকে ৬ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত 'জাতীয় সপ্তাহ' পালনের দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানেই যান। সেখানে পৌঁছে জানতে পারেন ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের সম্বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানেও কবি মহম্মদ আলি জিন্নার অনুরোধে তাঁকে একটি লিখিত ভাষণ পাঠাতে হয় এবং এর কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিমাদেবী, রথীন্দ্রনাথ ও মঞ্জুদেবীকে নিয়ে ইংল্যান্ড ও ইউরোপে যাত্রা করেন। এই সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। রমাঁ রোলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁসে প্রমুখ স্বাধীন চিন্তাবিদদের সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁর মনে হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে। তাই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যুদ্ধোত্তর পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে সামনাসামনি আলাপ-আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বভারতী কে নিয়েও একটা পরিকল্পনা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বভারতীকে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলা ও তার আদর্শকেও সকলের সামনে তুলে ধরা, বিশ্বভারতীর জন্য কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া প্রভৃতি তাঁর ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ইংল্যান্ডে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও ঔপনিবেশিক ভারতে ইংল্যান্ডের অত্যাচারী শাসননীতি সম্পর্কে ইংল্যান্ডের সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে জানানো। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অশান্ত ও সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীকে নিয়ে ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের চিন্তাবিদদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের সুধীসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের উপর আস্থা ছিল।

১৯২০ সালের ১৫ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তাঁর সাথে প্রতিমাদেবী ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গী হন।

ভারতে ইংরেজদের স্বৈরাচারী শাসন নীতি ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যালীলা রবীন্দ্রনাথের মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল এবং সেদিন তাঁর মনে পরাধীনতার শৃঙ্খলটাও যেন আরো বেশি করে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছিল। এছাড়া ইউরোপে যাওয়ার সময় লোহিত সাগরের উপকূলে এক জায়গায় তিনি দেখতে পান বড়ো বড়ো করে লেখা আছে – "Trespassers from Asia will be prosecuted." মানুষের ক্ষত যত বেশি আঘাতও সেখানে বারবার পায়। এই লেখাটি দেখার পর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত ও জঘন্যতম রূপটি আরও একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোহিতসাগর থেকে সেদিন (২৪ মে ১৯২০) তিনি এন্ড্রুজ সাহেবকে একটি চিঠি জানান,

> "We shall reach Suez this evening. ... and now I feel that we have reached a truly foreign part of the world under the rule of different gods than ours. Our hearts are strangers in this region and even the atmosphere of this place looks askance at us. The people here want us to fight their battle and supply them with our raw materials, but they keep us standing outside their doors, over which is written on the noticeboard. " Trespassers from Asia will be prosecuted." When I think of all this, my thoughts shiver with cold and I feel home-sick for the sunny corner in my Santiniketan bungalow."[৭৫]

১৯২০ সালের ২৫ বৈশাখের আগে আগে রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। আর রবীন্দ্রনাথের এবারের ৬০ তম জন্মদিন কলকাতায় পালন করা হয়। পারিবারিক বিশেষ একটি অসুবিধার জন্য এবারের জন্মদিনে কোনো অনুষ্ঠান করা হয়নি। তবে পারিবারিক অসুবিধা কী এখানে তার উল্লেখ করা হল।

এইদিন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে জমিদারি ভাগের চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উইলে উত্তর ও মধ্য বঙ্গের জমিদারি স্বত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে যান। আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১২ সালের ২৪ মে তাঁর নিজের ভাগের অংশটি বাৎসরিক

৪৫০০০/ টাকার বিনিময়ে 'ইজারা পাট্টা' করে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দান করেন। সেই জমিদারির মধ্যে বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারি দিলেন সুরেন্দ্রনাথকে আর নিজে নিলেন কালীগ্রাম পরগনা।

এই দুটি পরগনার মধ্যে কালীগ্রাম ছিল দুর্গম ও আর্থিক দিক থেকেও পিছিয়ে। কারণ এখান থেকে যে কর পাওয়া যেত তার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীর জন্য চারিদিকে অর্থ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে তিনি বিরাহিমপুরের মতো পারগনাকে সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে দিলেন। তার কারণ হল সুরেন্দ্রনাথ এর উপর তাঁর অপত্য স্নেহ। সুরেন্দ্রনাথ সেইসময় ব্যবসায় নানা দিক থেকে বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হন। তাই এস্টেট ও কৃষিব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকা ঋণ নিতে থাকে। এই বিষয়গুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি শিলাইদহ ও পদ্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছিলেন যা ছিল তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথের বিদেশে যাওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তিনি বেশ কিছুদিন থেকেই শারীরিক ও মানসিক অবসাদের জন্য কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। সেই হিসাবে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য জাহাজের টিকিট তো কাটেন। কিন্তু সানফ্রান্সিসকো হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় অকারণে রবীন্দ্রনাথের নাম টেনে আনায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে এই যাত্রা বাতিল করেন। তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আহ্বান করা হয়। তাই তিনি অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার মনস্থির করেন। কিন্তু কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করায় অস্ট্রেলিয়ার একশ্রেণির মানুষ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সফরের বিরোধিতা করতে শুরু করে। এই বিরোধিতার কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার সংকল্পও বাতিল করেন।

এমতো সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের জন্য বোম্বাইয়ে যান তখন বোমানজি তাঁকে ইংল্যান্ডে ভ্রমণের জন্য উৎসাহিত করেন এবং একপর্যায়ে বোমানজির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য রাজি হতে হয়। ইংল্যান্ডে ভ্রমণের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭ এপ্রিল রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একে চিঠিতে জানান-

> "বমানজি আমাদের বিলাতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। তাঁর ভারি ইচ্ছা আমি এবং তোরা তাঁর সঙ্গে এক জাহাজে বিলাতে যাই। ২৯ মে তারিখে জাহাজ পাওয়া যাবে আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত।"[৭৬]

কিন্তু বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা লগ্নে রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইংল্যান্ডে যেতে ইতস্তত করছিলেন। কারণ দুজনে একসঙ্গে ইংল্যান্ডে গেলে শান্তিনিকেতনের কাজকর্মে বিঘ্ন হবে, মীরা দেবীর দাম্পত্য জীবনে সমস্যার জন্য তিনি তখন শান্তিনিকেতনে এসে থাকতে শুরু করেছেন। তাই মীরা দেবীকে একা রেখে রবীন্দ্রনাথের বিলেতে যেতে মন চাইছিল না। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে প্রতিমা দেবীর ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বিলেতে গেলে ভালো হয়। আবার আমেরিকার বক্তৃতা সফরে গেলে সেখান থেকে কিছু আয়ও হবে। এই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে তিনি বিলের যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে যান। আর শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সমস্ত কাজকর্মের দায়িত্ব দিয়ে যান এন্ড্রুজ সাহেবের উপর।

নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সক্রিয়ভাবে আর ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছিলেন না। কিন্তু সেই মানুষটি ইংল্যান্ডে যাওয়ার পর দেশের কথা ভেবে, স্বাধীনতার কথা ভেবে, ভারতীয়দের উপর ইংরেজদের অত্যাচারের কথা ভেবে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তিনি সেখানে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য হলেন মন্টেগু। ৮ জুন মন্টেগুর সাথে রবীন্দ্রনাথের যে আলোচনা হয়েছিল তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথের ১৭ জুনের ডায়েরি থেকে। তিনি লিখেছেন-

> "মন্টেগুকে বাবা যা বলে এলেন তার সারমর্ম হল এইরকম: ডায়ার শাস্তি পাক ভারতের লোক সেটা তত চায় না, যতটা চায় তার এই দুষ্কৃতি, সভ্যসমাজ-বিগর্হিত এই দুর্নীতি ইংরেজদের দ্বারাই নিন্দিত হোক। ভারতের শাসনব্যবস্থা যেন এক যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে যার মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শলেশ পর্যন্ত নেই। ভারতবাসীর কাছে এই ব্যাপারটিই সবচেয়ে পীড়াদায়ক। কাঠিয়াওয়াড়ের রাজন্যবর্গের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও সেই অঞ্চলের গোরুমোষ সুদুর ব্রাজিলদেশে চালান দেওয়ার ঘটনাটি বাবা দৃষ্টান্তস্বরূপ

উল্লেখ করলেন। দুধের অভাবে কাঠিয়াওয়াড়ে যে হাজার হাজার শিশু অকালে মারা গেল– সেদিকে সরকারের লক্ষ্যমাত্র নেই। মি. মন্টেগু বললেন, পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে বাবার সঙ্গে তিনি একমত। কিন্তু তা হলেও কী হয়, সর্বদা নিজের মত অনুসারে চলার সুযোগ ও স্বাধীনতা তাঁর নেই। তিনি আরো বললেন, সরকারি শাসনযন্ত্রে এমন কিছু আভ্যন্তরিক পরিবর্তন তিনি ঘটানোর চেষ্টা করছেন যার ফলে ভবিষ্যতে জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো ব্যাপারের আর পুনরাবৃত্তি হবে না।"[৭৭]

এরপর ১৩ জুন লর্ড সিংহ ও স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এবারেও তাঁদের আলোচনার বিষয় ভারতীয় রাজনীতি। হাউজ অব কমন্সে পাঞ্জাবের অমৃতসর নিয়ে যে বিতর্ক হওয়ার কথা আছে সে বিষয়ে যে খুব একটা আশা নেই লর্ড সিংহ সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। কারণ ভারতবর্ষের হয়ে যারা কথা বলবেন সেই সোসালিস্ট ও লেবার পার্টির সদস্য সংখ্যা খুবই কম। এ কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর এক মুহূর্তও ইংল্যান্ডে থাকতে চাননি। তখন লর্ড সিংহ রবীন্দ্রনাথকে বলেন যে, আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি যদি ভারতের হয়ে কথা বলে তাহলেই ইংল্যান্ডের সরকারের এই মনোভাব পরিবর্তন করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যেই তার জন্যও চেষ্টা করতে শুরু করেন।

যা ভাবা তাই কাজ। রবীন্দ্রনাথ ১৭ জুন ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে মন্টেগু ও লর্ড সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি জার্মানি যেতে চান এ কথা তাঁদের বলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, তাঁকে জার্মানি থেকে অনেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানি যেতে চাইছেন না- শুধুমাত্র আত্মিক শান্তি লাভের জন্যই যেতে চান। যদিও মন্টেগুর এতে ব্যক্তিগতভাবে কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে জার্মানিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁকে আগে বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

১৮ জুন ম্যানহাটান রেস্তোরাঁয় রোটেনস্টাইন, মি: মিলবার্ন, আর্নেস্ট রীজ ও তাঁর বান্ধবী মিস Sawyer রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মি: মিলবার্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের ঘটনাবলীকে নিয়ে একটি বাণী রচনা করার প্রস্তাব দেন। তিনি আরো বলেন সেই বাণীটি রবীন্দ্রনাথ Young Unionist Party -র সভায় পাঠ করবেন

এবং পরে সেই বাণী ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে তা প্রচার করা হবে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আরও পরামর্শ দেন যে, তিনি লর্ড রবার্ট সিসিল, লয়েড জর্জ প্রমুখের মতো রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও দেখা করে বিষয়টি তাঁদের জানাতে পারেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, পার্লামেন্টে হান্টার রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ যদি এই কাজগুলি করতে পারেন তাহলে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথও এই কাজে সম্মত হন এবং ঠিক হয় তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে এইসব রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখবেন।

অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিশিষ্ট অস্ট্রিয়ান শিল্পবিশেষজ্ঞা Dr. Stella Kramrish (1895-1993) -র পরিচয় হয়। স্টেলাকে নিয়ে সুশোভন অধিকারী লিখেছেন,

> "স্টেলাকে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] প্রথম দেখেন সম্ভবত ১৯২০ -তেই। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টেলা এসেছিলেন অক্সফোর্ডে ভারতীয় শিল্পের উপরে বক্তৃতা দিতে। প্রথম বক্তৃতাটি ছিল হিন্দু মন্দিরের বিষয়ে। বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন লন্ডনের রয়াল কলেজ অফ আর্টের অধ্যক্ষ চিত্রকার উইলিয়ম রোটেনস্টাইন। বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথ যেচে স্টেলার সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁকে কলাভবনে যোগ দিতে আহ্বান করেন।"[৭৮]

বলাবাহুল্য, স্টেলার কাছে এই আমন্ত্রণ ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। কারণ তাঁর কাছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েনায় জীবিকা অর্জনের বিশেষ কোনো সুযোগ ছিলনা। তাছাড়া ইংল্যান্ডেও তাঁর স্থায়ী কাজ পাওয়া ছিল অনিশ্চিত। যদিও শত্রু দেশের নাগরিক হিসাবে ভারতে আসার ভিসা পাওয়াও স্টেলার পক্ষে খুব একটা সহজ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে অনেক চিঠি লেখেন স্টেলাকে সাহায্য করার জন্য। অবশেষে রোটেনস্টাইনের অনেক চেষ্টার পর দীর্ঘ নয় মাস পর স্টেলা ভারতে যাওয়ার ভিসা পান এবং ৬ পৌষ ১৩২৮ (২১ ডিসেম্বর ১৯২১) পৌষ উৎসবের আগের দিন রাতে তিনি শান্তিনিকেতনে পৌঁছান।

৮ জুলাই ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও জেনারেল ডায়ারের ঘৃণ্য কাজকর্ম ও আচার-আচরণ নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে গিয়ে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। মন্টেগু ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে চরম দক্ষতার সঙ্গে বক্তৃতা দেন ও ভারতের বাস্তব চিত্র তুলে

ধরেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের উপনিবেশবাদী সদস্যরা মন্টেগুর প্রবল বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্টেগুকে তাঁর বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ডায়ারিতে লিখেছেন, “Father wrote him [Montagu] a few lines of congratulations.”[৭৯]

হাউস অফ লর্ডসে জেনারেল ডায়ারকে যারা সমর্থন করেন সেই সব উপনিবেশবাদী সদস্যদের বক্তব্য থেকে ভারতবাসীদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ডায়েরীতে লেখেন,

> “The speeches showed how strong the feeling of race prejudice, the callousness of heart, there is among the majority of the people here especially with regard to India. Father felt it immensely. He feels there is absolutely nothing that we can expect from England- we have been deluding ourselves all this while our salvation will come as a gift from England. No, it is time that we should think of working out our own salvation.”[৮০]

এই ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইংল্যান্ড প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় মিলে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা লিখেছিলেন। সেই বার্তা দেশের সব প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়।

পার্লামেন্টের দুই কক্ষের জেনারেল ডায়ার বিতর্ক যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কতখানি আঘাত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২২ জুলাই এন্ড্রুজ সাহেবকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে।

> “The result of the Dyer debates in both Houses of Parliament makes painfully evident the attitude of mind of the ruling class of this country towards India. It shows that no outrage, however monstrous, committed against us by agents of their Government, can arouse feelings of indignation in the hearts of those from whom our governors are chosen. The unashamed condonation of brutality expressed in their speeches and echoed in their newspapers is ugly in its frightfulness. ...I feel that our appeal to your higher nature will meet with less and less response every day. I only hope that our

countrymen will not loss heart at this, but employ all their energies in the service of their country in a spirit of indomitable courage and determination. The late events have conclusively proved that our true salvation lies in our own hands, that a nation's greatness can never find its foundation in half-hearted concessions of contemptuous niggardliness. ... the one path to it is the difficult path of suffering and self-sacrifice. All great boons only come to us through the power of the immortal spirit we have within us and that spirit only proves itself by its defiance of danger and loss."[৮১]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০ জুলাই আয়ার্ল্যান্ডের সমবায় আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ Sir Horace Plunkett (1854-1932) - র সঙ্গে সমবায় কাজকর্ম নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁর মে ফেয়ারের ফ্ল্যাটে যান। সঙ্গে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ও পিয়ার্সন। রথীন্দ্রনাথ এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরেছেন তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে।

"আলোচনার মূল বিষয় হল আয়ার্ল্যাণ্ডের সমবায় আন্দোলন। স্যর হরেস বাক্‌পটু নন, কিন্তু তিনি যা বললেন তার সমস্তটাই আয়ার্ল্যান্ডের পল্লীসংস্কারের কাজে তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি একাধারে আদর্শনিষ্ঠ ও বাস্তববাদী মানুষ। তাঁর অনেক কল্পনা তিনি বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছেন- এ তাঁর কম কৃতিত্ব নয়। তিনি বললেন, গোড়ায় তাঁরা ভুলচুক যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু এও একপ্রকার ঠেকে শেখা। এখন তিনি স্পষ্ট বলতে পারেন, কোন্ কোন্ ভুলের দরুন কী কী বিষয়ে তিনি ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু রীতি হিসাবে সমবায়প্রথার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই- এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। আবার যদি গোড়া থেকে কাজ করার সুযোগ হত তাঁর, তবে ঠিক বলতে পারতেন কোন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে, কোথায় কী রকম আটঘাট বাঁধতে হবে। তিনি বললেন, পশ্চিম আয়ার্ল্যাণ্ড অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের অবস্থার অনেক মিল আছে। ... সমবায়নীতির গোড়াকার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, আর্থিক ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের সঙ্গে যেভাবে মিলতে পারে, তেমনটা বোধ হয় ধর্মের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। আমাদের ডেনমার্ক যাবার পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানাতে তিনি বললেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে তিনি যখন কাজ শুরু করেন তখন ডেনমার্কে অনুসৃত রীতিপদ্ধতি অবিকল অনুসরণ করেছিলেন। ডেনমার্কের পরিবেশ আয়ার্ল্যাণ্ডের তুলনায় সমবায়ের দিক থেকে অনেক বেশি অনুকূল, তাই এই-সব রীতিপদ্ধতি আয়ার্ল্যাণ্ডে সবসময় কার্যকর হয় নি। তাঁর মতে আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকে

ভারত যতটা শিখতে পারবে ততটা ডেনমার্ক থেকে সম্ভব হবে না। কোথায় কী বাধাবিপত্তি ঘটতে পারে, কেমন করে তার নিরাকরণ করা যায়- এটাই হল শিক্ষণীয় বিষয়। সে শিক্ষার বেশি সুযোগ মিলবে আয়ার্ল্যান্ডে। তাঁর মতে সর্বাগ্রে দরকার স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও জনসাধারণের সত্যিকার প্রয়োজন বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান। তার পর কোনো একটি বিশেষ কার্যক্রম নিয়ে নামতে হয় এবং সেই একটি কাজ সফল করে তুলতে হয়। নানা কাজ হাতে নিয়ে প্রথমেই অকৃতকার্য হলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। তাতে কাজেরও ক্ষতি।"[৮২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রথীন্দ্রনাথ তখন এদেশে তাঁদের জমিদারিতে ও শান্তিনিকেতনে এই সমবায় প্রথা প্রবর্তনের অনেক চেষ্টা করছিলেন। তাই স্যার হরেস যখন তাঁদের আয়ার্ল্যান্ডে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান তখন তাঁরা সহজেই রাজি হয়ে যান। যদিও বিভিন্ন কারণে তাঁরা আয়ার্ল্যান্ডে যেতে পারেননি।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংল্যান্ড ছেড়ে সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রকৃতি দেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন। ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় তাঁরা প্যারিসে পৌঁছান। রবীন্দ্রনাথের প্যারিসে পৌঁছানোর খবর পেয়ে অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দুইবোন আঁদ্রে ও সুজান কার্পেলেস অন্যতম। যদিও এদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির আগেই পরিচয় ছিল কারণ তাঁরা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে গেছেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন প্রাচ্যবিদ সিলভ্যাঁ লেভি-র ছাত্রী। আঁদ্রের ইচ্ছে ছিলো রবীন্দ্রনাথের কিছু ছবি আঁকা ও সুজান চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'কথিকা' (লিপিকা)-র কবিতাগুলি ফরাসিতে অনুবাদ করতে। যদিও এই কবিতাগুলি তখনও পর্যন্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলিকে মুখে মুখে ইংরেজিতে অনুবাদ করে যেতেন আর সুজান সেগুলিকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করতেন। আঁদ্রের সাহায্যে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুররা ফ্রান্সের তৎকালীন শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেজান, মানে, রেনোয়া, গোগ্যাঁ, ভ্যান গঘ, রঁদ্যা প্রমুখ ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাজ তখন প্যারিসে প্রচণ্ড বিতর্ক তৈরি করে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এদের কাজ তখন কোনো শিল্প প্রদর্শনীতে দেখানোর অনুমতি ছিল না। তাই আঁদ্রে কার্পেলেস তাঁদেরকে একটি ছবি বিক্রির দোকানে নিয়ে গিয়ে সেখানে এই শিল্পীদের অনেকগুলি ছবি দেখার সুযোগ করে দেন। এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'The effect on us was overwhelming. Van Gogh especially impressed me.'[৮৩]

প্যারিসে থাকাকালীন সময়ে বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৫৩-১৯৩৫) সপ্তাহে দুদিন ক'রে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন। লেভির খুব ইচ্ছে হল্যান্ড ভ্রমণের পর ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ফ্রান্সে আসবেন তখন তিনি সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দেন। সিলভ্যাঁ লেভির নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাড়িতেও অনেকবার গেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। সেই আন্তরিকতার সূত্রেই তিনি সিলভ্যাঁ লেভিকে বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। বলাবাহুল্য লেভি সে প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সিলভ্যাঁ লেভির সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেনকে ২১ আগস্ট একটি চিঠিতে লেখেন-

> "এখানে এসে প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হচ্চে। অধ্যাপক Sylvain Levi র নাম নিশ্চয়ই শুনেচেন। ... এমন সরল ও উদারচিত পন্ডিত আমি দেখিনি।"[৮৪]

আবার ২৮ আগস্ট এন্ড্রুজ সাহেবকে অন্য একটি চিঠিতে জানান,

> "He is a great scholar as you know, but his heart is larger even than his intellect and his learning. His philosophy has not been able to wither his soul. His mind has the translucent simplicity of greatness and his heart is overflowing with trustful generosity which will never acknowledge disillusionment. His students come to love the subject he teaches them because they love him."[৮৫]

ক্ষিতিমোহন সেনকেও তিনি ২১ আগস্ট একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তা যেন বিশ্বভারতীকে নিয়ে এক প্রকার ভবিষ্যৎ বাণী।

"আমার সমস্ত কাজের ধারা এখন পশ্চিম বাহিনী হয়ে বইচে...। আশা করচি এখানে যা আয়োজন করা যাচ্চে শান্তিনিকেতনেই তার পরিসমাপ্তি হবে। একদিন যুরোপকেও সেখানে আতিথ্য দান করতে হবে তার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। সেই জন্যে আপনাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আশ্রমের যজ্ঞস্থলীকে আপনারা প্রশস্ত করবেন- প্রতিদিনই বিরাট এর আগমনের প্রতীক্ষা করবেন।"[৮৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এই সময়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। তাই প্রায় মাস দুয়েক তিনি নিয়মিত ডায়েরি লিখতে পারেননি। তাই এই সময়ের অনেক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

২৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ হল্যান্ডের University of Leiden -এ একটি বক্তৃতা দিতে যান। এখানে তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় অভ্যর্থনা করা হয় যা রবীন্দ্রনাথের কাছে খুবই চমকপ্রদ লাগে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক Dr. J. Ph. Vogel, আরবি সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত Jonkheer Snouck Hurgronje প্রমুখের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। ২৭ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক ভোগেল রবীন্দ্রনাথকে তাঁর একটি গবেষণাপত্র পাঠান এবং চিঠিতে লেখেন-

"Please consider my paper at the same time as a memento of your visit to Leiden which afforded me a welcome opportunity for making your acquaintance."[৮৭]

এইসব বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়ে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে লেখেন-

"আপনি ভয় পাবেন না, বিশ্বভারতীর উদ্যোগ পর্ব সমুদ্রের দুইতীরেই চলছে।... এ পর্যন্ত আমাদের কাজ যতদূর অগ্রসর হয়েছে তাতে আমার মন আশায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। অচিরে আপনারা আমার ভ্রমণের ফল দেখতে পাবেন।... এখানে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে এসেছিলেম, কাল আমার সেখানকার কাজ হয়ে গেছে, আগামীকাল এখানে আমস্টারডামের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার আমন্ত্রণ আছে।

এই সকল বক্তৃতার ভিতর দিয়ে যে সব পথ কাটা হচ্চে সমস্ত পথই শান্তিনিকেতনের অভিমুখে। এ আমার কবিকল্পনামাত্র নয়- সকল সংবাদ যখন জানবেন তখন আপনাদের সংশয় দূর হবে।"[৮৮]

হল্যান্ডে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীমতী হেলেন ও তাঁর স্বামী হাইনরিশ মায়ার-ফ্রাঙ্ক দেখা করতে আসেন। হেলেনের স্বামী হাইনরিশ ছিলেন ইংলিশ, গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, সংস্কৃত প্রকৃতি ভাষায় পণ্ডিত এবং তাঁর গবেষণার বিষয়ও ছিল ভাষাতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই মায়ার দম্পতির প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা জানান যে, ইউরোপের মানুষের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনো যোগ নেই। কিন্তু জার্মানির সঙ্গে ভারতের আদর্শের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়। এদের সঙ্গে আলোচনার ফলেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ জার্মান ভাষার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে জার্মান ভাষা শেখানোর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে উদ্যোগী হন। আরো ভালো হয় যদি সেই শিক্ষক জার্মান ভাষার পাশাপাশি জার্মান সঙ্গীতও শেখাতে পারেন। এছাড়া তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে জার্মান ভাষায় লেখা ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচীন ইতিহাসের সমস্ত গ্রন্থের একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। এমনকি তাঁর পরবর্তী আশা ছিল ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত অধ্যয়নে ইচ্ছুক জার্মান ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে সমবেত হবেন।

১৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ রটারডামের একটি গির্জায় বক্তৃতায় দিতে যান। গির্জায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এই গির্জায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন "The Meeting of the East and West" প্রবন্ধটি গির্জার বেদী থেকে পাঠ করেন। গির্জার বেদী থেকে প্রবন্ধ পাঠ করার এই সম্মান এর আগে কোনো অ-খ্রিস্টানকে দেওয়া হয়নি।

হল্যান্ডের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। হল্যান্ড সফর শেষ হলে সেখানকার অভ্যর্থনা কমিটির অন্যতম সদস্য Jose Vigeveno রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ৩৬২৩.৫০ ফ্রাঙ্ক তুলে দেন।

হল্যান্ডে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানকার মানুষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩ অক্টোবর বেলজিয়ামে যান ও ৪ অক্টোবর ব্রাসেলসের বিচারালয় Palais de Justice -এ রবীন্দ্রনাথ আবার “The Meeting of the East and West” প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেদিন বক্তৃতা শুরু হওয়ার আগেই অসংখ্য মানুষের ভিড়ে হলটি ভর্তি হয়ে যায়, একটিও আসন খালি ছিল না। এমনকি জানালার ধাপ ও মঞ্চে ওঠার সিঁড়িতেও দর্শকেরা বসেছিলেন। এই প্রবন্ধটি বেলজিয়ামের মানুষদের যে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরের দিন একজন অপরিচিত ব্যক্তির চিঠি থেকে। তিনি লেখেন-

> “For those who suffered with you when the savage clapping of hands interrupted the vibrations of your voice; for those who wish heartily the real meeting of East and West, in purity of Love and Peace, ... Thank you, Brother.”[৮৯]

ব্রাসেলস ও ইউরোপের সাধারণ মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা ও সমাদর পেয়ে সেই অভিজ্ঞতারই বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ অক্টোবর রোদেন্স্টাইনকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন যার প্রতিটি পংক্তিই ছিল সমকালীন ব্রিটিশ রাজনীতির প্রতি তীব্র ধিক্কার।

> “...The welcome which has been accorded to me in all the countries that I have travelled in Europe has been deeply genuine and generous to the extreme. This makes it delightfully easy for me to give out the best that I have in me in an easy flow of communication. .... I feel it clear that my relationship with the Continental Europe is natural and unobstructed, being disinterested. In England, I have distinctly felt in my last visit, it is obscured owing. I am sure, to the politics that ever stands between our people and yours, consciously or unconsciously. I have nothing to do directly with politics, I am not a Nationalist, moderate or immoderate in my political doctrine or aspiration. But politics is not a mere abstraction, it has its personality and it does intrude into my life where I am human.”[৯০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন কবি ও সাহিত্যিক হয়েও শতাব্দী ব্যাপী শোষণ ও নির্মম অত্যাচার দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। তাই তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও তার নিজের মতামত রেখেছেন। Esher Commission -এর সামরিক খাতে ব্যয়ের রিপোর্ট ও রিফর্ম বিলকে তিনি 'cruel mockery' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের সমস্ত সম্পদ শোষণ করার পর নামমাত্র কিছু অর্থ দিয়ে ভারতের শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়ন করতে চাওয়া এক ধরনের পরিহাস। আর যখন এই সামান্য টাকায় ভারতের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয় না, তখন প্রচার করা হয় ভারতীয়রা অর্থ ও ক্ষমতা পেলেও তা কাজে লাগাতে পারে না। এরপরই তিনি ওই চিঠিতে ভবিষ্যৎবাণীর মতো আরও বলেন-

> "But you must know that the downfall of your Empire is imminent when the moral downfall of your people is proceeding in a rapid pace. It is natural that you will put more and more faith upon brute force for holding together your unwieldy Empire, making it so monstrously ugly that the whole outraged world will pull it down to disgust. Your bloated prosperity is a barrier that prevents you to see what bearers of doom are silently marshalling their forces against you till the sudden signal is given from the dark."[৯১]

এই চিঠির কোনো উত্তর রোদেস্টাইন দিয়েছিলেন বা দিতে পেরেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। সত্যি কথা বলতে, কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে হয়তো এই চিঠির উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ২৮ অক্টোবর আমেরিকায় এসে পৌঁছান এবং Hotel Algonquin -এ অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বলে এসেছেন যে, বলশেভিকদের মধ্যে স্বার্থপরতার ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রকট। আর এই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক মনোভাবই রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকাবাসীর কাছে ক'রে তুলেছিল অপ্রিয়। তাই হয়তো বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভিন্ন সাক্ষাৎকারে রাজনৈতিক প্রসঙ্গটি চলে এসেছে বারবার। ২ নভেম্বর New York Call পত্রিকায় 'Tagore in U.S., Tells of British Crimes' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের তেমনই একটি বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।

> "It is natural to expect that the movement will meet with violence by the ruling power at some time or other. But the idea of resistance will have been tried before this happens.

... And if we can stand firm in our faith, then we shall win over those who use brute force.

Now and the immediate future will be a terrible trial for India. Because physical force has assumed such tremendous proportions now, and it has the power to cause such widespread havoc and misery, that it will require all our moral force and strength of spirit to withstand it, and to pass through the great suffering which is sure to come to us."[৯২]

যে রবীন্দ্রনাথ ২ নভেম্বর আমেরিকায় সাংবাদিকদের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন সেই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শান্তিনিকেতনে খিলাফত আন্দোলনের নেতা সৌকত আলির আসার খবর শুনে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি ৪ নভেম্বর অ্যান্ডরুজকে লেখেন-

"Keep Santiniketan away from the turmoils of politics. I know, that the political problem is growing in intensity in India and its encroachment is difficult to resist. But, all the same we must never forget that our mission is not political. Where I have my politics. I do not belong to Santiniketan.

...If Shaukat Ali can come to Santiniketan and talk to our boys about his fanatical programme then it will be difficult for me to ask students from all parts of the world to come there and accept from India her gift of peace and wisdom."[৯৩]

এরপর থেকে অসহযোগ আন্দোলনের বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত পরিবর্তন হতে শুরু করে।

রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করার পর তাঁর মনে হয়েছিল আমেরিকার মানুষ হয়তো তাঁকে আর ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর সেই ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৫ নভেম্বর অ্যান্ডরুজকে লেখা পিয়ার্সনের একটি চিঠি থেকে। পিয়ারসন জানান যে, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক তিনদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে পৌঁছান। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো একটি রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হয়নি। তিনি চিঠিতে

লেখেন, "The idea that there is any strong feeling against him seems to be almost entirely a myth."[১৪]

৬ নভেম্বর সকালে পিয়ারসন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে কোয়েকার-সম্প্রদায়ের Society of friends -এর একটি সভায় উপস্থিত হন। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন সমাজসেবী ও শান্তিবাদী। পিয়ারসন নিজেও এই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এখানে তিনি শান্তিনিকেতনের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি বক্তৃতা দেন। তারপর ১০ নভেম্বর ব্রুকলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ব্রুকলিন অ্যাকাডেমি অব্ মিউজিক হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটিই ছিল এই পর্বের ভ্রমণকালে অর্থের বিনিময়ে প্রথম বক্তৃতা। ১২ নভেম্বর পূর্ব নির্ধারিত ফিলাডেলফিয়ায় Bryn Mawr মহিলা কলেজে 'The Village Mystics of Bengal' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই বক্তৃতার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ৩০০ ডলার সাম্মানিক দেওয়ার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠনের একটি প্রান্ত যদি হয়ে থাকে শিলাইদহ। তবে অন্য ক্ষেত্রটি হল শ্রীনিকেতনে পল্লি-পুনর্গঠন। শ্রীনিকেতন হল রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। এটি ছিল প্রকৃতির কোলে মুক্তমনে শিশুদের গুরুকুলের প্রাচীন ঐতিহ্যকে মেনে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রটি পরবর্তীকালে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পরিণত হয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর সামাজিক কর্মের অঙ্গ হিসেবে তৈরি হয় শ্রীনিকেতন। কারণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনে সমাজ, দেশের উন্নতি, সাধারণ মানুষের উন্নতি ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছে।

১৯২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর টেলফাস্টের নেতৃত্বে Provisional Board of Directors, Department of Agriculture -এর একটি সভা বসে। সেখানে গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে অনেকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে এই সমিতি 'শ্রীনিকেতন সমিতি' নামে পরিচিত হয়। ১৯২২ সালে এই সমিতি আরো একটি সভা আয়োজন করে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি এফ অ্যান্ড্রুজ, লেনার্ড এনহাস্‌ড সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ক্ষিতিমোহন সেন, সন্তোষ মজুমদার গৌড় গোপাল ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ কর এবং কালীমোহন ঘোষদের মতো ব্যক্তিত্বরা। এই সভার

অধ্যক্ষ ছিলেন এলমহার্স্ট এবং সম্পাদক ছিলেন সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার। পরবর্তীকালে নন্দলাল বসু এই সমিতির সাথে যুক্ত হন। পল্লির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পল্লিবাসী কল্যাণ ছিল এই সমিতির প্রধান কাজ।

রবীন্দ্রনাথের সাথে আমেরিকায় সাক্ষাৎ হয় লেনার্ড নাইট এলমহার্স্টের। এলমহার্স্ট ভারতের কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তিনি এলাহাবাদে আমেরিকান কৃষি বিজ্ঞানী Sam Higginbottom -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা, কৃষক ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে উৎসাহী এই আমেরিকান তরুণের কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাক্ষাতের জন্য ডাক পাঠান এবং শান্তিনিকেতনে পল্লি-পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানান।

শান্তিনিকেতনে যেমন একের পর এক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শান্তিনিকেতনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করে তেমনি শ্রীনিকেতনেও একের পর এক বিভাগ তৈরি হয়েছিল। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার সময় গ্রাম সেবা বিভাগ এবং সুরুল বিভাগ নামে দুটি বিভাগ ছিল। পরে একে একে শিল্প ভবন, শিক্ষাসত্র, গ্রাম সমীক্ষা, শিক্ষাচর্চা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগগুলি বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেমন স্বাস্থ্য উন্নয়ন, নারী কল্যাণ, আদিবাসী কল্যাণ, পরিজন উন্নয়ন ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩৬ সালে লোকশিক্ষা সংসদ বা গ্রামের লোকেদের জন্য এক ধরনের প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। যদিও শিল্প ভবন, শিক্ষাসত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে ১৯২৩ শিল্প ভবন এবং ১৯২৭ সালে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়।

শ্রীনিকেতনের পল্লি-উন্নয়নের কর্মকাণ্ড যে বাড়িটি থেকে শুরু হয়েছিল সেটি হল সুরুল কুঠিবাড়ি। ১৯২২ সালের জুলাই মাসে এই কুঠিবাড়িতে শ্রীনিকেতন সমিতির বা প্রথম সুরুল সমিতি সভার আয়োজন করা হয়। সেদিনের সভায় উপস্থিত ১১ জন সদস্যরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং, সি এফ অ্যান্ড্রুজ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ক্ষিতিমোহন সেন, লেনার্ড এলমহার্স্ট, কালী মোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ কর, গৌড় গোপাল ঘোষ এবং সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার। পরবর্তীকালে নন্দলাল বসু বোর্ড অফ ডিরেক্টরস সদস্য হন এবং সম্পাদক ও অধ্যক্ষের পদে যথাক্রমে নির্বাচিত হন সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার ও এলমহার্স্ট।

এলমহার্স্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রীনিকেতনের পল্লি-উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কারণ তিনি কখনও শ্রীনিকেতনে উপস্থিত থেকে সরাসরি কাজে যুক্ত থেকেছেন আবার কখনো (১৯২৩ সালের মার্চ থেকে

নভেম্বর পর্যন্ত) আমেরিকায় থেকেছেন শ্রীনিকেতনের উন্নয়নের জন্য টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে। ১৯২৪ এর পরও এলমহার্স্ট বেশ কয়েকবার শ্রীনিকেতনে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অর্থ সাহায্যতেই শ্রীনিকেতনের কাজ শুরু হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও ১৯৪৭ পর্যন্ত সেই কাজ চালু ছিল।

১৯২৪ সালের ৮ মার্চ শ্রীনিকেতন সমিতির যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে উপস্থিত ব্যক্তিত্বরা হলেন এলমহার্স্ট (Director), প্রেমচাঁদ লাল (Dy. Dir.), মিস গ্রেচেন গ্রিন (Medical Officer), কালী মোহন ঘোষ, ধীরানন্দ রায়, ভি ভেদনেকার, উপেন্দ্রনাথ বোস, ডক্টর রাইডার, ডক্টর মুখার্জি, কে খাম্বাটা, ও এম এন মজুমদার, এস মুখার্জি, সি গাঙ্গুলী ও ভট্টাচার্য, শচীন ভৌমিক, সন্তোষ কুমার মিত্র, জি জি আদবানি, সন্তোষ বিহারী বসু, মনীন্দ্র চন্দ্র রায়, কে কাসাহারা এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে গৌড় গোপাল ঘোষ, হাসিম আমির আলী, হ্যারি টিম্বার্স, আর্থার ও প্যাট্রিক গেডেস, বিনায়ক মাসজি, কেদারেশ্বর গুহ, আরিয়াম উইলিয়াম, মনীন্দ্র চন্দ্র সেন প্রমুখরা বিভিন্ন সময়ে পল্লিসেবা বিভাগ, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন সমবায় ব্যাংক, পল্লিসমীক্ষা বিভাগ, শিল্প ভবন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পল্লিসমীক্ষা বিভাগের সমীক্ষকরা ছিলেন সন্তোষ রায়, ননীবালা রায়, ধীরানন্দ রায়, অবনী কুমার মুখার্জি, অধীর মজুমদার, উষার অঞ্জন দত্ত, শক্তিপদ সরকার, ফণীভূষণ ঘোষ, হেমন্ত কুমার সরকার, জ্ঞানদাস ঘোষ ও আরো অনেকে। গ্রাম কর্মীদের মধ্যে শ্রীনিকেতনের দায়িত্বে থাকা ডাক্তারবাবু যতীন চক্রবর্তী ও গ্রামের স্বাস্থ্য সমবায়ের একাধিক ডাক্তার যথা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র কুমার মুখার্জি, আনন্দমোহন গুহ, বংশীধর মজুমদার, রাধাকান্ত সিংহ প্রমুখরা শ্রীনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন এবং এই তালিকা উত্তরোত্তর দীর্ঘ হয়েছে। যখনই কোনো ব্যক্তিত্ব সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা বিভিন্নভাবে শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রীনিকেতনকেই সমৃদ্ধ করে গেছেন।

শ্রীনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় ১৯২২ সাল থেকে। কিন্তু একদিনে সে তার পূর্ণরূপ পায়নি। ধীরে ধীরে কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি শিক্ষা, পল্লিসেবা বিভাগ নির্মাণ প্রভৃতি একের পর এক পল্লি-পুনর্গঠনমূলক কাজের মাধ্যমেই শ্রীনিকেতন তার পূর্ণতা পেয়েছে। যে তিনটি গ্রামকে নিয়ে শ্রীনিকেতনের পল্লি-পুনর্গঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই তিনটি গ্রাম হল ভুবনডাঙ্গা, সুরুল ও মহিদাপুর বা মোদপুর। এরপর ধীরে ধীরে গ্রাম ও এলাকার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামগুলিতে মেয়েদের স্কুল, শিল্প ভবন, সমবায় স্থাপন, গ্রাম সমীক্ষা গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি বিভাগ কাজ শুরু করে। স্বাস্থ্য সমিতি দিয়ে যে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ শুরু হয় তা ১৯৩২ গিয়ে স্বাস্থ্য সমবায় সমিতিতে (Health Cooperative Society)

পরিণত হয়। শ্রীনিকেতনের কাজ পরিচালনার জন্য যে কর্মীমণ্ডলী ছিল তার সংখ্যাও সময়ের সাথে সাথে কখনো হ্রাস পেয়েছে কখনো আবার বৃদ্ধিও পেয়েছে। যদিও ১৯২৪ ও ১৯৩১ সালে ব্যয় সংকোচনের জন্য অনেক কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছিল। এমনকি প্রতিষ্ঠানবিরোধী কাজের জন্যও কর্মী ছাঁটাই হতো।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ১৯৪২ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে- সেই সময়ে শ্রীনিকেতন শিল্প ভবনের আয় বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এমনকি শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের সংখ্যাও পাওয়া যায় দীক্ষিত সিনহার 'রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস' গ্রন্থটি থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- শ্রীনিকেতন সচিব, সুকুমার চ্যাটার্জী- সহ সচিব, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য- সহ সচিব শিল্প ভবন (১৩/০২/১৯৪৩ থেকে), অফিস- ৫ জন, রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র- ৪ জন, গ্রাম কল্যাণ বিভাগ- ১৪ জন, কৃষি বিভাগ- ৪ জন, চিকিৎসা বিভাগ- ৮ জন, শিক্ষা বিভাগ- ৮ জন, শিল্প ভবন- তাঁত ২ জন, হস্তশিল্প- ৬ জন, কাঠের কাজ- ৩ জন, বিপণন বিভাগ- ৪ জন, ভাঁড়ার ঘর (স্টোর)- ৫ জন, শিল্প ভবন অফিস- ৩ জন এবং অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্র- ৪ জন।

শ্রীনিকেতনের পল্লি-পুনর্গঠন বা রুরাল রিকনস্ট্রাকশন শব্দবন্ধগুলি অনেক পরে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে যে বিভাগটি ছিল সেটি 'ভিলেজ ওয়েলফেয়ার' বিভাগ নামে পরিচিত ছিল। এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন কালী মোহন ঘোষ। গৌর গোপাল ঘোষ ইউরোপ থেকে কো-অপারেটিভ ব্যাংক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন এবং ১৯২৮ সালে জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত সমবায় ব্যাংকের প্রথম সহ-সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর সমবায় ব্যাংকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিককার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি শিক্ষা। এই কৃষি বিভাগের অধীনস্থ ছিল ডেয়ারি, পোল্ট্রি ইত্যাদি বিভাগ। ১৯২৫ সাল থেকে তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের কর্মী সন্তোষ বিহারী বসু এই কৃষি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

অন্যদিকে সন্তোষ কুমার মিত্র শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই সুরুলে থাকতেন। তিনি ডেয়ারি বা গোশালার দায়িত্ব নেন। অন্যদিকে গোপাল চন্দ্র বোস দায়িত্ব নেন পোল্ট্রি বিভাগের। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কৃষি খামারের দায়িত্বে এবং এই সবকিছুর মাঝে শিক্ষাসত্র দায়িত্ব নিয়েছিল শিক্ষা সম্প্রসারণের। শিল্প ভবন ছিল শিল্প প্রসারের মূল দায়িত্বে। আর এই প্রত্যেকটি বিভাগ যুক্ত ছিল গ্রামোন্নয়ন বিভাগের

সঙ্গে। সমস্ত কাজ পরিচালনা হতো শ্রীনিকেতন সচিবের মাধ্যমে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিকেতনেরও অনেক গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। শ্রীনিকেতনের প্রতি তাঁর এই অনুরাগের কারণ ছিল তাঁর গ্রামীণ শিল্পগুলির প্রতি ভালোবাসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ১৯২৭, ১৯৩৩ ও তার পরবর্তীকালেও শ্রীনিকেতনের কাজের ওপর সরাসরি নজর রাখতেন। এমনকি তিনি সরাসরি সচিবের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। যদিও বেশিরভাগ সময়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের সাথে একটানা খুব বেশি দিন ধরে সরাসরি যুক্ত থাকতে পারতেন না। তবে সুযোগ পেলেই তিনি শ্রীনিকেতনে কাসাহারার তৈরি গাছ বাড়িতে (কুঠিবাড়ি) থেকে শ্রীনিকেতনের গ্রামীণ পুনর্গঠনের কর্মকাণ্ড ও তার অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করতেন।

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারের অকাল মৃত্যর পর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনিকেতন পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ১৯৩০ সাল থেকে গৌর গোপাল ঘোষ সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর আবার ১৯৩৪ সালে রথীন্দ্রনাথ সচিবের দায়িত্বে আসেন।

বারবার এই পদ পরিবর্তনের পেছনে দায়ী ছিল যেমন কারোর অকালমৃত্যু তেমনি শ্রীনিকেতনের মূল লক্ষ্য কী হবে সেই উদ্দেশ্যটি স্থির করার জন্য এই পদের বারবার পরিবর্তন হয়েছে। শুরুতে শিক্ষা ও পল্লি-পুনর্গঠন শ্রীনিকেতনের প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাণিজ্যিক সাফল্য। এই বাণিজ্যিক সফলতার যাত্রা শুরু হয়েছিল কৃষি বিভাগ ও শিল্প ভবন থেকে। ফলে প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রীনিকেতনের লক্ষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর এই স্ববিরোধিতা প্রভাব ফেলে প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজগুলির উপর। যদিও পল্লি-উন্নয়নকে কীভাবে বাণিজ্যিক সফলতায় কাজে লাগানো যেতে পারে তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে শান্তিনিকেতনকে তার সম্পূর্ণ রূপ পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কারণ শান্তিনিকেতনের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। তাই তার লক্ষ্যের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধিতা ছিলনা। তাই শ্রীনিকেতন কখনো পল্লিসম্প্রসারণকে প্রধান রূপে রেখে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আবার কখনো শিল্প ভবন, কৃষি বিভাগ ইত্যাদিকে নিয়ে বাণিজ্যিক সাফল্যের দিকে গিয়েছে। তাই শ্রীনিকেতনকে কেবলমাত্র পল্লি-উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে নাকি বাণিজ্যিক সাফল্যের কথাও ভাবতে হবে- এই

দুটি বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কারণ লোকের সঙ্গে সঙ্গে কাজের ক্ষেত্র এবং কাজের বিভাজনে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক।

শ্রীনিকেতনের শুরুর দিকে প্রত্যেকটি বিভাগের মূল লক্ষ্য ছিল পল্লি-পুনর্গঠনে সহায়তা করা। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে সমস্ত বিভাগ এই লক্ষ্যের সঙ্গে স্থির থাকতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে আসে শিক্ষাসত্র ও শিল্প ভবনের কথা। যেমন শিল্প ভবনের মূলকাজ ছিল গ্রামের মানুষের মধ্যে কুটির শিল্পের উৎসাহ দেওয়া এবং তার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবিকা এবং জীবনের উন্নতি আনা। কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্প ভবনকে স্বতন্ত্র লাভজনক সংস্থায় পরিণত করার চেষ্টা করা হয় এবং শ্রীনিকেতন থেকে আলাদা করে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। তবে শিক্ষাসত্রের আদর্শ ঠিক করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

> "Siksha-Satra is the natural outcome of some years of educational experiment at Santiniketan and at the Institute of Rural Reconstruction at Sriniketan. Here an attempt is being made to give an all-round education to village children and provide them with training which will not only enable them to earn a decent livelihood but also to equip them with the necessary training and creative imagination with which they help to improve the rural life of Bengal in all its aspects."[৯৫]

শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠানটি তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে তার সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করত। প্রথম স্তর হল কোনো কাজের মূল দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, এদের নিচে থাকে প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার জন্য ব্যক্তিবর্গ এবং তৃতীয় বা সর্বনিম্ন স্তরে থাকে সেই সব ব্যক্তিরা যারা সঠিকভাবে আজ্ঞা পালনের মাধ্যমে পরিকল্পনাটিকে কাজে রূপান্তরিত করে। শ্রীনিকেতনের দ্বন্দ্ব ছিল দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিদের নিয়ে। গ্রামোন্নয়নের কাজের জন্য এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিদের অভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের মধ্যে একটি যোগাযোগ বা ভাবের আদান-প্রদানের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীনিকেতনের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে এরকম চড়াই-উৎরাই যে স্বাভাবিক তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও অজানা ছিলনা। তাই তিনি শ্রীনিকেতনকে তার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন আবার কখনো শ্রীনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এলমহার্স্টকে লেখা একাধিক চিঠিই শ্রীনিকেতনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাগুলির প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠনের দ্বিতীয় ধাপটি ছিল শ্রীনিকেতনের পল্লি-উন্নয়ন। বীরভূমের এক অখ্যাত গ্রাম সুরুল ও তার পাশের আরেকটি গ্রাম ভুবনডাঙ্গা এই গ্রামগুলিকে নিয়েই শুরু হয়েছিল পল্লি-পুনর্গঠনের যাত্রা। কিন্তু পল্লি-পুনর্গঠনের পূর্বে বোলপুর শহর থেকে দূরে এই গ্রামগুলির আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন ছিল বা এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপন কেমন ছিল তা জানার প্রয়োজন আছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ পল্লি-পুনর্গঠনের মাধ্যমে কীভাবে তাদের উন্নতি ঘটালেন তা জানার জন্য তাদের পূর্বাবস্থা জানা প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে শ্রীনিকেতনের কাজ শুরু হয়েছিল বোলপুর শহরের কাছাকাছি অবস্থিত একটি গ্রাম সুরুল থেকে। এই অঞ্চলটি ছিল বীরভূমে দক্ষিণ দিকে। রাঢ়বঙ্গের এই অংশটি ছিল তুলনামূলকভাবে উর্বর। মূলত হিন্দু-মুসলমান ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল এখানকার গ্রামগুলি। ফলে এক মিশ্র সামাজিক কাঠামো বিরাজ করতো গ্রামগুলিতে এবং ভারতের অন্যান্য গ্রামের মতো গ্রামের মূল প্রাণ সংঘবদ্ধতা এখানেও দিনের-পর-দিন কমে আসছিল। প্রায়ই মহামারি, খরা, বন্যা, দারিদ্র প্রভৃতি অসহায়তা গ্রামগুলিকে গ্রাস করছিল। তবে প্রান্তিক অঞ্চলটিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ববঙ্গের চেয়ে যে আলাদা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীনিকেতনের পল্লি-উন্নয়নের অন্যতম সঙ্গী এলমহার্স্ট সব সময় গ্রামগুলির সঠিক অবস্থা বোঝার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

যদি ব্রিটিশ আমল থেকে বীরভূমের দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যায় ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পরপরই বীরভূমের অর্থনৈতিক পতন ঘটতে থাকে। হয়তো অর্থনীতি থমকে থাকেনি কিন্তু ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে তা ক্রমশ খারাপের দিকে এগিয়ে যায়। এই সময়কার ভৌগোলিক মানচিত্রে দেখা যায় জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ ছিল জঙ্গলময় এবং এই অংশটি জঙ্গলমহলের অংশ হিসেবেই বিবেচিত হতো। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ই জি ড্রেক ব্রক ম্যান 'Notes on the early administration about the district at Birbhum' এ বীরভূমের চাষযোগ্য জমির কথা উল্লেখ করেছেন, এই সময় যতটা জমি চাষ

হতো তার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি জমি ছিল চাষের অযোগ্য, এছাড়াও জঙ্গলের লাগোয়া হওয়ায় হাতির পাল ও অন্যান্য হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের রাজা মোহাম্মদ জামান খান নগর যেটি তখনকার রাজার শহর ছিল, সেখানে তিনি বাস করতেন এবং সেটির আয়তন ছিল খুবই ছোটো। মুঘল আমলেও বীরভূমের অর্থনৈতিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। কারণ বীরভূমে একটিমাত্র রাজা বা জমিদার ছিলেন। আর বীরভূমের বেশিরভাগ জমি চাষযোগ্যহীন হওয়ায় খাজনা আদায় হতো খুবই সামান্য। আর সেটুকু খাজনা মুঘলদের দেওয়ার পর অন্য কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

বীরভূমে বিভিন্ন ধরনের শস্যের চাষ হতো। তসরের চাষ বীরভূমের একটি অর্থকরী চাষ ছিল। তবে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের পর বীরভূম জেলার এই চাষের বৈচিত্র্য হারিয়ে যায়। চাষবাস মূলত ধান চাষের ওপরেই নির্ভর হয়ে পড়ে। তখন মূলত অন্ন কষ্ট দূর করার জন্যই কৃষকরা শুধুমাত্র ধানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। একটিমাত্র রাস্তা ছিল যেটির মাধ্যমে গরুর গাড়ি করে বোলপুরের কাছাকাছি অবস্থিত সুরুল গ্রাম হয়ে বর্ধমান পর্যন্ত যাতায়াত করা যেত। এইরকম এক অবস্থা থেকেই শুরু হয় পুনর্গঠনের কাজ। তবে পরবর্তীকালে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা তৈরি হয়, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় অজয় সাঁইথিয়া রেল লাইন, ১৮৬০ সাঁইথিয়ার তিনপাহাড় লাইন, ১৯০৬ অন্ডাল সাঁইথিয়া লাইন, ১৯১৭ আহমদপুর কাটোয়া রেল লাইন, এবং ধীরে ধীরে বীরভূম তার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে থাকে।

এই পর্বটিতে একদিকে যেমন পতিসরকে কেন্দ্র করে কালিগ্রাম পরগনায় পুনর্গঠনের কাজ আবার শুরু হয় অন্যদিকে বীরভূমের শ্রীনিকেতনেও পল্লি-পুনর্গঠনের কাজ বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লি-পুনর্গঠনের কাজে যোগ দেন বাগনান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতুল সেন, বিশেশ্বর বসু, উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, নলিনী বসু, ভূপেশ চন্দ্র রায়, রতিকান্ত দাস প্রমুখরা। এঁরা ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী। এই সময়ে পতিসরে মন্ডলী প্রথাকে আরো শক্তিশালী করে তোলা হয়। এবং এই মন্ডলী প্রথার ওপর ভিত্তি করেই একের পর এক গ্রাম কল্যাণ মূলক কাজ শুরু হয়। গ্রামের কৃষি ব্যবস্থা, মৃৎশিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ব্যাংক নির্মাণ, সালিশি সভা ইত্যাদির পাশাপাশি শিলাইদহ পতিসরে দুশোটির মতো প্রাথমিক স্কুল, পতিসরের হাই স্কুল, তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি স্থাপন

করা হয়। তবে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর Factory গ্রামোন্নয়নের কাজ খানিকটা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু এইসময় শ্রীনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধি বাড়তে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ কৃষি কাজের উন্নতির পাশাপাশি গ্রামীণ ও কৃষি নির্ভরশিল্পের উন্নতির কথাও বলেছেন। তিনি স্পষ্টতেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। এই আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি বারবার বলেছেন, "মানুষ যেমন একদিন হাল-লাঙ্গলকে, চরকা-তাঁতকে, তীর-ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ করে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্র কেউ আমাদের সেই রকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে, অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনমতেই পেরে উঠবে না।" রবীন্দ্রনাথ কৃষি কাজের পাশাপাশি যে পরিপূরক শিল্পের কথা বলেছেন তাহল, যে শিল্প গ্রামের মধ্যেই গড়ে উঠতে পারবে এবং গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের অন্যতম উপায় হয়ে দাঁড়াবে। তবে এই ক্ষুদ্র শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখা যে খুব সহজ হবে না তা বুঝতে পেরেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিতে চেয়েছেন। এভাবেই গড়ে উঠেছে তাঁর সমবায় শিল্পের ধারণা। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি যে কতটা প্রাসঙ্গিক তা কৃষি আর শিল্প নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে ঘটা রাজনীতিক সংঘর্ষ গুলির কথা ভাবলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি কৃষি নির্ভর শিল্পগুলিও যেহেতু শ্রম নির্ভর তাই কর্মসংস্থানের দিক থেকে এর গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, পাট শিল্প, পশম শিল্প, দুগ্ধজাত শিল্প, রেশম শিল্প, তাঁত শিল্প প্রভৃতি সবই কৃষি নির্ভর শিল্প।

জাতীয় অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও কল্যাণকর ভাবনা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেই যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হবে, তৎকালীন কংগ্রেসের নেতারা একথা বিশ্বাস করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে আস্থা রাখতে পারেননি।

জাতীয়তাবাদের নতুন দিক: বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন (১৯১৯-১৯২৯) এই পর্বটি আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ এখানে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে যেমন একটি জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করে তুলতে চেয়েছেন তেমনি ভারতের প্রাণ ভোমরা গ্রামগুলিকেও পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের উন্নতির পথ খুঁজেছেন। আজকের দিনে যেখানে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ পদ ও ক্ষমতার আস্ফালনে মুখ লুকাচ্ছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যেন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনোই পদ বা ক্ষমতা চাননি, আর তাই তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসেন। কিন্তু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংকটের সময় তিনি কলম ধরতে বা সরাসরি তার প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে, নিজের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নিজেদের বিদ্যাস্থানেরই গুরুত্ব নেই। সেই গুরুত্ব পাওয়ার জন্য ভারতবাসী বিদেশি পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা করে। তবে তিনি দেশিয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চারও আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধি বৃদ্ধি, সৌন্দর্যবোধ, রসবোধ ইত্যাদি বিকাশকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সামগ্রিক বিকাশ বলে মনে করতেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতীর শিক্ষা দর্শনের এটাই ছিল সার কথা। বিশ্বভারতীতে সাহিত্য, সংগীত, নাচ, চিত্রকলা ইত্যাদি সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ আজ মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি ও নন্দনতত্ত্ব তলানিতে এসে ঠেকেছে।

তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একটি কো-অপারেটিভ স্টোর খুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবায় সমিতির ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শিক্ষা যে কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয়, জীবনে চলার পথে তাকে যে পাথেয় করে তুলতে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা আবারও একবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আজকের দিনে যখন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে কোনোক্রমে একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি করাতে পারলে তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্ত হন, তখন কোথাও গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বাণীটি অভিভাবকদের দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার ও উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আসলে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা চালু করছেন, সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে বাংলাতে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আসলে

তিনি স্নাতকোত্তর স্তরে স্বদেশি ভাষা পড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চাওয়া হয়। হয়তো অনেকেই আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাপারটা নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত হবেন, কিন্তু বিষয়টিতে তিনি আনন্দিত হলেও খুব একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। কারণ তিনি আবেগের চেয়ে সমকালীন পরিস্থিতিকে বিচার করে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করতেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা ভাষা তখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠার উপযুক্ত হয়নি। যদিও তিনি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি ভাষাগুলি এখন পর্যন্ত যে সেই স্তরে বিস্তার লাভ করে উঠতে পারেনি, সেটিও জানিয়েছিলেন। এমনকি তিনি স্বদেশি ভাষাগুলির বিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে লোকসাহিত্য ও উপভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিশ্বভারতীতে তিনি ভারতীয় প্রথা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে ছাত্রদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন। এবার এখানে প্রশ্ন আসতেই পারে তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী ছিলেন? উত্তরটি হল একেবারেই না। কারণ সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি বিদ্যালয়ে একটি টেকনিক্যাল বিভাগ খুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তিনি উইন্ডমিল ও ছাত্রদের রাতে পড়ার জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও সেকালের ছাত্র সমাজ তাঁর এই দূরদর্শিতার সাথে পাল্লা দিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ এও বলে দেন- বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিলে শিক্ষককে বা উপদেষ্টা মন্ডলীকে কতখানি দূরদর্শী হতে হবে। অথচ আজও ভারতীয়রা যে ভুলটি করে তা হল ভারতীয় ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভুল ভাঙিয়েছেন। তিনি বলেছেন আধুনিক যুগে বাস করতে হলে শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না, চীন ভারতের ভালোটুকু গ্রহণ তো করতেই হবে, তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিকেও গ্রহণ করতে হবে। তবে যন্ত্র সভ্যতা যাতে মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে ফেলে সেদিকেও সর্তক থাকতে বলেছেন।

আবার আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেখলে বোঝা যায়, কৃষি কাজ এখনো পর্যন্ত সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। আজও কেবল তারাই চাষ করে যাদের সঙ্গে শিক্ষার কোনো যোগ নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ সেই কবে বলে গেছেন চাষিকেও বিজ্ঞান শিখতে হবে বা বিজ্ঞানকেও চাষের কাজে যোগ দিতে হবে। চাষের সঙ্গে শুধু লাঙ্গলের ফলার আর দেশের মাটির সংযোগ নয়, ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশে সমস্ত দেশের

বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে কৃষির যোগ থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সেদিনের সেই উপদেশ আজ আরো আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, তাহলে কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ একদিন অর্থনৈতিকভাবেও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক এবং আত্মিক বিকাশের জন্য শিক্ষার কথা বলেছেন সে শিক্ষা আজকে আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ এখন শিক্ষা হয়ে গেছে জীবিকা উপার্জনের উপায়। রবীন্দ্রনাথ এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান ও শিক্ষা গ্রহণ করবে তা পরে নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বলা বাহুল্য সেকালে ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দেরকে সেই সুযোগ দেয়নি। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও ভারতবাসী সেই শিক্ষাব্যবস্থা শুরু করতে পারেনি। আজও বিদ্যালয়ে- বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে কেরানি তৈরির শিক্ষা। আর রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা সত্যি করে এখনও ক্রমশ বাড়ছে বেকারত্বের সংখ্যা। কারণ শিক্ষায় চাহিদার চেয়ে যোগান অনেক বেশি। আজও কেবলমাত্র রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন দিয়েই সমগ্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং সেই পরিবর্তনই আনতে পারে সত্যিকারের আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ।

অনেক সময় ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থের অভাবে বহু সংকল্প থেকে পিছিয়ে আসেন অনেকে। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথ দেখিয়েছেন ভারতবাসীকে। অর্থের অভাবে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য যে কোনোদিন অধরা থাকতে পারেনা তা তিনি প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। সবার প্রথমে যা দরকার তা হল কার্যসিদ্ধির দৃঢ় মনোবল নিয়ে মাঠে নামা। আসলে মানসিক আত্মনির্ভরতাই সমস্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখানে অর্থ কোনো বাধা হতেই পারে না। শুধু এই মনোবল যোগানোর জন্যেই রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক।

আধুনিক আত্মনির্ভর ভারত গড়ার অন্যতম পথ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন মডেল। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে শ্রীনিকেতনে একের পর এক তৈরি করছেন শিল্প ভবন, শিক্ষাসত্র, গ্রাম সমীক্ষা, শিক্ষাচর্চা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি। লোকশিক্ষা সংসদ তৈরি করছেন গ্রামের লোকেদের প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার জন্য। গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে তিনি জোর দিয়েছিলেন ফার্মিং, কৃষিকাজ ও পশুপালনে। বলাবাহুল্য এই সবকিছুই তিনি করেছিলেন একেবারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। তৈরি করেছিলেন কো-অপারেটিভ ব্যাংক। এই শ্রীনিকেতন মডেলই যদি আজ ভারতের

প্রত্যেকটি গ্রাম গড়ে ওঠে, তাহলে বিশ্বের দরবারে ভারত একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে কৃষি প্রধান দেশগুলির কাছে একটি নজির তৈরি করবে। তাই স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে কৃষি প্রধান দেশ ভারতে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা উত্তর উত্তর বাড়ছে।

তথ্যসূত্র

১। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৪।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অসন্তোষের কারণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮২।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অসন্তোষের কারণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যার যাচাই", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৪।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যার যাচাই", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৫।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যাসমবায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৫-৮৬।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যাসমবায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৮৭।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যাসমবায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৭।

৯। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।

১০। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৮।

১১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬১।

১২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬১।

১৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬১।

১৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬২।

১৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬২।

১৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬২।

১৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬৪।

১৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬৪।

১৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “আশ্রমের শিক্ষা”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৩৩।

২১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

২২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

২৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৬৯।

২৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্বভারতী", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৯৫-৯৬।

২৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৭৪।

২৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৭৪।

২৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৮০।

২৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৮০।

৩০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৮২।

৩১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৮২।

৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অসন্তোষের কারণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অসন্তোষের কারণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অসন্তোষের কারণ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

৩৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪২৯।

৩৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৩১।

৩৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৩১।

৩৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যাসমবায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৮৭।

৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যাসমবায়", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৮৭।

৪০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪০।

৪১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪০।

৪২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪০।

৪৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪০।

৪৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৩।

৪৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৩।

৪৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৫।

৪৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

৪৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

৪৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

৫০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

৫১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

৫২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৭।

৫৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৭।

৫৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৪৮।

৫৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫২।

৫৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫২।

৫৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫৩।

৫৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫৩।

৫৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

৬০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

৬১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

৬২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

৬৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৮৭।

৬৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৮৭।

৬৫। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

৬৬। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬০।

৬৭। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬০।

৬৮। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬০।

৬৯। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬১।

৭০। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬১।

৭১। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬১।

৭২। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

৭৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪।

৭৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫।

৭৫। নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃষ্ঠা ৬৫।

৭৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৬।

৭৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ১৩।

৭৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ১৭-১৮।

৭৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ২২।

৮০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ২৫।

৮১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ২৬।

৮২। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি,* কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ১৭৬-৭৭।

৮৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩২।

৮৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৩।

৮৫। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৩।

৮৬। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৩।

৮৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৮।

৮৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৮।

৮৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪২।

৯০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪২।

৯১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪২।

৯২। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৬।

৯৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৬।

৯৪। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৪৬।

৯৫। Rabindranath Tagore, *Visva-Bharati Bulletin*, 1936.

পঞ্চম অধ্যায়

মানবতাবাদ ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দেখে ফেলেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ, এই পর্বের শেষে এসে প্রত্যক্ষ করলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা। জীবনের শেষ পর্বে এসে তিনি বুঝেছিলেন মানবতাবাদ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধই শান্তি আনতে পারে বিশ্বজুড়ে। তাই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের কথাই বারবার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই ভাবনা বারবার উঠে এসেছে এই সময়ের প্রবন্ধগুলিতে। জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজের বিশ্বাস ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে তিনি যেন নতুন মানবতাবাদের আলোকে বিশ্বকে পথ দেখাতে চেয়েছেন।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত শিক্ষাচিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেওয়ার উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি আলোচনা করলে দেখা যায়, একদিকে যেমন ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা এসেছে, তেমনি পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথাও উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিবর্তনের কথা। আবার প্রাচ্যের জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এসেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমানে কী অবস্থা হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গটিও উঠে এসেছে প্রবন্ধটিতে।

যেমন ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা বলতে গিয়ে, প্রথমেই তিনি মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যুগের উল্লেখ করেছেন। এই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চরিত্র সৃষ্টি এক কথায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞান ও কর্মে হৃদয় ভাবে যাতে সাধারণের মধ্যে তা সঞ্চালিত হয় সেটি ঠিক করা। আবার তারও পরবর্তীকালে নালন্দা-বিক্রমশিলার যুগে সর্বজনীন জ্ঞানসত্য রচনা করাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। এই প্রাচীনকালের বিদ্যায়তনগুলির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, সে যুগে বিদ্যা শুধুমাত্র সঞ্চয় করার বস্তু ছিল না বরং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিদ্যার গৌরব ছিল। সেকালে আচার্য বা অধ্যাপক যারা ছিলেন তাঁদের যশ ও খ্যাতির ব্যাপ্তি ছিল বহুদূর। তাঁদের চরিত্র ছিল পবিত্র অনিন্দনীয়। ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয় হল, ভারতবর্ষই হল প্রথম সেই দেশ যে জ্ঞানের

বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যর সঙ্গে সবার কাছে উন্মুক্ত করে রেখেছিল। বাংলাদেশের পক্ষে গৌরবের হল, প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম আচার্য শীলভদ্র ছিলেন বাঙালি।

অন্যদিকে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন -ইউরোপে যখন খ্রিস্ট ধর্মের শুরু কালে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নতুন ধর্মের দ্বন্দ্ব চলছিল, তখন ভক্তির বিষয়টি পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এমত অবস্থায় ইউরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সংঘ তৈরি হচ্ছিল। সেই সময়ের বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্ক শাস্ত্রের। এছাড়াও ন্যায় শাস্ত্র, আইন, চিকিৎসা ইত্যাদিও পাঠের বিষয় ছিল। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ নালন্দাতে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা ও তন্ত্র।

তবে ইউরোপে ইউনিভার্সিটিগুলিতে মূলগত পরিবর্তন ঘটেছিল। ধর্মশাস্ত্র থেকে মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাই সেখানে শাস্ত্র পরাজিত হয়ে বিজ্ঞান একেশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষার দিকেও পরিবর্তন ঘটে। একদিন লাটিন ভাষা ছিল সমস্ত ইউরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। সেই ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে স্বদেশি ভাষায় বিদ্যা মুক্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। ইউনিভার্সিটিগুলির উৎপত্তির মূল কারণ ছিল বিশেষ দেশ ও বিশেষ জাতি বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি এবং সেই প্রীতিকে রক্ষা ও প্রচার করা।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ সবার জন্য অতিথিশালা খুলে রেখেছিল। সেখানে স্বদেশি বিদেশির ভেদ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্র, যেখানে সব মানুষই পরস্পর আপন। কিন্তু ভারতবর্ষের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা পরিবর্তিত হল যখন ভারতবর্ষে 'ইউনিভার্সিটি' পত্তন হল এবং তখনই দেখা গেল সমস্যা।

> "আমাদের দেশে য়ুনিভর্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লন্ডন য়ুনিভর্সিটিতে, এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা ব'লে কোনো-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভর্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল

গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।"[১]

আবার বিদেশ থেকে পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে দেশের মনের মিল ঘটানো যায়নি। তাই এখানে ইউরোপীয় বিদ্যাও বদ্ধ জলের মতো। তার কোনো প্রবাহ নেই। ভাষার ক্ষেত্রেও ইংরেজিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যখন মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রস্তাব ওঠে, তখন ভারতবর্ষের ইংরেজি জানা বিদ্বানরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। পরীক্ষা ব্যবস্থাতেও দেখা যায় ফলন ফলানোর চেয়ে ফল আহরণের দিকেই গুরুত্ব বেশি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, আক্ষেপ করে কোনো ফল হয় না। চেষ্টা করতেই তিনি বিশ্বাসী।

"...আক্ষেপ ক'রে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরও শক্ত ক'রেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে: শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।"[২]

প্রবন্ধে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ এসেছে বাংলা ভাষায় শিক্ষার ভাষার প্রসঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সবসময় স্বদেশের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, তাহলেই সে শখের জিনিস থেকে প্রাণের জিনিস হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনের বাস্তবিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে কীভাবে এই আশ্রম ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো, এবং সেখানে কাদের অবদান ছিল, এই আশ্রম বিদ্যালয় তৈরীর পেছনে আসলে তাঁর কী মানসিকতা কাজ করেছিল, সব উত্তর যেন পাওয়া যায় এই প্রবন্ধটিতে।

প্রবন্ধের শুরুতেই আশ্রম বিদ্যালয় একদম গোড়ার ছবিটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন-

> "তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবী-লতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পুব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকী- বনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারই সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর-একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারই মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ববোধিনী এবং আরও-কিছু, বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর-একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়িঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারি দিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।"[৩]

সেই সময়ে আশ্রমে রক্ষী ছিল- ঋজু, দীর্ঘ, প্রাণসারময় দেহের বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার। সর্দারের ছেলে হরিশ ছিল মালি। অতিথি ভবনের একতলায় তখন থাকতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ, এবং তাঁর সঙ্গে থাকতেন কয়েকজন অনুচর পরিচর। আর রবীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক থাকতেন দোতলার ঘরে।

এই অতীব শান্ত, তায় জনবিরল এলাকায় শালবাগানে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তা নিয়ে অল্প কিছু ছেলেকে ছাত্র হিসাবে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি নিজে পড়াতেন প্রাচীন জাম গাছের তলায়। গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোনোদিন আর্থিক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়- এই দর্শনের উপর নির্ভর করে এই বিদ্যালয় ছিল অবৈতনিক। আর এই বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং তাঁর খ্রিস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ মিত্র। কারণ এরা দুজনেই ছিলেন সন্ন্যাসী মানুষ।

প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ের শুরুর দিকে বেশ কয়েকজন গুণী অধ্যাপকের অবদান অবলীলায় বলে গেছেন। সেই অধ্যাপকদের বিবরণ পড়ার পর পাঠকদের মনে হতেই পারে, রবীন্দ্রনাথের

মনে শিক্ষকের যে ছবি পরবর্তীকালে উঠে এসেছিল, তা বোধ হয় আশ্রমের এই শিক্ষকদের দেখেই। আজকের দিনে যখন শিক্ষক বা অধ্যাপককূলকে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন ওঠে তখন আশ্রম বিদ্যালয়ের শুরুর দিকে এই মহান অধ্যাপকদের কৃতিত্ব যেন সকলকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়।

শিক্ষক হিসেবে প্রথমেই উঠে আসে সতীশ চন্দ্র রায়ের কথা। যার সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অজিত কুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু সতীশ চন্দ্র রায়কে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেছিলেন কবিতার খাতা পড়ানোর জন্য। সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে আশ্রম বিদ্যালয় নিয়ে তাঁর যে সংকল্প ছিল সেসব কথা প্রকাশ করেন। এই সংকল্পের কথা শুনে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে সতীশ এবং যোগ দিতে চায় কবির বিদ্যালয়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, সতীশ অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে যোগ দিক, কিন্তু সতীশের জেদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সে বাধা টেকেনি। পরীক্ষা না দিয়েই সতীশ যোগ দেয় শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে। দারিদ্রকে স্বীকার করেও তিনি বেতন নিতে অস্বীকার করেন। যদিও কবি গোপনে তাঁর পিতার কাছে যৎসামান্য মাসিক বৃত্তি পাঠাতেন। কবির কথায় তিনি যেন ভাবরাজ্যে সঞ্চালন করতেন, সেখানে প্রকৃতির রস ভান্ডার থেকে তাঁর জীবন পূর্ণ হতো। এই আত্মভোলা মানুষটি ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে চলে যেতেন যেখানে সেখানে। আর তাদেরকে সাহিত্য সম্ভোগের আস্বাদও দিতেন। তিনি মূলত ইংরেজি সাহিত্যের সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর পাঠকে কখনো কেজো সীমার মধ্যে বন্দি রাখেননি। মাস্টারিতে ছিল তাঁর নৈপুণ্য। তাই তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করার পাঠ ছিল না, তা ছিল ছাত্রদের মনের খাদ্য। যদিও তাঁর সান্নিধ্য আশ্রম বেশিদিন পায়নি। এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। কবিও বহু সময় কাটিয়েছেন সতীশের সঙ্গে। কিন্তু তখনও তিনি তাঁর কোনো সীমারেখা খুঁজে পাননি। তাঁর সঙ্গে শালবীথিতে ঘুরেছেন কখনো দুপুর ১১ টা আবার কখনো রাত ১১ টা পর্যন্তও। তাই এই মহান শিক্ষকের মৃত্যুতে কবি বেশ ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন যে, আশ্রমের সত্যিকারের শিক্ষকরা হবেন সাধক।

এরপরে এই প্রবন্ধে তিনি যে শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন জগদানন্দ। কবির সাথে তাঁর পরিচয় সাধনা পত্রিকার মাধ্যমে। এখানে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্য প্রণালী কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। জগদানন্দের সাংসারিক অভাব ছিল। অভাব

কাটানোর জন্য কবি তাঁকে প্রথমে জমিদারির দপ্তরে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করেন। যদিও জমিদারির কর্মীর চেয়ে শান্তিনিকেতনের বেতন ছিল কম, তবুও এই মানুষটি অল্প বেতনেই শান্তিনিকেতনে পেয়েছিলেন অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদেরকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। ছাত্রদেরকে কেউ কোনো ভাবে শাস্তি দিলে, তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি মূলত ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়াতেন।আসলে তিনি যেন সব ছাত্রদেরই বন্ধু ছিলেন। ক্লাসে কোনো ছাত্র যদি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতো, তাহলে চরম আহত হতেন। শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য তাঁর চেষ্টা ছিল অক্লান্ত। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের সৃষ্টির কাজে যে সমস্ত শিক্ষকরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জগদানন্দ রায় অন্যতম ছিলেন।

এরপরে তিনি যে শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন অজিত কুমার চক্রবর্তী। তিনি আর এক মাস্টারমশাই সতীশের বন্ধু ছিলেন। তাঁর চর্চার বিষয় ছিল ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শন। উনি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। আশ্রমের ছাত্ররা এই শিক্ষকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রস। আশ্রম নির্মাণ কার্যে তিনি একজন স্থাপতির ভূমিকা নিয়েছিলেন, একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

এর পরবর্তীকালে তিনি যে শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেন তিনি হলেন মোহিত চন্দ্র সেন। খুব অল্প সময়ের জন্য আশ্রম বিদ্যালয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য তিনি সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সব ত্যাগ করে আশ্রম বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

শিক্ষকতা তাঁর কাছে ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তিনি কীভাবে আর্থিক এবং পরমার্থিক দুই দিক দিয়ে আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়ে একটি ছোট্ট ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ এখানে তুলে ধরেছেন-

> "প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার অনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার

হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলুম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।"[৪]

প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এসেছে আর এক শিক্ষক নন্দলাল বসুর কথা। এই প্রতিভা সম্পন্ন বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে ছাত্রদের ছিল এক আশ্চর্য একাত্মতা। তিনি ছাত্রদের রোগে-শোকে-অভাবে সব সময়ের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সহচর্যে শান্তিনিকেতনের শিল্পশিক্ষা আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষক, কর্মী, কবিবন্ধু আশ্রমের সাধনা ক্ষেত্রে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আদর্শের ধারায় ভিত্তিলাভ করেছিল এই আশ্রম বিদ্যালয়।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের স্বপ্নটির পশ্চাতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার দুঃসহ স্কুলের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ সেই স্কুলের শিক্ষার মধ্যে কোনো রস খুঁজে পাননি। শুধু তাই নয় কলকাতা শহরে তিনি তখন প্রায় বন্দি অবস্থায় ছিলেন। এবং সেটি তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তাঁর কাছে স্কুল বলতে ছিল-

"ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়।"[৫]

এরপর স্কুল নিয়ে সমস্যা তিনি আরো একবার সরাসরি প্রত্যক্ষ করলেন রথীন্দ্রনাথের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময়। অন্য অভিভাবকদের মতো তিনি হয়তো প্রচলিত স্কুলে পাঠালে সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারতেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষালয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাঠাতে চাননি। এমনকি

রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল শিশুর জীবনের আরম্ভ কাল যদি নগরে হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রাণের পুষ্টি এবং মনের বিকাশ সঠিকভাবে হওয়া সম্ভব নয়। কেবল প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা এর কারণ নয়। শহরে জীবনযাপনের জন্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, রবীন্দ্রনাথের মতে তা দেহ চালনা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে বঞ্চিত করে। তাঁর মতে এই বাহ্য বিষয়গুলির উপর নির্ভরতা তাদেরকে চিরদিনের মতো শিথিলতা এনে দেয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বাগানের গাছের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, বাগানের গাছগুলিতে যদি উপর থেকে প্রতিদিন জল সিঞ্চন করা হয়, তাহলে তার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে স্বাধীনভাবে জল সংগ্রহের খোঁজ করে না, কেবল মাটির সঙ্গেই সংলগ্ন থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই সময় শহরের জীবন যাত্রাকে প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। তখন তিনি সপরিবারে শিলাইদহে নিতান্তই সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছিলেন। পাশাপাশি তিনি সেই সময় শিলাইদহের কুঠিবাড়ির চারদিকে জমিতে নতুন ফসল ফলানোর জন্য নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করছিলেন কৃষি বিভাগের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা। যদিও বহু ব্যয় করেও রবীন্দ্রনাথ বারবার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হল ব্যর্থতা। এই সময় পুথিগত বিদ্যারও আয়োজন চলছিল, সেই আয়োজনে ছিলেন পাগলা মেজাজের চাল-চুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক লরেন্স।

বাংলা আর সংস্কৃত শেখানোর জন্য ছিলেন পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব। তিনি বিভিন্ন ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। এইভাবেই বালক রবীন্দ্রনাথের মনে যে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের আদর্শ চিত্র আঁকা ছিল তা ক্রমশ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল, যদিও তার সম্যক রূপে তখনো গড়ে ওঠেনি।

> "দীর্ঘ কাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে।

ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আশ্রম বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন, এই হল সেই শিক্ষা তত্ত্বের ভিত্তি এবং এই শিক্ষা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে আশ্রম বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সাহসের দরকার ছিল। কারণ এই পথ ছিল অনভ্যস্ত এবং চরম অপরিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে এই পথের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকলেও সেই রকম শক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না তা প্রতিষ্ঠা করার। কারণ তিনি এর সমার্থক খুঁজে পাননি সেভাবে। উন্মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে গুরুগৃহে বাসের মধ্যে যে উচ্চতম সংস্কৃতি আছে এবং আধুনিক কালে সেই রূপ-রস প্রকৃতির সহযোগে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার আঙিনাটি যে পূর্ণ হবে- এই আশ্বাসকে অনেকে কবির কল্পনা বলে সেভাবে গুরুত্বও দিতে চাননি। তাই কবি বুঝেছিলেন, শুধু মুখের কথায় কোনো রকমের ফল হবে না।

"সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ-সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবন-যাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।"[৭]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের শৈশবকে স্মরণ করে কলকাতার জীবন এবং শান্তিনিকেতনে বিশ্ব প্রকৃতির যে স্পর্শ তিনি পেয়েছিলেন তার একটি সুন্দর তুলনা টেনেছেন -

“অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্ব-দেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।”[৮]

একদম শুরুর শান্তিনিকেতনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের স্মৃতি তুলে ধরেছেন। যেখানে উঠে এসেছে খোয়াই-এর কথা। উঠে এসেছে বাগানের প্রহরী সর্দারের কথা। সে এক সময় ডাকাত দলের নায়ক ছিল। আর সে সময় শান্তিনিকেতনে অতি প্রাচীন দুটি ছাতিম গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই ছাতিম গাছ দুটির ছায়া ছিল ডাকাতদের আড্ডার স্থান। তবে রবীন্দ্রনাথের পিতা এখানেই শান্তির আশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি কিনেছিলেন। এখানে একখানি একতলা বাড়ি তৈরি করেন এবং রুক্ষ-শুষ্ক-রিক্ত জমিতে অনেকগুলি গাছ রোপন করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের পিতা প্রায়ই হিমালয় যাত্রা করতেন এবং এই যাত্রাপথে তাঁর মাঝখানের বিশ্রাম স্থল হতো এই শান্তিনিকেতন। বাল্যকালেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। যৌবনের পৌঢ় বিভাগে তাই শিশুদের শিক্ষার তপোবন হিসেবে তিনি শান্তিনিকেতনকেই বেছে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা এই বিষয়ে তাঁকে উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেও বাঁধা এসেছিল আত্মীয়দের দিক থেকে। তাঁদের আশঙ্কা ছিল এসবের ফলে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এত ছিল বাইরের বাধা। এছাড়াও ছিল আর্থিক বাধা এবং বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের সেই সময় প্রায় কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না।

আশ্রম শুরুর অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখায় উঠে এসেছে কয়েকজনের নাম, উৎসাহ ও ভূমিকা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সতীশ চন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ। সম্ভবত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের সংকল্পের কথা জানতে পেরে তাঁকে বিলম্ব না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর কয়েকজন অনুগত শিষ্য ও ছাত্রকে নিয়ে আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের তরফে ছাত্র ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। এখানে তিনি গুরু-শিষ্যের

সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হবে আধ্যাত্মিক। গুরু শিক্ষা দেওয়াটাকেই সাধনার প্রধান অঙ্গ মনে করবেন এবং তাঁর যা কিছু বিদ্যাসম্পদ রয়েছে, তিনি নিঃস্বার্থভাবে শিষ্যদের মধ্যে দান করবেন।

আশ্রম বিদ্যালয় শুরুর দিকে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন বা আহারের খরচ নেওয়া হতো না। তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় ভার রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বল্প সম্বল থেকেই মেটাতেন। যদিও তাঁকে সাহায্য করতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ। তাঁরা যদি সে সময় না সাহায্য করতেন তবে কবির পক্ষে তা চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তো। বলা বাহুল্য, তখন আয়োজন ও আহার ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। এই সময়েই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কবিকে ‘গুরুদেব’ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সেই উপাধি এখনও পর্যন্ত আশ্রমবাসীরা বহন করে চলেছেন।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর ‘বিশ্বভারতী’ স্থাপিত হয়। পরের বছর জুলাই মাসে অর্থাৎ ৩ জুলাই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে নিয়ম অনুযায়ী ‘বিশ্বভারতী’ কাজ শুরু করে। ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর ‘বিশ্বভারতী পরিষদ’ গঠন করে তাকে সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ করা হয়। এই বিশ্বভারতীরই সূচনা থেকে বিভিন্ন সময় রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাগুলি ১৯৫১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ‘বিশ্বভারতী’ শিরোনামে প্রবন্ধ আকারের সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে বিশ্বভারতী সূচনা পর্ব থেকে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে সর্বসাধারণের বিশ্বভারতীতে রূপান্তর করেছেন সেই যাত্রাপথের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ্বভারতীর মাধ্যমে তাঁর জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তার পরিচয় এই বিশ্বভারতী প্রবন্ধগুলি।

ভারতবর্ষ নিজে তার চিন্তাশক্তি দিয়ে বিশ্বসমস্যার কথা ভেবেছে। শুধু তাই নয় তার সমাধানের উপায়ও পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের দেশের পক্ষে সেই শিক্ষাই দরকার যাতে করে আমাদের দেশের নিজের মনটি সত্য আহরণ করতে এবং সেই সত্যকে নিজের শক্তি দ্বারা প্রকাশ করতে পারে। এক সময় ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনোনিবেশ করেছিল, তখন তার মনে ঐক্য ছিল। কিন্তু এখন সেই ঐক্য নেই বরং বিচ্ছিন্নতায় এসে গেছে। ভারতবর্ষের মন হিন্দু, জৈন, শিখ, মুসলমান ও খ্রিস্টানের

মধ্যে বিভক্ত এবং নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। তাই সে মন নিজের বলে কিছু গ্রহণ করতে বা নিজের মতো করে কিছু দানও করতে পারছে না। আসলে গ্রহণ করার জন্য বা দান করার জন্য আঙুলকে যুক্ত হয়ে অঞ্জলি বাঁধতে হয়।

> "ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।"[৯]

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিদ্যার যেখানে উদ্ভাবনা চলছে সেটাই শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ হল বিদ্যার উৎপাদন করা, বিদ্যা দান করা সেখানে গৌণ। বিদ্যার সেই ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদের এগিয়ে আসতে হবে যারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাজে যুক্ত আছেন। এই মনীষীরা যেখানেই সকলের সঙ্গে মিলিত হবেন, সেখানেই জ্ঞানের উৎস খুলে যাবে। সেই উৎস ধারায় প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুকরণ করে নয়।

অন্যদিকে দেখা যায়, অন্যান্য দেশের শিক্ষার সঙ্গে সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার একটা যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু কেবল ভারতবর্ষের বেলাতেই তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পেশা যেমন কেরানিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত।। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষে সত্যিকারের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে তাকে যে বিষয়গুলি যুক্ত করতে হবে সেগুলি হল –

“ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপে আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি ‘বিশ্বভারতী’ নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।”[১০]

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন দেশের ওপরে যে শক্তি যে শাসন যে ইচ্ছা কাজ করছে তার সমস্তই আসছে বাইরের দিক থেকে। সেই বাইরের ভাবনাকে অতিক্রম করার সাধ্য ভারতবাসী যেন কোথাও হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে ভারতবাসীর মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হচ্ছে। এই অবস্থায় ভারতবাসী অন্যের ইচ্ছাকে অন্যের শিক্ষাকে অন্যের বাণীকে গ্রহণ করছে। এর ফলে তার প্রকৃতিস্থ হতে সময় লাগছে এবং এই পরিস্থিতি তার মনের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করছে। এমত অবস্থায় একদল মানুষ বিদ্বেষ বুদ্ধিকে তৃপ্তিদান করাকেই কর্তব্য মনে করছে। আর অন্য দল চাটুকারি বৃত্তি বা চর বৃত্তির মাধ্যমে অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্য ‘রাষ্ট্রীয় আবর্জনা কুন্ডের’ আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় বড় কিছু করা সম্ভব হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের সংকল্পকে একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরেছেন-

“যে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।”[১১]

যদিও পাশ্চাত্য দেশে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল তা মানুষকে বিভিন্ন রকমের পথ দিয়েছে। সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁদের প্রয়োজন মিটেছে। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে জীবনের বড় লক্ষ্য শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি। একমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। আসলে জীবিকার লক্ষ্য হল কেবলমাত্র অভাব পূরণ করা, প্রয়োজনকে পূরণ করা। অন্যদিকে জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতা। সেখানে সে সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এক আদর্শ স্থাপন করে। হয়তো এই জীবনের লক্ষ্য নিয়েও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষা হয়ে উঠলে তা নেহাতই সংকীর্ণ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শটিকেই সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং আরম্ভকালের বিদ্যালয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

> "এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সব চেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন-কি, বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।
>
> কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিঁকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।"[১২]

বিদ্যালয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল, বিদ্যালয়ের ছেলেদের শিক্ষার মাধ্যমে মনের দাসত্ব দূর করানো। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষা প্রণালী যেভাবে সারা দেশকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেঁধে ফেলেছিল, সেই প্রণালীকে একেবারে অবহেলা করে নতুন করে কিছু তৈরি করা বেশ শক্ত কাজ ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই সময় তার শক্তি এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারেননি। তাই বিদ্যালয়টিকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছিল। তবে সেই গণ্ডির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বাতন্ত্র যে রেখেছিলেন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেই সময়ে ভারতবর্ষের শিক্ষার অন্যতম একটি ভাব ছিল নিঃস্বভাব। তখন ধারণা ছিল ভারতবর্ষের নিজের কিছু নেই, সমস্তই নিতে হবে বাইরের থেকে। এর ফলে শুধু শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ থাকতো তা নয়, সেই দীনতাকে হাস্যকর এবং বিরক্তিকর করে তুলেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ মনের দাসত্ব ঘোঁচানোর জন্য শিক্ষার এই দাসত্বভাবকে ঘোঁচানোর কথা বলেছেন। আশ্রমে শিক্ষার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের সেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা তুলেছেন। তিনি প্রথমে দেশের শিক্ষাকে মূল আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন করে তার ওপর ভিত্তি করে অন্য সকল শিক্ষার পত্তনের মাধ্যমে শিক্ষাকে শর্ত ও সম্পূর্ণ করার পরামর্শ দেন। যদিও তিনি এই সময় বেশি দিন শান্তিনিকেতনে থাকতে পারেননি। পরে আবার তিনি ফিরে আসেন এবং ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত হন। এভাবেই বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয়।

> "এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন। বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।
>
> আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী-মহাশয়। ওদিকে অ্যান্ড্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।"[১৩]

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নারীদের রক্ষণশীল বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সৃষ্টিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন 'নারী' প্রবন্ধের মাধ্যমে, যা পরবর্তীকালে 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের নারী শক্তির প্রতি এই মনোভাব চিরকাল ছিল না। জীবনের প্রথম দিকে তিনি নারীকে কেবল সুন্দরের পূজারী হিসাবেই দেখেছেন। সময়ের ব্যবধানে তাঁর সেই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, নারী সমাজ নর সমাজের আদ্যা শক্তি। নারীকে প্রকৃতিই স্নেহ-প্রেম ও ধৈর্য দিয়ে গড়ে তুলেছে। আদি প্রাণীর সহজ প্রবর্তনাটি প্রকৃতি নিখুঁত ভাবে নারীর স্বভাবের মধ্যেই বুনে দিয়েছে। পুরুষ নিজের জগৎকে বারবার গড়েছে ও ভেঙেছে। কিন্তু নারী প্রেয়সী-জননী এই রূপগুলির মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির দেওয়া হৃদয় সম্পদ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। নারীর বুদ্ধি সংস্কার, আচরণকে বহু যুগ যুগ ধরে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাকে বাইরে অভিজ্ঞতা লাভের সঠিক সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন মনে হয়নি কারও। আর যে পুরুষ জাতি শিশু কাল থেকেই মেয়েদের হাতেই তৈরি হয়, সেই পুরুষরাই মেয়েদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারী। আজ পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে মেয়েরা নিজেদের ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি ভাঙতে শুরু করেছে, এশিয়াতেও সেই ধারা অব্যাহত।

ঠাকুর পরিবারে অবশ্য মেয়েদের শিক্ষা বেশ বহুকাল ধরেই চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় ছিল পালকির যুগ। রবীন্দ্রনাথের দিদি দ্বার খোলা পালকিতে বেথুন স্কুলে যেতেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের কথা বলছেন যখন মেয়েদের একবস্ত্রের সেমিজ পরা ছিল নির্লজ্জতার অংশ, এমনকি মেয়েদের রেল গাড়িতে যাতায়াতের ব্যাপার মোটেই সহজ ছিল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে এসে দেখেছেন সেই পালকির যুগ বেশ দ্রুত পদেই ইতিহাসের দিকে চলে গেছে এবং তা খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। এর জন্য কোনো মিটিং, মিছিল বা সভার প্রয়োজন হয়নি। আবার মেয়েদের বিয়ের বয়সও ধীরে ধীরে বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এভাবেই নারী যেন নদী থেকে ধীরে ধীরে মহানদী হয়ে উঠছে। তবে এ কেবল বিয়ের দিকের পরিবর্তন নয়, নারীদের অন্তর প্রকৃতির মধ্যেও চলতে থাকে পরিবর্তন।

> "এই-যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো করে চিন্তা করতে,

বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানারকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হতে হবে। সংকীর্ণ সীমায় পূর্বে মন যেরকম করে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্তনে দুঃখ আছে, বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় করে আধুনিক কালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।"[১৪]

ঘরের মেয়েরা ধীরে ধীরে বিশ্বের মেয়ে হয়ে উঠছে। পুরুষের একা হাতে গড়া সভ্যতায় সাম্যের অভাব প্রলয়কে ত্বরান্বিত করছে। আর পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে লাগবে ভূমিকম্পের আঘাত। নতুন সভ্যতা গড়ার কাজে পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা এগিয়ে আসছে। ঘোমটা কেবল তাদের মুখ থেকে নয় বরং মন থেকেও খসেছে। আজ নারী কেবল পুতুল খেলার কাজে ব্যস্ত নয়। তাদের সন্তান পালন-পালনের স্বাভাবিক বুদ্ধি ঘরের লোকের সঙ্গে সঙ্গে সকল লোককে রক্ষার জন্য প্রবৃত্ত। নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির পিছনে কোথাও গিয়ে তাঁর নিজের মেয়েদের জীবনের করুণ ও দুঃখজনক ঘটনাগুলি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ'। শ্রীকেতনের কর্মীদের সভায় রবীন্দ্রনাথ এই বক্তব্যটি রেখেছিলেন। এই বক্তব্যটি রাখার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রসঙ্গটিকেও তুলে এনেছেন।

তিনি প্রথমে শান্তিনিকেতন, যা লোকালয়ের থেকে এক সময় বিচ্ছিন্ন ছিল, সেখানে ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করার মত বিদ্যা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ বিদ্যার থেকেও বেশি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আর সেই সময় শান্তিনিকেতনের কাজের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বিভিন্ন কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তারমধ্যে অন্যতম হল শিলাইদহ এবং পতিসরে পল্লি-জীবনকে প্রত্যক্ষ করা। রবীন্দ্রনাথ শহরে জন্মেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষরাও কলকাতার বাসিন্দা। তাই রবীন্দ্রনাথের সাথে পল্লিগ্রামের পরিচয় হওয়ার সুযোগ সেভাবে ছিল না। তিনি প্রথম যখন জমিদারির দায়িত্ব নেন তখন তাঁর মনে দ্বিধা ছিল তিনি সে কাজ সঠিক ভাবে পালন করতে পারবেন কিনা। কিন্তু কাজের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, সে কাজ তাঁকে পেয়ে বসেছে। আসলে তিনি যখন যে কাজের দায়িত্ব নেন সেই কাজেই নিজেকে নিমগ্ন করে দেন। কর্তব্য পালনে কখন তাঁর ফাঁকি ছিল না। এই

নতুন জমিদারের কাছে পার্শ্ববর্তী জমিদাররাও কর্মচারী পাঠিয়ে কাজের প্রণালী জেনে নিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাববশত পুরাতন বিধি সবটুকুই কখনো মেনে চলেননি। জমিদারিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে পুরনো কর্মচারীরা বিপদে পড়লেন। এতদিন ধরে তাঁরা জমিদারকে যা বোঝাতেন, জমিদার তাই বুঝতেন। কিন্তু নতুন জমিদার রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটি হবার উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রজাদের দ্বার সব সময় খোলা ছিল। পল্লির দুঃখ-দৈন্য রবীন্দ্রনাথকে এতখানি নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি তাদের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন।

> "তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম- কী করলে এদের মনের উদবোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'"[১৫]

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শহুরে বুদ্ধি নিয়ে গ্রামের মাঝখানে একটি ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে দিনের শেষে খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে, যা অনেকটা ক্লাবের মত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাঁধা সেই ঘর ব্যবহার হয়নি। মাস্টার নিযুক্ত করলেও নানা অজুহাতে ছাত্ররা আসেনি। এমতাবস্থায় পাশের গ্রামে মুসলমানরা জমিদারের কাছে এসে একজন পণ্ডিত চান, যাকে তারা নিজেরা বেতন এবং খেতে দেবে। মুসলমান গ্রামেও পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল। আসলে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ ব্যবস্থায় মানুষ পরের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে অর্থবান ব্যক্তিরা গ্রামের উন্নতি, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির দায়িত্ব নিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এক সময় এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এও স্বীকার করেছেন যে, এতে স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দু-তিনটি ঘটনার উল্লেখও করেছেন। কখনো কুয়ো খোড়ার ঘটনা আবার কখনো রাস্তা নির্মাণের কথাও

বলেছেন। পাছে জমিদার বাবুদের সামান্যতম লাভ হয়ে যায়, সেই ভয়ে প্রজারা নিজেদের বড় লাভ কেও স্বীকার করেনি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "এই-সব কথা যখন ভেবে দেখলুম তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।
>
> আমি কখনো গ্রামের লোককে অশ্রদ্ধা করি নি। যারা পরীক্ষায় পাস করে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক মনে করে তারা এদের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। শ্রদ্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌, দিতে যদি হয় তবে শ্রদ্ধা করে দিতে হবে।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ এই পল্লির কাজের জন্য ছেলে ও জামাই সন্তোষকে আমেরিকায় পাঠিয়ে ছিলেন কৃষিবিদ্যা ও গো-পালন শিখে আসার জন্য। এইভাবে তিনি নানা রকমের চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলেন পল্লির উন্নতির জন্য। শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়িও ঠিক সেই সময়ই কিনেছিলেন। ভেবেছিলেন শিলাইদহে তিনি যে কাজ আরম্ভ করেছেন এখানেও সেই কাজ আরম্ভ করবেন। কুঠিবাড়ির কাজে তাঁকে এলমহার্স্ট খুব সাহায্য করেছিলেন। ইনি এই জায়গাকে একটি আলাদা কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ গ্রামে কাজের দুটি দিকের কথা তুলে ধরেছেন। একটি হল গ্রামে থেকেই কাজ করা, দ্বিতীয়টি হল গ্রামের মানুষদের শিক্ষিত করে তোলা। রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশের দায়িত্ব আসলে কী, দেশপ্রেম আসলে কী, তা যেন ধরা দিয়েছে প্রবন্ধটির শেষ স্তবকটিতে।

> "আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার

বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে- এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে- সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।”[১৭]

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তরে এসে লিখেছিলেন ‘সভ্যতার সংকট’ (১৯৪১) প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে বেশ কিছু বিষয়ে তাঁর পূর্বেকার জীবনবোধ এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তার মূল্যায়ন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পূর্বকার জীবনে তিনি যেভাবে ইংরেজ সহ পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় সভ্যতায় বিশ্বাস রেখেছিলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর সেই বিশ্বাস যেন ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তার প্রমাণ এই ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেছেন যে, মানব বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুরু হয়েছিল ভারতে আগত ইংরেজ জাতির হাত ধরে। তিনিও মনে মনে ইংরেজদের স্বাধীনতা, সাধনা, তাঁদের ঔদার্য ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন। কারণ ইংরেজরা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করেছিল। তখনও তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের কালিমায় লিপ্ত হয়নি। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার কথাও উল্লেখ করেন। তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রধানত দুটি জাতির উল্লেখ করেছেন। একটি হল ইংরেজ আর একটি সোভিয়েট রাশিয়া।

তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার বিভীষিকায় বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, কালের চক্রে একদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। কিন্তু নিষ্ঠুর ইংরেজ কোন ভারতবর্ষকে ছেড়ে যাবে এনিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভে যে ইউরোপীয় সভ্যতাকে সভ্যতার সম্পদ ভেবেছিলেন, আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সেই বিশ্বাস যখন ভেঙ্গে যাচ্ছে তখন তিনি ব্যথিত হয়ে উঠছেন। তিনি ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যের দিকে তাঁর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, মানবতার বাণী প্রাচ্য সভ্যতা থেকেই আসবে। তিনি শেষ পর্যন্ত পূর্বাচলের সূর্যোদয়েই আস্থা রাখছেন।

মানবতাবাদ ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩০-১৯৪১) এই পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়েছেন, নিজেকে একটি মূল্যায়নের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। সে মূল্যায়ন হয়েছে স্মৃতিচারণের হাত ধরে। কখনও তা আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা, কখনও বা পাশ্চাত্যের ওপর অধিক বিশ্বাসের বিশ্বাসভঙ্গের দুঃখ। আবার কখনো বা যে নারীকে একসময় তিনি কেবলমাত্র হৃদয়ের অধিকারী করে রেখেছিলেন, সেই নারীকে তিনি এইসময়ে ঘরের বাঁধন ভেঙ্গে বিশ্বের দরবারে হাজির হতে ডাক দিয়েছেন। আবার কখনও বা তাঁর শ্রীনিকেতনের কর্মীদেরকে আবদার করেছেন কয়েকটি স্বনির্ভর গ্রাম উপহার দেওয়ার জন্য। বিচ্ছিন্নতা নয়, বিরোধ নয় মানবতা দিয়েই তিনি সব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুধু ভারতবাসী নয় সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাইতো তিনি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি আজও মানবজাতির পথপ্রদর্শক।

জাতীয়তাবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি: মতানৈক্য

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী 'আশ্রমে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁহার সহধর্মিনী' প্রবন্ধে ১৩২১ বঙ্গাব্দে গান্ধীজি যখন কস্তুরীবাইকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন তার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে না পারায় সেবারের যাত্রায় গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি দেখা হয়নি। কারণ পরের দিনই অর্থাৎ ৭ ফাল্গুন গান্ধীজি গোপালকৃষ্ণ গোখলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পুনাতে যাত্রা করেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরেন ১০ ফাল্গুন এবং এর পরপরই তিনি গান্ধীজিকে তাঁর প্রথম চিঠিটি লেখেন। এই চিঠিতে গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কথা উঠে আসে।

"Dear Mr. Gandhi

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India has given me great pleasure - and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the *Sadhana* of both of our lives.

Very sincerely yours"[১৮]

এরপর গান্ধীজি আবার শান্তিনিকেতনে আসেন ওই বছরই ২২ ফাল্গুন এবং তখন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। গান্ধীজির ডায়েরি থেকে জানা যায়-

"আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেই রান্না করে তবে ভাল হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদের

> হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজের হাতে রান্না করার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই সকল কথা আমি শিক্ষকদের জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভাল মনে হইল। ...এই বিষয়টি [সম্বন্ধে] রবীন্দ্রনাথের অভিমত, জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি রাজী হন তবে এ পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভাল লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন- ইহার মধ্যেই স্বরাজের চাবিকাঠি রহিয়াছে।"[১৯]

তবে রবীন্দ্রনাথ যে এই উপদেশকে খুব খুশি মনে মেনে নিয়েছিলেন তা ঠিক নয়। যদিও তিনি আশ্রম বিদ্যালয়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বারবারই বলেছেন এবং বিদ্যালয়ে পাচক, ভৃত্য প্রভৃতির ব্যয় কমে গেলে তাঁর খুশি হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রমবিভাগের গুরুত্ব তাঁর থেকে ভালো আর কে উপলব্ধি করবেন? এই সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ করতে গিয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকেরা পাছে মূল কর্তব্য থেকে সরে আসে, এই ছিল তাঁর ভয়। তাই শুধুমাত্র পরীক্ষামূলকভাবে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আশ্রমে পাঠশালা এবং ভোজনগৃহে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা পৃথক ভক্তিতে ভোজন করত। এই নিয়ে গান্ধীজি বিরোধিতা করলে রবীন্দ্রনাথ এরও সদুত্তর দেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে, ধর্ম বা সমাজ বিষয়ে তিনি ছাত্রদের ওপর কোনো বল প্রয়োগ করতে চান না। বল প্রয়োগ করলে হয়তো তারা আপাত দৃষ্টিতে পালন করতে পারে কিন্তু অন্তর থেকে তা মানতে পারবে না। কিন্তু তিনি তো আত্মশক্তি চর্চার পূজারী। তাই তিনি বাইরে থেকে কোনো নৈতিক নীতি চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন ছাত্রদের পরিবর্তন আসুক অন্তর থেকে।

তবে সবকিছু নতুন করে শুরুর মতো গান্ধীজির দেখানো নতুন নীতিও আশ্রমে চালু হয়। যদিও সেই সময় আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। এই নতুন নিয়মে জগদানন্দ রায়, শরৎকুমার রায়, মোহন ঘোষ ও আরো কয়েকজন আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার হালদার, এন্ড্রুজ সাহেব, পিয়ারসন প্রমুখের প্রবল উৎসাহে ১০ মার্চ অর্থাৎ ২৬ ফাল্গুন থেকে আশ্রমে নতুন জীবনযাত্রা শুরু হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের যে কতখানি ভয় ঠিক ছিল তা তৎকালীন ছাত্র প্রমথনাথ বিশীর লেখা থেকেই জানা যায় –

"এই ব্যবস্থার ফলে আশ্রমে ছাত্রজীবনের সত্যযুগ আরম্ভ হইয়া গেল। সব কাজই ছেলেরা আরম্ভ করিল এবং এই-সব অত্যাবশ্যক কাজের চাপে পড়াশুনার অবান্তর উপলক্ষটা যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল তাহা আর নজরে পড়িল না।"[২০]

বলা বাহুল্য এই উৎসাহ দু'মাসের মধ্যেই প্রশমিত হয় এবং তারপরের বছর থেকেই গান্ধীজির আগমনকে মনে রেখে ১০ মার্চ তারিখটিকে গান্ধী-পুণ্যাহ নামে এক প্রথা পালন করা শুরু হয়। আজও বিশ্বভারতীতে এই দিনটিতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান নিজেরাই পরিষ্কার করার মাধ্যমে দিনটি পালন করে।

গান্ধীজির উৎসাহে শান্তিনিকেতনের নতুন ব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটি জানা যায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি থেকে।

"তুই এখন আস্তে পারলিনে তাতে আমি খুসি হলুম। কারণ এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত নিয়ে একটা ভারি গোলমাল চলচে। ছেলেরা গান্ধির উপদেশে নিজেরাই রাঁধবার ভার নিয়ে কাজটা চালিয়ে দিচ্চে। এই নিয়ে সত্য মিথ্যা নানা কথা ও উত্তেজনার উৎপত্তি হয়েছে। এর মধ্যে তুই এসে পড়লে আবার একচোট আলোচনা আন্দোলনের ধুম পড়ে যেত। কাজটা দুঃসাধ্য অথচ আরম্ভ হয়ে গেছে। এতে আমাদের আর্থিক সমস্যা এবং নানা সমস্যার মীমাংসা হল। সকলের চেয়ে, এতে ছেলেদের শিক্ষা হবে এবং এতদিন পরে আমাদের আশ্রমের ভাবটি পুরোপুরি জাগবার আয়োজন হবে। ছেলেদের সকলেই উৎসাহী, শিক্ষকদের কেউ কেউ নারাজ। তোকে নিজের দলে পাবার জন্যে অনেকে উৎসুক এমন অবস্থায় তোর দূরে থাকাই কর্তব্য। কিছুদিন চুপ করে থাকলেই সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যে জটিলতা ঢের আছে কিন্তু সে সমস্ত আপনিই মিটে যাবে- আমরা ধৈর্য্য ধরে চুপ করে থাকতে পারলেই কোনো মুস্কিল থাকবে না।"[২১]

তবে ছাত্রদের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এবং এই বিষয়টির সঙ্গে তিনি আপোষ করতে একদমই প্রস্তুত ছিলেন না। এভাবেই গান্ধীজির মতাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শের বিরোধ ঘটে। তাই গান্ধীজিও তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আর শান্তিনিকেতনে রাখতে

চাননি। ৩১ মার্চ তিনি আবার শান্তিনিকেতনে আসেন এবং সেখানে দু'দিন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। ৩ এপ্রিল ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে নিয়ে গান্ধীজি শান্তিনিকেতন থেকে হরিদ্বার যাত্রা করেন। ছাত্ররা হরিদ্বারে কিছুদিন গুরুকুল বিদ্যালয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে আমেদাবাদের নিকট কোচরাবে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে ছাত্ররা সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের প্রশ্নে মতবিরোধকে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়টি হল- সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনাবলীতে পরস্পরের মতপার্থক্য এবং দ্বিতীয়টি হল অবশ্যই তাঁদের দর্শনগত মতবিরোধ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সত্যাগ্রহের যান্ত্রিক রূপটিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অনুভব করেছিলেন, সমসাময়িক রাজনীতিবিদরা তাঁদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহটিকে গ্রহণ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী যে দর্শন নিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন, সেই মহান দর্শনটি তাঁদের কাছে ধরা দেয়নি। আবার বয়কট নিয়েও রবীন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে, কোনো রকমের বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা শুরু না করে তৎকালীন স্কুল কলেজের শিক্ষাকে বর্জন করার নীতিতে। যদিও তৎকালীন ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার গভীর সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এই দুর্দশাক্লিষ্ট শিক্ষাকে তিনি সমর্থন করতেন না, তবুও তিনি মনে করেছেন, ছাত্র-ছাত্রীরা সংকটজনক শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে, আসলে নিজেদেরকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখছে।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে সন্ধিহান ছিলেন, সেটি হল বিদেশি কাপড়ের বর্জন ও চরকার প্রবর্তন। যন্ত্র সভ্যতা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পক্ষে তিনি ছিলেন না।

বর্ণাশ্রম প্রথা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি মতপার্থক্য ছিল। গান্ধীজি বর্ণব্যবস্থাকে একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাস করতেন, তবে জন্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস হিসাবে নয়। তিনি সামাজিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা প্রচারের উপায় হিসেবে বর্ণকে দেখেছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এই বর্ণব্যবস্থা একটি অনমনীয়, জন্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস, যা অসমতাকে চিরস্থায়ী করে। তিনি বিশ্বাস করতেন বর্ণভেদ ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতাকে দমিয়ে রাখে। জন্মভিত্তিক মর্যাদার চেয়ে ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং প্রতিভার গুরুত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

গান্ধীজি একটি সংস্কারকৃত বর্ণব্যবস্থায় সম্ভাবনা দেখেছিলেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটিকে সামাজিক অবিচারের উৎস হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক চিন্তাধারার বহুমুখী প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির ভিন্ন মতের আরও একটি ক্ষেত্র হল স্বরাজ ও রাষ্ট্র গঠন। গান্ধীজি এক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্ব-শাসনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি নূন্যতম নির্দিষ্ট ক্ষমতাসহ একটি রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়ের স্ব-শাসনের উপর জোর দিয়েছিলেন। গান্ধীজি রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়ের স্ব-শাসনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

বিপরীত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরাজের একটি বৃহত্তর ধারণা কল্পনা করেছিলেন। এই স্বরাজ মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক রূপান্তর এবং আত্ম-উপলব্ধির। তিনি শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রকে আরও সক্রিয় ভূমিকার পালনের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে রাষ্ট্র সবসময় জনগণের কল্যাণ, শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে একমত হলেও, গান্ধীজি গ্রাম-ভিত্তিক অর্থনীতি ও রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

আসলে গান্ধীজি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়ের স্ব-শাসনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক রূপান্তর, ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধি এবং কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে জাতীয়তাবাদ নিয়েও মতপার্থক্য ছিল। গান্ধীজির জাতীয়তাবাদ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা। তিনি মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্ব-শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেই স্বাধীনতার পথ হিসাবে তিনি অহিংস প্রতিরোধ এবং আইন অমান্যকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সকলের সম্মিলিত কর্ম-প্রচেষ্টা এবং গণ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আসবে। তবে জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয়

সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আবার ‘রাম রাজ্য’ বা আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণায়ও বিশ্বাসী ছিলেন।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রচলিত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেননা। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জাতীয়তাবাদকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন। তিনি জাতীয়তাবাদে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পাশাপাশি জাতীয়তাবাদকে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি জাতীয়তাবাদকে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখেননি, আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪০৫।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪০৭।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আশ্রমে রূপ ও বিকাশ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আশ্রমে রূপ ও বিকাশ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আশ্রমে রূপ ও বিকাশ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৮১।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আশ্রমে রূপ ও বিকাশ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৮৩-৮৪।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আশ্রমে রূপ ও বিকাশ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৮৪।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আশ্রমে রূপ ও বিকাশ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৮৫।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্বভারতী", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৯৫।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্বভারতী", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৯৫-৯৬।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্বভারতী ২", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৯৬।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্বভারতী ২", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৯৭।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিশ্বভারতী ২", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৯৮।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নারী", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৭৫।

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৭৮৬।

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৭৮৭-৮৮।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৭৮৮-৮৯।

১৮। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৬৬

১৯। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৬৯

২০। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৬৯

২১। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২, পৃষ্ঠা ৭০।

উপসংহার

এখন ২০২৪ সাল। ভারতবাসী পালন করছে স্বাধীনতার ৭৭ বছর। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় জাতীয় ও বিভিন্ন রাজ্যস্তরে বারবার ঘটেছে রাজনৈতিক পালাবদল। আর সেই পালাবদলের হাত ধরে শাসন নীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি সবকিছুকেই বদলে ফেলা ও উন্নতি করার প্রতিশ্রুতিতে আজকের ভারতবাসী ক্লান্ত। আবার পরাধীনতার সময় থেকে স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও সময়ের সাথে সাথে বদলেছে দেশপ্রেমের ধারণা, জাতীয়তাবাদের ধারণা। কখনও বা এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। কিন্তু এখানেই আসে প্রশ্ন। ইংরেজদের হাত থেকে যে ভারত কয়েক দশক আগে স্বাধীনতা লাভ করেছে, তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন যাত্রার মান কতখানি বদলেছে? আর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রসঙ্গ উঠে আসে, তা হল জাতীয়তাবাদ। আর সত্যিকারের জাতীয়তাবাদকে উপলব্ধি করতে হলে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে পাথেয় করতে হবে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকে কীভাবে দেশ ও দশের মঙ্গল করা যায় তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই শেখাতে পারেন। সেকালে শিলাইদহ-পতিসরের শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকা গ্রামবাসীগণ যেমন নিজেদের উন্নতির কথা বুঝতে পারেনি আজও তেমনি প্রায় শতাধিক বছর পরও ভারতবাসী সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ ভারতবাসী দেশ বলতে বোঝে একটি ভৌগোলিক মানচিত্রকে এবং এত বড়ো দেশে একার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়, এই ভেবে নিজেদের স্বার্থটুকু নিয়েই বেশিরভাগ মানুষ প্রগতিশীল কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে। কিন্তু কি সহজ ভাবে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন শ্রীনিকেতন, শিলাইদহ ও পতিসরে। যেখানে ভারতের প্রাণ গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করার মাধ্যমে নতুন ভারত গড়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেশের উন্নতির জন্য যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পথ বেছে নিয়েছিলেন তার একটি হল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ আশ্রম শিক্ষাব্যবস্থা এবং অন্যটি হল পল্লি-পুনর্গঠন। জাঁকজমকহীন ভাবে প্রকৃতির বুকে মানুষ গড়ার যে আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন, তা এখন আরও বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আসলে তিনি দেশকে কখনো সীমানার বেড়াজালে বন্দী রাখতে চাননি। তাই তাঁর লেখনীতে বারবার উঠে এসেছে বিচ্ছিন্নতা নয় ঐক্যের কথা, খণ্ডতা নয় পূর্ণতার কথা। তাই বিশ্বভারতীকে তিনি করতে চেয়েছেন বিশ্বের মিলনক্ষেত্র। সবশেষে বলা যায়, এই সময়ে কবি বা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে জাতীয়তাবাদী ও পল্লি-পুনর্গঠনের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশি করে চর্চিত হওয়া প্রয়োজন।

পরবর্তী সম্ভাব্য গবেষণার ক্ষেত্র

১। সুস্থির উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ

২। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার বিবর্তন

৩। বিজ্ঞান চর্চা ও রবীন্দ্রনাথ

৪। রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব

৫। প্রকৃতিবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি

- অশোক সেন, *রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০২০।
- চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২০১৬।
- দীক্ষিত সিংহ, *রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।
- প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২।
- প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* নবম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।
- প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯।
- প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭।
- প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২।
- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ,* কবির চান্দ (অনূদিত), ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৬।
- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি,* কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৮০।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্দশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদক), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দশম খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দ্বাদশ খণ্ড, প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* পঞ্চম খণ্ড, নাটক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৫।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড, নাটক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৫।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* সপ্তম খণ্ড, উপন্যাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৫।
- শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন ও অন্যান্য নিবন্ধ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১০।
- স্বপন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের পল্লিভাবনা ও গ্রামীণ অর্থনীতি,* কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১১।

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

- Best, J. W., Kahn, J. V. & Jha, A. K., *Research in Education*, Pearson, 2016.
- Bhattacharya, Sabyasachi (Edited). *The Mahatma and The Poet*, New Delhi: National Book Trust, 2018.
- Bhattacharya, Sabyasachi. *Rabindranath Tagore: An Interpretation,* New Delhi: Penguin Books, 2011.
- Mandal, Manojit. *Decolonizing Education: Tagore and his Alternative Pedagogy,* Evolving Horizon, 2018.
- Mandal, Manojit. *Nationalism, Gora and Tagore's Vision of India,* IJELLH, 2018.
- Mandal, Manojit. *Tagore's Idea of Nationalism and the Contemporary India*, Visva-Bharati Quarterly, 2017.
- Singh, A. K. *Test, Measurement and Research Methods in Behavioural Science*, New Delhi: Bharati Bhawan Publishers & Distributors, 2016.